একার সংসার

শক্তিপদ রাজগুরু

৪, ভূপেন বোস এভিন্যু, কলিকাতা—৭০০০০৪
বিক্রয় কেন্দ্র : ৫৭ ২বি, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

ভূমিকা

জীবনের বিকাশ ঘটে সংসারের মধ্যে। একটা জীবন সংসারের মা-বাবা, ভাই-বোনের মধ্যে ও তাদের সাহচার্যে বিকশিত হয়।

কৈশোর থেকে আসে যৌবনে। অনেক সুখ-স্বপ্নময় যৌবন। তার মনে তখন অনেক আশা, স্বপ্ন, বিচিত্র সুর।

কিন্তু কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে সেই স্বপ্ন অনেকেরই হারিয়ে যায়। কঠিন জীবন তার বাঁচার লড়াইএ মানুষের রূপই বদলে দেয়। কেউ বদলায় না, হারায় না তার মানবিক গুণগুলো। বরং সে আরও প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে সে হয়ে ওঠে দুর্বার, একটি শপথ তাকে তার কর্তব্য পালনে এগিয়ে নিয়ে যায়। সে এই কঠিন সংসার, সব বিপত্তিকে জয় করে মানবিকতার সব দিকগুলোকেই তুলে ধরে। তার এই সংগ্রাম ত্যাগ ছিন্ন ভিন্ন সংসারকে নতুন করে গড়ে তোলে। আপনজনকে খুশী করে। তার বিনিময়ে সে কিছুই প্রত্যাশা করে না। সংসারও তাকে কিছুই দেয় না। সে-ই সংসারকে দেয় তার সর্বস্ব।

এই সংসারে অন্য বেশ কিছু স্বার্থপর মানুষ তাকে দেয় চরম আঘাত-বঞ্চনা। সেই স্বার্থপর মানুষদের মঙ্গলের জন্য, তাদের সুখী করার জন্য, সেই প্রতিবাদী যৌবন নিজেকে তিলে তিলে শেষ করে দেয়।

তার আদর্শ সামান্য কিছু পেয়ে থেমে যাওয়া নয়। প্রেম আসে তার জীবনে, সেই প্রেমের মর্যাদাও সে দিতে পারে না। সংসারের জন্যই তার প্রেমও কোনও পরিণতি লাভ করে না। অসহায় বাবা-মাও নিজেদের শুধু বেঁচে থাকার জন্যই অনেক অন্যায়-অবিচার অত্যাচারকেও প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হয়।

সেই প্রতিবাদী যুবক সব অবজ্ঞা-অপমান-আঘাতকে তুচ্ছ করে তার জীবন-সংগ্রাম অব্যাহত রাখে। তার বিশ্বাস সব অন্ধকারের পর আলোর প্রকাশ ঘটবেই। এই তার একমাত্র আশ্বাস। তাই সংসারে সে লড়াই করে জয়ের জন্য, একা। একাই চালিয়ে নিয়ে যায় তার জীবন-সংগ্রাম।

শক্তিপদ রাজগুরু

দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে জীবনের ছন্দটা একটা ধাঁচে চলেছে ভবেশবাবুর। মধ্য কলকাতার একটা গলির মধ্যে ব্রজসুন্দরী বামাপদ স্মৃতি বিদ্যামন্দিরের সহকারী শিক্ষক ভবেশবাবুর জীবনের দিনগুলো এই স্কুলেই কেটেছে। ওর আদি নিবাস ফরিদপুরের কোটালী পাড়া নামের কোনও গ্রামে। ছেলেবেলাতেই ভবেশবাবু কাকার সাথে কলকাতায় আসেন। গ্রামের স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে কাকার বাড়ি থেকে কলকাতার কলেজে ভর্তি হন।

সেই অতীত দিনের কলকাতার কথা— কলেজের সেই দিনগুলোর কথা এখনো ভোলেননি ভবেশবাবু। উত্তর কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজে পড়তো। কলেজ স্ট্রিট থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্ব, তখন কলকাতায় এত ভিড় এত সমস্যা কিছু ছিল না। ট্রাম, বাস ও ফাঁকা থাকতো। বাজারেও তখন জিনিসপত্র সস্তায় মিলতো।

গ্রীষ্মের ছুটিতে পুজোর সময় কাকাবাবু সপরিবারে ফরিদপুরের গ্রামে ফিরতো। ভবেশেরও মন টানতো গ্রামের দিকে। মনে পড়তো গোয়ালন্দ মেলে যেতো। স্টেশনে নামতো প্রায় ভোর ভোর হয়। প্রাচীন স্টেশন, ধানগাছগুলো তখন মাটিকে সবুজ করে রেখেছে। আউশ ধানে এসেছে সোনালী আভা। স্টেশনের পাশেই খাল তখন শেষ বর্ষার জল টইটই করছে। ওরা টাপুরি নৌকায় উঠে খাল পার হয়ে গ্রামে যেতো। পৌঁছাতে পৌঁছাতে সকাল হয়ে যেতো। স্টেশনের বাজার থেকে চিড়ে দই ছানার কাঁচাগোল্লা সন্দেশ এসব নিয়ে ওদের যাত্রা শুরু হতো। পুজোয় তখন মাঠে কাশ ফুলের মেলা বসেছে। ভেসে আসে কোনও মাঝির উদাস করা ভাটিয়ালি গানের সুর। পুজোর সময় সারা অঞ্চলের মানুষ ঘরে ফেরে। খালে তখন সঁওয়ারী নৌকার ভিড়।

ভবেশবাবুর সেই ঘরে ফেরার স্মৃতি আজও মনে আছে। তারপর একদিন ঘরই হারিয়ে গেল। দেশ ভাগ হয়ে গেল তাদের আর ঘরে ফেরা হল না। উত্তর কলকাতার বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রিটের একটা গলির মধ্যে তিন কামরার একতলা বাড়িতেই হল তাদের ঠিকানা। জীবনটা যেন ওই কানাগলির সীমিত পরিসরে বন্দী হয়ে গেল। কলেজ থেকে পাশ করে কাকার অফিসে কিছুদিন চাকরি করে ভবেশবাবু। সামান্য কেরানীগিরির চাকরিটা তার ভালো লাগে না। পড়াশোনায় ভবেশ ভালোই ছেলে। ইংরেজিতেও অনার্সও পেয়েছিল। সেই সুবাদেই পাড়ার কাছাকাছি ব্রজসুন্দরী বামাপদ বিদ্যালয়ে ইংরেজির শিক্ষকের চাকরিটাই পেয়ে গেল। সেই থেকে ওই পরিবেশেই কেটেছে ভবেশবাবুর জীবন।

প্রথমদিকে স্কুলের মাইনেতেই তার সংসার চলে যেতো। এখন ভবেশ বিয়ে-থা

করেছে। তারপর এতগুলো বছর কেটে গেছে। ভবেশবাবুর সংসারও এখন একটা রূপ নিয়েছে। বড় ছেলে বিজিত এখন কলেজে পড়ে। এবার বি.এসসি দেবে। পড়াশোনাতেও বিজিত বেশ ভালোই। এমনিতে ভদ্র ছেলে। বাবার কিছুগুণ সে পেয়েছে। তবে বাবা অন্যায়কে কোনদিন প্রশ্রয় দেননি। ভবেশবাবু কিছুটা প্রতিবাদী চরিত্রের মানুষ আর কঠিন সত্য কথাটা মুখের উপর বলতে পারেন। তার জন্যই তিনি স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি নিরাপদবাবুর মুখের উপরই তাদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন। স্কুলের উপর এখন চাপ বেড়েছে।

দেশ বিভাগের পর ভবেশবাবুই দেখেন কলকাতার চেহারাই কেমন বদলে গেছে। বদলে গেছে কলকাতার শহরতলীর রূপটাও। তখন ছিল চারিদিকে জলাভূমি—হোগলা বাঁশের বন, পরিত্যক্ত জমি।

দেশ বিভাগের পর ওপার বাংলা থেকে ভবেশবাবুরাও যেমন বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিল—তেমনি এসেছে লাখো লাখো পরিবার। শহর-কলকাতার আর কত লোকের ঠাঁই হবে, তাই শহর ভর্তি হয়ে যেতে সেই জনস্রোত আছড়ে পড়লো শহরতলীর উপর আর সেই সব জলাভূমি — হোগলাবন উধাও হয়ে গড়ে উঠলো নানা কলোনী।

স্কুলগুলোর উপরও চাপ পড়তে শুরু করলো। এত ছাত্রছাত্রী কোথায় পড়বে? কিছু স্কুলও গড়ে উঠলো। তাও তুলনায় অনেক কম। ওদের স্কুল কর্তৃপক্ষও ছাত্র ভর্তির জন্য গোপনে, প্রকাশ্যে চাপ দিয়ে নানা খাতে টাকা নিতে শুরু করলো। সরকার থেকে স্কুল বিল্ডিং করার জন্য লাখ লাখ টাকা এলো স্কুল কমিটিতে। স্কুলের প্রেসিডেন্ট ওই নিরাপদবাবু। এই অঞ্চলের তারা পুরোনো বাসিন্দা। তাদের জায়গাতে এই স্কুল। নিরাপদবাবুর পৈত্রিক ব্যাবসাও আছে। আবার স্থানীয় নেতাও ওই নিরাপদবাবু । তিনিও এবার স্কুল নিয়েই বাণিজ্য শুরু করেন।

লাখ লাখ টাকা নানাভাবে সরেও গেল। কিন্তু প্রতিবাদ করার কেউ নাই। ভবেশ-বাবুই কমিটি মিটিং-এ এসবের প্রতিবাদ জানান— শিক্ষা নিয়ে এইভাবে ব্যাবসা করা ঠিক নয়। আমরা চাইব এসব বন্ধ হোক। আর এ পর্যন্ত যেসব টাকা নানাভাবে বাইরে থেকে এসেছে তার সঠিক হিসাবও পেশ করা হোক কমিটিতে।

নিরাপদবাবু তার দলবলও চটে ওঠে। কিন্তু প্রকাশ্যে সেই রাগটা তারা প্রকাশ করে না। তবে তারা যে ভবেশবাবুর উপর মোটেই খুশী নয়, সেটাও তারা হাবেভাবে জানিয়ে দেয়। ভবেশবাবু খুবই জনপ্রিয় শিক্ষক। ছাত্রদেরও তিনি প্রিয়জন। গরিব ছাত্রদের বিনা পয়সায় তিনি বাড়িতে পড়ান। এ নিয়ে শিক্ষক মহলেও একটা ক্ষোভ আছে। অনেকে বলে,

—ভবেশবাবু আজকাল কোনও কাজ বিনা পয়সায় কিছুই হয় না। ওদের কাছে টাকা চান। শুধু শুধু ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবেন কেন মশায়?

ভবেশবাবু বলেন, —ওরা কোথা থেকে দেবে? তাছাড়া স্কুলই তো মাইনে দেয়। ওসবে কি দরকার?

এমনি এক নীরব প্রতিবাদী চরিত্র ভবেশবাবু। তার বড় ছেলে বিজিতও বাবার

সেই গুণটাই পেয়েছে। মনে মনে তাই বিজিতও এক নির্লোভ কঠিন সত্তায় পরিণত হয়।

তার ছোট ছেলে সুজিত। কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছে। তবে ভবেশের এই ছেলেটি সম্পূর্ণ অন্য রকমের। সুজিত পড়াশোনার চাইতে খেলাধূলায় বেশি আগ্রহী। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই তার খেলাধূলায় নেশা বেশি। ফুটবল নিয়ে বেশি সময় কাটে। পাড়ার ক্লাবের নামী প্লেয়ার, স্কুল টিমেরও ক্যাপ্টেন ছিল সে। তার স্বপ্ন সে খেলার জগতেই নাম করবে। সুজিত-এর স্বপ্ন নিজের কেরিয়ার গড়ে তোলা। তাই নিয়েই সে ব্যস্ত।

আর এ বাড়ির ছোট মেয়ে শিখা এবার মাধ্যমিক দেবে। এমনিতে ছিমছাম চেহারা, মুখখানাও বেশ মিষ্টি, যেন মমতা মাখানো। শিখা গানও গায়। অবশ্য আগে বিজিতও গান গাইত। তার প্রিয় ছিল রবীন্দ্র সঙ্গীত। ওদের অভাবের সংসারে তবু শান্তির অভাব নেই। ভবেশবাবুও ওঘরে বসে পরীক্ষার খাতা দেখছিল। মাধ্যমিকের পরীক্ষার খাতা। ক্রমশ হতাশ হচ্ছেন ভবেশবাবু। ইংরেজি ভাষার শিক্ষক তিনি। তখন কত সুপণ্ডিত শিক্ষককে তিনি দেখেছেন। ইংরেজি সাহিত্য বিশ্ব-সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। পৃথিবীর সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা। এদেশেও তার বহু চর্চা হয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে ইংরেজি ভাষার প্রতি যেন সারা দেশে একটা অনীহার সৃষ্টি হয়েছে। আর এখানে তার পরিমাণটাও বেশি। নীচু ক্লাশে ইংরেজির পাঠতুলে দেওয়া হয়েছে। ফলে মাধ্যমিকে ইংরেজির খাতা দেখতে বসে হতাশই হন। একটা জাতি যেন বিশ্বের দরবারে তাদের প্রতিষ্ঠা হারাবার পথেই নেমেছে। নিজেরটাও শিখল না—অন্য ভাষাও শিখল না।

ওদিকে বিজিত-শিখার গানের সুর ভেসে আসে।

"আকাশ ভরা সূর্য তারা—বিশ্বভরা প্রাণ
তাহারই মাঝখানে। যেন পেয়েছি স্থান—
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।"

বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ যেন মানব সত্ত্বার এক বিশেষ প্রাপ্তি। নিজেকে মানুষ সেই বিরাট বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এ যেন মানুষের এক বিশেষ অনুভূতিই। ভবেশবাবু ওদের গানটা শুনছিল। মানুষ যখন নিঃসঙ্গ, একা বোধ করে, তখন সে নিজেকে একান্ত অসহায় ভাবে।

ভবেশবাবুর স্ত্রী সাবিত্রীও বিয়ের পর থেকে এই যদু ঘোষ লেনের বাড়িতে এসে ঢুকেছে। আর এই সংসারের মধ্যে জড়িয়ে গেছে। প্রথমদিকে তখন খরচপত্র কম ছিল। সংসারও ছোট ছিল। ওর মধ্যেই কুলিয়ে গেছে। ক্রমশ দিন বদলেছে। বাজার দর বেড়েছে হু হু করে। সেই খরচের তুলনায় ভবেশবাবুর আয় বাড়েনি। ফলে সংসারের অভাবটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। তবু মধ্যবিত্ত থেকে নিম্নবিত্ত পর্যায়ে পড়ে ওই বৃহৎ একটা শ্রেণি আজও আধমরা হয়ে বেঁচে আছে, ভবেশবাবু তাদেরই একজন।

তবু তিনি স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্ন দেখেন যে বিজিত পাশ করে নিশ্চয়ই কোনও কাজ পাবে। বিজিতও স্বপ্ন দেখে সে-ও এখন বড় হয়েছে। কলেজে পড়ছে। সে-ও দেখছে কলেজের বন্ধুদের মধ্যে ধনী গরিব নিম্নবিত্ত সব শ্রেণীর ছেলে মেয়েরাই রয়েছে। বিজিত দেখেছে সমাজের বুকে এক শ্রেণীর মানুষের নানা ধরনের অত্যাচার। সে যথাসাধ্য প্রতিবাদ করে। বিজিত স্বপ্ন দেখে যে বাবার পাশে দাঁড়াবে। তাদের সংসারের জন্য কিছু করবে। তাছাড়াও সমাজের নিপীড়িত অসহায় মানুষের জন্যও যথাসাধ্য কিছু করার চেষ্টা করে। সে-ও স্বপ্ন দেখে এক সুখী সমাজের। ওর বয়সের সব তরুণ অবশ্য সেই স্বপ্নই দেখে এসেছে এতকাল। অতীতে এমন স্বপ্ন দেখে ঘর ছেড়ে বহু তরুণ ইংরেজের অপশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। নিজেদের প্রাণও বলি দিয়েছিল। আজ অবশ্য তারা নেই, বরং তাদের জায়গায় কিছু লোভী স্বার্থপর তরুণ সেই অতীতের প্রজন্মকে বলে,

—তারা ছিল ভাবপ্রবণ। তারা নাকি বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় দেয়নি।

কিন্তু বিজিত সেরকম নয়। ও যেন সেই প্রতিবাদী ভাবনার উত্তরসুরী। তাই আজকের সমাজে সে ঠিক যেন বেমানান, তবু বিজিত স্বপ্ন দেখে গান গায়। এই চুন প্যালেস্তারা খসা এদোঁ গলির প্রায়ন্ধকার বাড়ির পরিবেশে তারই সুর ওঠে। এযেন বিজিতের মনের এক বিচিত্র অনুভূতি। শিখাও গান গায় দাদার সঙ্গে। সকালের আলো ফুটেছে।

এবাড়িতে সাবিত্রীর কাজও শুরু হয়েছে। সকাল থেকে তার কাজের শুরু আর শেষ হয় রাত দশটায়। তার জীবনে অসুস্থ না হলে কোনও ছুটি—কোনও রবিবার নেই। ওই বাড়িটাতে এদের গ্যাসের ওভেন নেই তাই কয়লার উনুন জ্বালাতে হয়। ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে উঠানের ঘরে।

ওদিকে সুজিত সকালে পার্কে জগিং-এ যাবার জন্য তৈরি হয়েছে। তার স্বপ্ন সে মস্ত বড় ফুটবল প্লেয়ার হবে। আজকাল খেলার জগতে নাম করতে পারলেও পয়সা-চাকরি-নাম-যশ-অনেক কিছু পাওয়া যায়। সেজন্য সে পড়াশোনার চেয়ে খেলার কথাই বেশি ভাবে। তাই বিজিতের মত ভালো কলেজে পড়ার সুযোগ সে পায়নি। একটা সাধারণ কলেজেই পড়ে। অবশ্য তার জন্য সুজিতের তাপ-উত্তাপ নেই, তার মধ্যে খেলার স্বপ্ন দেখে সে। এর মধ্যে নামী ক্লাবের হয়ে টুর্নামেন্ট খেলে আর প্রতিটি খেলায় অংশগ্রহণের জন্য বেশ কিছু টাকাও পায় সে। অবশ্য তার ওই রোজগারের কথা সে বাড়িতে জানায়নি।

বিজিতও ভাই এর খেলা দেখেছে। বিজিতও বলে,

—দারুণ খেলিস তুই। দেখবি নামী-দামী টিম তোকে ডেকে নেবে। বড় প্লেয়ার হবি তুই।

অবশ্য বিজিত ওকে ওদের কলেজ টিমেও নাম ভাড়িয়ে দু-একবার খেলিয়েছে। সেখানে সুজিত খেলেছে বিজিতের নামে। আর ওর দেওয়া গোলে বিজিতের কলেজ জিতেছে—শীল্ডও পেয়েছে। গর্বে বিজিতের বুক ভরে উঠেছে। অবশ্য সুজিত তার আগেই ওদের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দরদস্তুরও করে গেছে। সুজিত এর মধ্যে ভাড়া খাটা

প্লেয়ারদের হালচালও জেনে গেছে। সে বলে,

দাদা এটা 'খেপ', 'সংক্ষেপ' না 'আক্ষেপ'?

ওদের খেলার জগতে এই তিনটে কথা ফাংশন পার্টির গাইয়েদের মতো বহুল প্রচলিত। 'খেপ' মানে পুরো টাকাই দেবে খেলার জন্য। দুশো-আড়াইশো-তিনশো যার যেমন দাবী তাই পাবে। আর 'সংক্ষেপ' মানে ওই টাকার থেকে কিছু কম পাবে। আর আক্ষেপ মানে টাকার প্রশ্নই নেই, শুধু টিফিন পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

সুজিত তাই হিসাবটা ভালোই বোঝে। এর মধ্যে স্টাইকার হিসাবে নামও করেছে সে। সুবিধামত পজিসনে সে মাঠে দাড়িয়ে থাকে। অন্য কেউ তাকে বল এগিয়ে দেয়। সুজিত সুকৌশলে ব্যাক ও অন্য ডিফেন্সদের কাটিয়ে বল গোলে পাঠায়, নানা কৌশলে। স্বভাবতঃই সে সুযোগ-সন্ধানী। সুজিত সকালে বেরিয়ে যায় ক্লাবে। ওখানেই জগিং করার পর টিফিনও পায়। বাড়িতেও তার জন্য ডিম-মাখনের ব্যবস্থা করে নিয়েছে সে। অবশ্য তার জন্য সপ্তাহে দুদিন বাড়িতে নিরামিষ-এর বন্দোবস্ত করতে হয়েছে সে খবর সুজিত রাখে না।

সাবিত্রী জানে কিভাবে সংসারের ঝক্কি সে পোয়ায়। তাই মাঝে মাঝে তার মন -মেজাজও তিরিক্ষি হয়ে ওঠে। ওঘরে বিজিত-শিখার গান শুনে সাবিত্রী বলে,

—এত অভাবের মধ্যে তোদের গান আসে কি করে রে?

বিজিত হাসে। সে বলে,

—মা। অভাব দুঃখ-কষ্ট কোনদিন আমাদের ঘুচবে না। তাই বলে গান গাইবো না? অভাবের জ্বালাতে সুরের মিষ্টি ছোঁয়া কেন থাকবে না মা? সব কিছু সহজে মেনে নাও। দেখবে সবই সত্যি হয়ে উঠবে। সহ্য হবে।

—তুই থামতো! যতসব বড় বড় বাত।

শিখাও দেখেছে সংসারের অবস্থা। নিজেরও টুকটাক খরচ আছে তার জন্য মায়ের কাছে হাত পাততে হয়। জানে মায়ের লক্ষ্মীর ভাঁড়ে শূন্য অবস্থা। অলক্ষ্মীর ঘরে লক্ষ্মীর খোঁজ মেলে না। তাই শিখাও দু-চারটে ছোট ছেলেমেয়েকে এর মধ্যে পড়াবার—গান শেখাবার কাজও নিয়েছে। যা পায় তাতে তার হাতখরচা মিটে গিয়ে হাতেও কিছু টাকা থাকে। অবশ্য বিজিত জানে সেই খবরটা। মাঝে মাঝে বিজিতের কলেজের গাড়ি ভাড়াও থাকে না। এতটা পথ তাকে হেঁটে যেতে হয়। যায়ও সে—শিখা বলে,

কিছু টাকা রাখ দাদা।

আরে আমার অভাব তো বিশাল তুই আর কত সাহায্য করবি।

তাই বলে বৃষ্টিতে এতটা পথ হেঁটে যাবি। বাসেই যাবি।

জানিস শিখা। ভগবান আছে কিনা জানিনা। যদি কোনদিন তার দেখা পাই বলবো—আমাকে নয় শিখাকে বেশি করে মালকড়ি দিয়ো ও যাতে আমার মত ছন্নছাড়াদের কিছুটা হেল্প করতে পারে।

নিজের জন্য কিছু চাইবি না?

আরে আমি তো উড়নচণ্ডী। যা দেবে একদিনেই উড়িয়ে দেবো। কিছুই থাকবে না। তোর হাতে থাকলে তবু কিছু পাবো।

ভবেশবাবুর মনটা আজ ভালো নেই। আজ তার চাকরির শেষদিন। এবার তিনি রিটায়ার করবেন। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে স্কুলে যাতায়াত করছেন। কত মুখ এসেছে দলে দলে—আবার ক'বছর পর তারা হারিয়ে গেছে। তাদের জায়গায় এসেছে আবার কত নতুন মুখের ভিড়। সারাটা দিন কেটে যায় স্কুলে ছেলেদের মধ্যে। দীর্ঘ এতগুলি বছর কোনদিকে কেটে গেছে সেটা টের পায়নি জানতেও পারেননি ভবেশবাবু। আজ সেই এতদিনের স্কুলের জীবনের শেষ দিন। এখন সরকারি চাকরি শিক্ষকদের। আগে বয়সের এত হিসাব ছিল না। যতদিন সমর্থ থাকতো শিক্ষক কাজ করতেন অনেক সময়।

এখন তারা সরকারি চাকরির দৌলতে গ্র্যাচুয়িটি, মাসে মাসে পেনসন পাবেন। হয়তো অসহায়ভাবে অনাহারে মরতে হবে না। তবু তার মনে বেদনার সুর জাগে। জীবনটাই যেন বদলে যাবে। তবু এটাকে মেনে নিতেই হবে।

ভবেশবাবু তবু এখনও নিজে বাজারে যান। ছেলেরা এই মাপা টাকার মধ্যে সবকিছু গুছিয়ে আনতেও পারেন না। ভবেশবাবু বাজার ঘুরে ঘুরে সস্তা দরেই কেনাকাটা করেন। তবু দুটো পয়সার সাশ্রয় হয়। ভবেশবাবু বাজার সেরে ফিরে থলেটা নামিয়ে দাওয়ায় বসে বলেন,

কইরে শিখা ? এক কাপ চা দে। চা খেয়েই চান করবো। আজ তো চাকরির শেষ দিন। কাল থেকে আর স্কুলে যেতে হবে না। আবার বেকার।

ওদিকে সাবিত্রীও রান্নাঘরে ব্যস্ত। ভবেশ বাবুর জন্য ভাত এবং বিজিত, সুজিত, শিখাও বের হবে। তাদেরও রান্না আছে। তাই তার আর ছুটি নেই। বাজারের থলে থেকে জিনিসপত্র বের করে সাবিত্রী বলে,

এই বাজার এনেছো।

এতো তবু আসছে। কাল থেকে তো বেকার। এদিকে সংসারের খরচ তো কিছু কমছে না। সামনের মাস থেকে মাইনে পাবনা, তার ওপর বাজারও আগুন। এরপর এই পেনসনটুকুই ভরসা। গ্র্যাচুয়িটি, প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকায় তো হাত দেওয়া যাবে না। তখন কি হবে কে জানে?

সাবিত্রী বলে,

এত ভাবছ কেন? দেখবে ঠিক দিন চলে যাবে।

তবে সত্যিই কিভাবে দিন কাটবে তা ভবেশবাবুর জানা নেই।

ব্রজসুন্দরী বামাপদ স্মৃতি বিদ্যামন্দিরে আজ ভবেশবাবুর শেষ দিন। কতকাল আগে এই স্কুলে ঢুকেছিলেন তা মনে পড়ে না। তখনকার আর আজকের স্কুলের মধ্যে বিস্তর ফারাক। এখন স্কুল আয়তনে বেড়েছে। আজ ভবেশবাবুকে আর ক্লাশ নিতে হয় না।

মাঠে সভার আয়োজন করেছে ছেলেরা। আজ ছাত্র শিক্ষকরাই কয়েক পিরিয়ডের পর ওখানে সভার অনুষ্ঠান শুরু করে। মেয়েরা গানও গায়। আর কিছু শিক্ষক যাদের অনেকেই ভবেশবাবুকে দেখতে পারতেন না, তারাও আজ ভবেশবাবুর ভূয়সী প্রশংসা করে ভাষণ দেন। ছাত্ররা তাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষককে প্রণাম জানায়, ভালবাসা জ্ঞাপন করে। শেষে গীতা, চাদর, লাঠি আর একটা শাল সঙ্গে এক প্যাকেট মিষ্টি দিয়ে ভবেশ বাবুকে বিদায়-সম্বর্দ্ধনা জানান। ভবেশবাবুও দু-চার কথা বলেন। তার মনে হয় এতদিন তিনি ছিলেন একটা সমষ্টির মধ্যে। আশপাশে অনেক সঙ্গী-সাথী ছিল। আজ থেকে তিনি নিঃসঙ্গ, একা হয়ে গেলেন।

বিকেলে বাড়ি ফিরলেন ভবেশবাবু ওইসব উপহার নিয়ে ফুলের তোড়া নিয়ে। সাবিত্রী বাড়িতে রয়েছে। ছেলেমেয়েরা বাইরে। শিখা স্কুল থেকে ছাত্রীর বাড়ি হয়ে ফেরে। ভবেশবাবু বলেন,

বড় বউ—আমিই বেকার হয়ে গেলাম। আজই চাকরি শেষ হয়ে গেল।

সাবিত্রী বলে,

এত ভেঙে পড়ছ কেন?

পেনসন কবে পাবো তার ঠিকঠিকানা নেই। ভরসা ওই প্রভিডেন্ট ফান্ড আর গ্র্যাচুয়িটির টাকা।

সাবিত্রী বলে,

—এত ভেঙে পড়ছ কেন?

ও আমি ঠিক চালিয়ে নেব, তার মধ্যে বিজিতও পাশ করে একটা কিছু পাবে। দেখবে দিন আটকে থাকবে না।

বিজিতের কলেজে হঠাৎ সেদিন বাৎসরিক পরীক্ষার হলে কাণ্ডটা ঘটে যায়। বিজিত তখন ফাইন্যাল ইয়ারে পঁড়ছে। আর সেদিন কলেজের বাৎসরিক পরীক্ষায় থার্ড ইয়ারের অখিল আরও তার দু-একজন বংশবদ চ্যালা পরীক্ষার হলে বসে বই-এর ছেঁড়া পাতা বের করে টোকাটুকি করছিল। একজন অধ্যাপক ওদের হাতেনাতে ধরে ফেলতেই গোলমাল শুরু হয়। অখিল কলেজের দুরন্ত ছাত্রদের নেতা। ওর বাবাও নাকি এক নামকরা নেতা। তাই অখিল উত্তরাধিকার সূত্রে যেন সব অন্যায় করার অধিকারও পেয়ে গেছে কলেজে।

অখিলকে প্রিন্সিপ্যাল সেই পরীক্ষাতে আর বসতে দেননি। তারই প্রতিবাদে অখিলও এবার দলবল নিয়ে কলেজে ক্লাস বয়কটের ডাক দিয়েছে। অখিলের দলবলও তৈরি। তারা জোর গলায় স্লোগান দিয়ে চলেছে।

প্রিন্সিপ্যালের জুলুম মানছি না, মানব না। আমাদের দাবী মানতে হবে।

বেশ কিছু ছেলেমেয়ে ও বারান্দায় ভিড় করেছে। তাদের ক্লাসে ঢুকতে দেবে না অখিলের দল। অখিলের বাবাকে প্রায়ই এখানে-সেখানে ভাষণ দিতে শোনা যায়। অবশ্য এলাকার মানুষ বলে—ওসব নাকি ফাঁকা আওয়াজ।

অখিলও তার পিতৃদেবের মত উদাত্ত কণ্ঠে ভাষণ দিতে থাকে একটা টুলে দাঁড়িয়ে।

ভাইসব? প্রিন্সিপ্যাল সাহেব অন্যদের মিথ্যা বদনাম দিয়ে হেয় প্রতিপন্ন করে আমাদের পরীক্ষায় বসতে দিতে চান না। এই জঘন্য ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ করতেই হবে। যতদিন না এই জঘন্য অন্যায় অত্যাচার-এর প্রতিকার না হয় আমরা সত্যের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাবো। এই ধর্মঘট চলছে চলবে।

দু'একজন ছাত্র তবু এগিয়ে যেতে চায়। কেউ বলে,

টোকাটুকি করা অন্যায়। তোমরাই এসব করেছ।

কেউ গর্জে ওঠে,

—চুপ বে। একটা কথা বললে মুখ ভেঙে দোব। কেউ ক্লাসে যাবে না।

ছেলেমেয়েরাও এটাকে ঠিক মেনে নিতে পারে না। অথচ প্রতিবাদ করার শক্তি বা সাহস কোনটাই তাদের নেই। হঠাৎ দেখা যায় নিবেদিতাকে। কলেজের নতুন ছাত্রী। সুন্দরী আর চোখে মুখে কমনীয়তা ছাপিয়ে একটি কাঠিন্যর ছাপও রয়েছে তার মুখে। সে-ও এতক্ষণ ধরে অখিলের ভাষণ, ওর সাকরেদদের ওই বাধাদান করা দেখছিল। আবার নিবেদিতা ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসে, সে বলে,

—কে কে ক্লাসে যাবে এসো আমার সঙ্গে। ওরা এই ভাবে ক্লাস করতে দেবে না নিজের খেয়াল খুশি মতো এ হতে দেবো না। এসো—

এবার বেশকিছু ছাত্রছাত্রীও মৃদু প্রতিবাদ তোলে।

—আমরা ক্লাসে যাবো। চলো—

ওরাও নিবেদিতার পিছু পিছু এগোতে যায়। এবার অখিলের রক্ত গরম হয়ে ওঠে। এতদিন ধরে কলেজে সেই ছিল অলিখিত নেতা। তার অত্যাচারও সইতে হত মুখ বুজে ছাত্রদের। কেউ প্রতিবাদও করতো না। আজ নিবেদিতাকে এভাবে প্রতিবাদ করতে দেখে অখিল বলে,

—খবরদার কেউ ক্লাশে যাবে না। ক্লাশের দিকে এগোলে খারাপ হয়ে যাবে। আয়তো ন্যাপা-মন্টা-ফটিক।

ওর বিশ্বস্ত সহকারীর দল নিমেষের মধ্যে কোথা থেকে হাতে হকি স্টিক লাঠি ইত্যাদি বের করে আনে। নিবেদিতা বলে,

—এগিয়ে চল। ওরা কি করতে পারে তাই দেখবো।

নিবেদিতা এগিয়ে যাবে এবার অখিল ওকে ধরে। হাত ধরে টানতে নিবেদিতার হাত থেকে বইখাতা বারান্দায় ছিটকে পড়ে। গজরাচ্ছে অখিল—মেয়ে বলে খাতির করবো না।

হঠাৎ করে এক ধাক্কায় ছিটকে পড়ে অখিল। সামনে এসে দাঁড়ায় বিজিত। ওর মুখটা কঠিন হয়ে ওঠে। বিজিত রাগে অখিলকে টেনে তুলে ওর চ্যালাদের দিকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দেয়। প্রচণ্ড ধাক্কায় অখিল ও তার সাঙ্গাপাঙ্গরা বারান্দায় পড়ে যায়। দেওয়ালে মাথাটা ঠুকে যায়। আর তার চ্যালারা এহেন দশা দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিজিতের ওপর। নিবেদিতাকে ছেড়ে ওকে আক্রমণ করে সকলে, বিজিতের

ওপর। বিজিতের ওপর ওদের রাগটা জমেই ছিল। কলেজের মধ্যে এর আগে ওই বিজিতই দু-একবার তাদের পিছনে লেগে ছাত্রদের উত্তেজিত করেছে। প্রতিবাদ করেছে ওদের। তাই কলেজের কিছু ছেলেমেয়ের কাছেও ইদানিং নেতা প্রতিপন্নও হয়েছে। রাগটা সেখানেই। অখিলের এতদিনের জমানো সিংহাসনে ঘা পড়েছে। বিজিত বারবার তার প্রতিষ্ঠাকে ধুলোয় মেশাতে চেয়েছে। আর আজ অখিলকে ওইভাবে বিপর্যস্ত করতে তার চ্যালারাই আক্রমণ করেছে বিজিতকে।

কিন্তু বিজিতকে আঘাত করার আগেই বিজিত ওদের হাত থেকে হকিস্টিক কেড়ে নিয়ে ওদেরই আক্রমণ করে আর দু তিনটে প্রহার দিতেই তারাও রণে ভঙ্গ দিয়ে পালায়। এরপর অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরাও ওদের তাড়া করে, বিজিত ওই ছাত্রছাত্রীদের থামিয়ে বলে,

—যা আজ ছেড়ে দিলাম। এরপর ফের কখনও কোন মেয়ের গায়ে হাত দিতে দেখলে হাত ভেঙে দেবো।

অখিলের দলবল বিপদের গুরুত্ব বুঝে তখনকার মত পিছু হটলো। চারিদিকে ছেলেমেয়েদের চিৎকার।

এর মধ্যে খবরটা কলেজে ছড়িয়ে পড়তে আরও অনেকে এসে জোটে। এসেছে অনিমেষ—অর্ক। এরা বিজিতের বিশেষ বন্ধু। ওরা সবাই ফাইন্যাল ইয়ারের ছাত্র। তাছাড়া অনিমেষের ছোট বোন নিবেদিতা। অনিমেষই খবর পেয়ে এসে দেখে বিজিত তখন অখিলকে ঠেলে বের করে দিয়েছে। ছেলেমেয়েরাও এবার ক্লাসে যায়। কলেজের পড়াশোনাও শুরু হয়। অনিমেষ বলে,

—শুনলাম নিবেদিতার গায়ে হাত দিতে গেছল ওই অখিল।

অনিমেষ-এর বাবা ও শহরের নামী লোক, শহরে ব্যস্ত এলাকায় ওদের বিশাল বাড়ি। শহরতলীতে দু-দুটো বিরাট কারখানা। ওদের মাল-এর বেশিরভাগই আমেরিকা-ইংল্যাণ্ডের বাজারে চালান যায়। নিবেদিতা বলে,

—না-না, তার আগেই বিজিত এসে পড়ে অখিলকে যা দু-চার ঘা দিয়েছে। ওর দলবলতো রুখে উঠেছিল। বিজিত একাই ওদের হটিয়েছে। অনিমেষ বলে,

—তবু তুই সময়মত এসে পড়েছিলি বিজিত। না হলে ওই জানোয়ারটা যে কি করতো? এবার ওটাকে কলেজ থেকেই তাড়াতে হবে—

—বিজিত বলে, তার দরকার হবে না। ও আর কিছু করবে না।

অর্ক বলে, ও ব্যাটা সাপের জাত। ওর বাবাটাতো দেশসেবকের মুখোস পরে দেশের সর্বস্ব লুঠ করছে। ওতো বাপকা বেটা—ওটাও তাই করে।

কলেজের আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে। ক্লাসের পর ফিরছে বিজিত, এসে পড়ে নিবেদিতা। বিজিত অপেক্ষা করছে অনিমেষ অর্কের জন্য। ওরা লাইব্রেরিতে গেছে।

নিবেদিতা বলে,

—বাড়ি ফিরবে না?

বিজিত বলে,

—অনিমেষ, অর্করা আসবে ওদের জন্য অপেক্ষা করছি। অনিমেষ-এর বাড়িতে যেতে হবে। দুখানা বই-এর দরকার।

নিবেদিতা বলে,

—ওরাতো বাড়ি ফিরবে। চলো আমার গাড়িতে। ওখানেই দেখা হবে।

নিবেদিতা গাড়ি নিয়ে আসে। অনিমেষ অবশ্য মটর বাইকে আসা-যাওয়া করে। বিজিত তবু কিন্তু কিন্তু করে। নিবেদিতা বলে,

—আরে চলোতো। ওরা এসে পড়বে বাড়িতে।

বিজিত নিবেদিতার গাড়িতেই ওঠে। নিবেদিতা বিজিতকে ভালোই চেনে, ওর দাদার বন্ধু আগে থেকেই আলাপ রয়েছে। ওর সুমিষ্ঠ গলার গানও শুনেছে। দেখেছে ওই প্রতিবাদী ছেলেটাকে। গাড়িতে বসে বলে,— তুমি না এসে পড়লে কি যে হতো?

—ওদের সাহস নেই নিবেদিতা। তুমিই যদি প্রতিবাদ করতে দেখতে ও থেমে যেতো। প্রতিবাদ-এর কঠিন চেহারাটাকে ওই কাপুরুষের দল ভয় পায়। আমরা সেটা করতে পারি না—তাই ওরা মাথায় উঠে বসেছে। নিবেদিতা শুনেছে ওর কথা।—

অনিমেষ-এর বাড়িটা বেশ আধুনিক স্টাইলের। অনিমেষ-এর বাবা নরেশবাবু সকাল থেকে বেরিয়ে যান কারখানায় সেখানে কাজকর্ম দেখার শোনা করেন। দেশের বিদেশের বহু অর্ডার-এর মাল তৈরি করতে হয়। তাদের জাহাজে তোলার জন্য ও বেশকিছু লোকজন আছে। তারা কখনও কলকাতা বন্দর কখনও হলদিয়া বন্দর থেকে জাহাজে মাল তোলার ব্যবস্থা করে।

তাছাড়া সারা দেশের বিভিন্ন জায়গাতে মাল যায়। এসবের জন্য নরেশবাবুকেও মাঝে দিল্লি, লন্ডন, নিউইয়র্কে পাড়ি দিতে হয়। সেখানের এজেন্টদের সাথে যোগাযোগ রাখতে হয়। ওইসব দেশের বাণিজ্য মন্ত্রক সেক্রেটারিদের সাথে ব্যবসা সংক্রান্ত মিটিং করতে হয়। নরেশবাবু এনিয়েই ব্যস্ত । তার ভাই দেবেনবাবুও দাদার সহকারীর কাজ করে। সে দেশের বাণিজ্যমহলে নরেশবাবুর যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে।

নরেশবাবুও এবার ভাবছেন অনিমেষ কলেজের পড়া শেষ করলেই তাকেও এবার এই ব্যাবসার কাজে তালিম দিয়ে তৈরি করবেন। তারও কাজের ভার কিছুটা নিতে পারবে অনিমেষ। এত কাজের মধ্যে নরেশবাবুর একটু সখ-আহ্লাদও আছে। তিনি ফুটবল খেলার খুবই ভক্ত। নিজে অবশ্য স্কুল-কলেজে পড়ার সময় ফুটবল খেলতেন। কিন্তু আর খেলার সুযোগ হয়নি তেমন সময়ও ছিল না। তবু ফুটবলকে ভোলেননি। এ বাড়িতে ওর ভাই দেবেনও ফুটবল-প্রেমী।

নরেশবাবুর টাকার অভাব নেই। তিনি ইস্টবেঙ্গল টিমের অন্ধ ভক্ত। এ বাড়িতে ড্রইংরুমে নামী-দামী ফুটবলারদের খুব মানও আদর। অতীতের বহু নামী প্লেয়ারদের ছবিও টাঙানো আছে বসার ঘরে। নরেশবাবুও এখন বেঙ্গল টিমের সভাপতি। ওই টিমকে তিনিই গড়েছেন। আজ ওর টিমের ভারতজোড়া নাম। আর তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী চির শত্রু ক্লাব মোহনবাগান। নরেশবাবু টিমের জন্য প্রচুর টাকাও যোগান

দেন। তারই চেষ্টাতে বিদেশমন্ত্রকও বেশ কিছু বিদেশী প্লেয়ারকেও এখানে খেলার ছাড়পত্র দিয়েছে। সারাদিন কাজ করে নরেশবাবু সন্ধ্যায় ক্লাব টেন্টে যাবেনই।

নিবেদিতাও বাবার মতোই ইস্টবেঙ্গলের উগ্র সমর্থক। এই নিয়ে বাড়িতে ড্রইংরুমেও নরেশবাবু-দেবেনবাবু আর নিবেদিতার মধ্যে প্রচণ্ড তর্ক বাধে। নিবেদিতা বলে,

—কাকু তোমার মোহনবাগানের কথা আর বলো না। অথচ দেখ, তোমার ক্লাব এখন গোল খেতেই স্পেশালিস্ট হয়ে উঠেছে।

ওদের তর্কের মধ্যে নরেশের স্ত্রী কল্যাণী দেবী বলেন,

—খেলার ঝগড়া মাঠেই সেরে আসবে তোমরা, বাড়িতে ওইসব চলবে না। আর নিবেদিতা তোর পড়াশোনা নেই?

এসব নাটক হয় রাত নটার পর। খেলা থাকলে তো রাত বারোটা অবধারিত। আর মোহনবাগান জিতলে দেবেনবাবুও তখন সিংহ পুরুষে পরিণত হন। এই বড় বাড়িটাতে মা লক্ষ্মীর দয়া যেমন অটুট তেমনই একটা সজীবতা রয়েছে। আছে মানবিকতার মূল্যবোধ। অনিমেষ এই বাড়ির ছেলে হয়েও হোটেলের বাইরে যায়না। শহরের ধনী সমাজের ছেলেদের মতো। সে জানে তাকে নিজে কিছু করতে হবে। তাই সে সমাজের সাধারণ ছেলেদের সঙ্গে মেশে। তাই বিজিতকে ভালো লাগে অনিমেষের। ওরা বেঁচে থাকে প্রতিদিন লড়াই করে।

বিজিতদের সংসারটাও দেখেছে অনিমেষ। অর্ক কলেজের ভালো ছেলেদের একজন। ওরা আসে এ বাড়িতে। আজও এসেছে ওরা। এবার কলেজে সোস্যাল সম্বন্ধে কথা হয়। বিজিত কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের পাণ্ডা। অন্যবার ওইসব সোস্যালের সব ভার নেয় অখিলই। তারই পছন্দ মতো প্রোগ্রাম হয়। তার পেটোয়া ছেলেমেয়েরাই সব আয়োজন করে। নিবেদিতা বলে,

—এবার সব অনুষ্ঠান প্রোগ্রাম করবে ছাত্র ইউনিয়ন-এর কমিটি।

অনিমেষ বলে,—তাই কর বিজিত। আমরা তোর পাশে আছি।

বিজিত জানায়, —কালই ছাত্র সমিতির মিটিং ডাকছি। ওই অখিলদের কলেজে আর মাথা তুলতে দেব না। তোরাও তৈরি থাক—তার জন্য অখিলরা যদি বাধা দেয়—ওদের বাধাও মানবো না,—

এরমধ্যে নিবেদিতা বেয়ারাকে দিয়ে কিচেন থেকে কিছু কাটলেটও বানিয়ে এনেছে। ওরা কলেজ থেকে ফিরেছে। সে বলে, —নাও, কলেজে তো অনেক মারপিট করেছো। এখন কিছু খেয়ে নাও।

অর্ক গরম কাটলেট-এর সমাহার দেখে বলে,—বিজিত, তুই মাঝে মাঝে এমন মারপিটই কর তাহলে আমাদের ভাগ্যেও এমন সরেশ চিকেন কাটলেটও জুটবে রে।

অনিমেষ কাটলেট মুখে পুরে বলে,—তা মন্দ বলিসনি অর্ক।

সুজিতের চোখে স্বপ্ন সে নামী-দামী প্লেয়ার হবে। কলেজে যায় সে। তবে

পড়াশোনায় মন তার নেই। কলেজে ওর মত বেশকিছু স্বপ্ন বিলাসী প্লেয়ারও আছে। তারাও অনেকে স্বপ্ন দেখে তারা ডিভিশনে খেলবে। তাই এখন পাড়ার ক্লাবেই ঘোরাফেরা করে চান্সের জন্য। সুজিতও মেশে তাদের সঙ্গে। সে দেখেছে ওইসব প্লেয়ারদের সেই নিষ্ঠা আর সাধনা নেই। তারা প্র্যাকটিসও নিয়মিত করে না। আর খেলার জন্য দৈহিক মানসিক প্রস্তুতির যেটুকু দরকার তাও তাদের নেই। সুজিত এগুলো নিষ্ঠার সাথে করে। নিয়ম মেনেই করে। বাড়িতে অভাব অনটন। বাবার এখন চাকরিও নাই—পেনশনের টাকা এখনও পায়নি বাবা। কোনমতে জমানো টাকা যা ছিল তাতেই টেনেটুনে তাদের সংসারটা চলে।

কিন্তু এত অভাব অনটনের মধ্যেও চরম স্বার্থপরের মতো সুজিত তার নিজের জন্য ডিম-মাখন-মাংস এসব আদায় করে নেয়। অসহায় দর্শকের মতো ভবেশবাবু শুধু চেয়ে চেয়ে দেখেন। সাবিত্রী বলে, —আহা ছেলে মানুষ। ওরও তো সাধ আহ্লাদ আছে। তাছাড়া খেলার জন্য হাড়ভাঙা খাটুনি খাটে ওকে ভালোমন্দ খেতে দিতে হবে না।

—তা বুঝি গো। কিন্তু এ বাড়িতে অন্যরাও তো আছে। তাদেরও ডাল ভাতের প্রয়োজন। সবই যদি তোমার ছোট কুমারের পিছনে যায়। অন্যরা কি উপোস দেবে ওর খেলার জন্য?

সাবিত্রী বলে,—এ নিয়ে তুমি আর কথা বাড়িয়ো না।। যেভাবে হোক দিন চলে যাবে।

শিখাও দেখে এ সংসারে যত দাবী ওই সুজিতের। সেদিন রাতে বিজিত আর শিখা খেতে বসেছে।। সামান্যই খাবার ডাল, রুটি আর কুমড়ো আলু দিয়ে সেদ্ধ ঘ্যাট। ওদিকে সুজিতের জন্য রুটি আর চিকেন স্টু। সঙ্গে সন্দেশ। শিখা বলে,

—মা! দাদাকে একটু স্টু দাও না?

সাবিত্রী বলে,—সুজিতের জন্য করেছি ওকেই দিয়ে দিলাম।

বিজিত বলে,—না-না, এইতো বেশ খাচ্ছিরে।

তারপর প্রসঙ্গটা পাল্টাবার জন্য বলে,—সুজিত তোর খেলা কেমন চলছে রে। এবার ছোট-খাটো টিমে খেলা ছেড়ে নামী টিমে যাবার চেষ্টা কর। তুই তো দারুণ খেলিস। একবার ডিভিশনে খেলতে পারলে আর কে আটকাবে তোকে?

সুজিত বলে,—সেই চেষ্টাই করছে। সামনে শীল্ড ফাইন্যাল। এবার ক্লাবে শীল্ড এনে দিতে পারলে হারুদা বলেছে ও আমার জন্য চেষ্টা করবে। সুজিত মাংসের টুকরোয় কামড় দেয়।

বিজিত বলে,—দেখবি ঠিক চান্স পাবি তুই!

সুজিত-এর ক্লাব এবার কোনও একটা শীল্ডের ফাইন্যালে উঠেছে। সুজিত ক্লাবের নামকরা স্ট্রাইকার। তার গতিবেগও অসাধারণ। আর পায়ে বল পেলে তখন যেন দেহে-মনে কি এক অন্যশক্তি এসে ভর করে। প্রতিপক্ষের ব্যাক অন্য প্লেয়ারদের সহজেই সে দেহের একটা আকস্মিক মোচড়ে পরাস্ত করে বল কাটিয়ে নিয়ে গিয়ে

নির্ভুল লক্ষ্যে সট করে আর কখনও বিপক্ষকে ও ডজ করে নিপুণভাবে বল সমেত গোলে ঢুকে যায়।

হারুবাবু ক্লাবের সেক্রেটারি। হারুবাবু বলেন,—আজ শীল্ড চাই সুজিত। তোকেও খুশি করে দোব।

সুজিতকে অবশ্য হারুবাবু মাঝে মাঝে টাকা-পয়সা-জামা-কাপড়, বুট, খেলার অন্যান্য আনুষাঙ্গিক কিটব্যাগ এসব দিয়ে থাকেন। ওর সংসারের অবস্থাও জানেন হারুবাবু। তাই বলে,—তোর ডায়াটের দিকে নজর রাখবি। দুই-ডিম-মাংস-ফল এসব খেতে হবে। কিছু টাকা রাখ।

মাঝে মাঝে এখানে বা অন্য কোনও টিমের হয়ে খেপ খেলেও সুজিত বেশ কিছু টাকা রোজগার করে। তবে ওটা তার একান্ত নিজস্ব আয়। সংসারে সে কিছুই দেয় না। উল্টে নেয়। আর এই টাকার কিছু দিয়েও দামী পোশাক-জুতো-জামা কেনে। এমনিতে সে দেখতেও সুন্দর, ওর দামী পোশাকে তার ব্যক্তিত্বও ফুটে ওঠে। সুজিত জানে তার নিজের পথ নিজেকেই করে নিতে হবে। তার জন্য সে স্বভাবতই উদগ্রীব। তাই আত্মকেন্দ্রিকও। সেদিন সুজিত খেলছেও দারুণ। অবশ্য তাদের ডিস্ট্রিক্টও ভালো খেলেছে। প্রতিপক্ষকে তাদের গোলের দিকে এগোতে দেয়নি। আর সুজিত বলও পেয়েছে অনেকগুলো। তার মধ্যে প্রতিপক্ষতে বিপর্যস্ত করে নিজেই তিনটে গোল করে টিমকে জিতিয়ে দেয়।

ক্লাবে সেই উপলক্ষ্যে ধূমধামও হয়। সুজিতই আজ হিরো। অবশ্য এরমধ্যে এই অঞ্চলে সুজিতের ভক্তও জুটে গেছে। তারাই উল্লাসে চিৎকার করে,

—সুজিত দা-জিন্দাবাদ। গোল করেছে কে? সুজিতদা আবার কে?

সুজিতও এসব জয়ধ্বনি শুনে উল্লাসিত হয়।

হারুদা বলে,

—এবার আমাদের টিম ফার্স্ট ডিভিশনে উঠবে সুজিত। তুই ভালো করে খেল। এবার খেলতে হবে ময়দানে বড় বড় টিমের সঙ্গে। লেগে থাক, এনে এইটা রাখ।

একটা খামও দেয় হারুদা। বলে,

—হাজার টাকা আছে।

সুজিত আজ বেস্ট ম্যানস কাপ পেয়েছে। খবরের কাগজওয়ালারাও তার খেলা দেখেছে, তারাও খুশি। ছবিও নিয়েছে তার। সুজিত আজ বিজয়ীর মতো বাড়ি ফেরে।

শিখা জানে তার সংসারের অবস্থা। এরমধ্যে সে মাধ্যমিক পরীক্ষাও দিয়েছে। আর অবসর সময়ে কয়েকটা গানের টিউশনিও করে। সে জানে তার নিজের হাতখরচা তাকেই যোগাতে হয়। এছাড়াও বড়দাকেও কিছু দিতে হয় তাকে। সেটাও শিখা এভাবে রোজগার করে। সেদিন বিজিতদের বাড়িতে অনিমেষ আর অর্ক দুজনে আসে। ওরা প্রায়ই এই বাড়িতে আসে। শিখা ওদের সাথে গল্প-গুজব করে। অনিমেষদের বাড়ির অবস্থার কথা সবই জানে। বিরাট বড়লোকের ছেলে সে। অর্কও কলেজের সেরা

ছাত্র। কালই ওদের কলেজের সোস্যাল হয়ে গেছে, বেশ কিছুদিনই ধরে তাদের প্রস্তুতি চলছিল। ওদিকে অখিলও চেষ্টা করেছিল তার প্রাধান্য বিস্তার করতে। কিন্তু তা হতে দেয়নি বিজিত ও তার দলবল।

অখিলও চটে ওঠে। ওর চ্যালারা বলে,

—ওরা কলেজের ওই অনুষ্ঠানই পণ্ড করে দোব। দোব বোম ঝেড়ে। দেখবে মজা ওই বিজিতের দল।

অখিল বুঝেছে তাতে অশান্তিই বাড়বে। তার দলের নতুন ব্যান্ডের অনুষ্ঠানও হবে না। অখিল এখন ওর নিজের বাড়িতেই কিছু ছেলেমেয়েদের নিয়ে নিজেই একটা ব্যান্ডের দল খুলেছে। সে-ও চায় ওই দলের অনুষ্ঠান করে সে বিজিতদের অনুষ্ঠানের চেয়ে ভালো অনুষ্ঠান করবে। কাল কলেজের সেই অনুষ্ঠানে অখিলের ব্যান্ড অনুষ্ঠান করতে গিয়ে পদে পদে নাকাল হয়। হলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ব্যান্ডের তাল লয় সুর এসব কিছুই নাই। অখিল তাদের লীডার। বেহালা জোরে বাজাতে গিয়ে ব্যান্ডের চামড়াই ফেটে যায়। আর অনুষ্ঠান হয় না ওদের।

অবশ্য তার মধ্যে শ্রোতারা কেউ কেউ টমাটো, পচা ডিমও উপহার দিয়েছে ওদের। অখিল ব্যর্থ রাগে গরগর করছে। কিন্তু তার করার কিছুই নেই। তার ব্যান্ডের দল যে এমনিভাবে বিগড়ে যাবে এটা ভাবেনি অখিল। শেষ অবধি বিজিত নিবেদিতাকেই আসরে নামতে হয়। তাদের দ্বৈত-সঙ্গীত আসরে আবার শান্তি ফিরিয়ে আনে। তারপর অন্যসব শিল্পীদের অনুষ্ঠানও দারুণ হয়।

অর্ক বলে,

—বিজিত তুই শিখার অনুষ্ঠানের কথা কেন বলিসনি। শিখাতো দারুণ গায়।

শিখা বলে,

—ওরে বাবা! ওই কলেজের অনুষ্ঠানে আমি নেই। বসো তোমরা, চা আনি।

বিকেলে ভবেশবাবু পার্কে গিয়ে একটু পায়চারি করেন। প্রথমে রিটায়ার করার কিছুদিন পরও ভবেশবাবু তার স্কুলে যেতেন। ওই পরিবেশটা তাকে টানতো। ছাত্রদের কলরব —সহকর্মীদের সঙ্গে দেখা হওয়াটাও ছিল ভবেশবাবুর কাছে বেশ তৃপ্তির ব্যাপার। ছেলেরাও অনেকে আসতো তার কাছে। তিনিও কথা বলতেন তাদের সঙ্গে। তাদের খবরাখবর নিতেন। টিচার্স রুমের গিয়ে বসতেন। অবশ্য তখন স্কুলে শিক্ষক বেড়েছে কিন্তু টিচার্স রুমও আয়তনে বাড়েনি। ফলে সব শিক্ষকদের বসার মতো জায়গা ছিল না। ভবেশবাবুর ওভাবে বসার জন্য মাঝে মাঝে অন্য শিক্ষকরা বলতেন,

—ওই বুড়ো এখানে কেন আসে? আবার কিছু মতলব আছে না কি?

অন্যজন বলে,

—তাই-তো! এখান থেকে ছাত্র পাকড়ে নিয়ে ওর কোচিং-ক্লাশ খোলার মতলব। আবার দেখি কেউ স্যারের ঘরেও যায়।

অন্যজন বলে,

—আমাদের নামে চুকলি করে বোধহয়।

ভবেশবাবু কথাগুলো শুনে অবাক হন। তিনি কোনদিন টিউশনির পিছনে ঘোরেননি। তাই অন্য শিক্ষকদের মতো তার আয় বাড়েনি। বরং বিনা পয়সাতে বহু গরিব ছাত্রদের পড়িয়েছেন। ভবেশবাবু ওসব কথা শোনার পর আর স্কুলে যাননি। তার মনে হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শুচিতা পবিত্রতাকে ওই তথাকথিত শিক্ষক নামক স্বার্থান্ধ একটা শ্রেণি অপবিত্র করেছে। তাই আজ শিক্ষার মানও বিপন্ন।

পার্কেই গিয়ে আজকাল বসেন। দু-একদিন টিউশনি থাকলে সেখানে যান। এতদিন তিনি এই কাজ করেননি। কিন্তু সংসারের চাপে এখন ভবেশবাবুকে এই কাজও করতে হচ্ছে। বাড়িতে সুজিত রয়েছে। কাল কাপ জিতে যেন বিশ্বজয় করে এসেছে। অনিমেষ, অর্ককেও সেই কাপ দেখিয়ে বলে সুজিত,—

—অনিমেষদা কাল আমাদের ক্লাব গোবরডাঙা শীল্ড জিতে এসেছে আর বেস্ট ম্যান প্রাইজ পেয়েছি আমি।

সুজিত এর মধ্যে খেলার জগতের অনেক বিচিত্র খবরই রাখে। সে জানে কোন কোন নামী-দামী ক্লাবের পিছনে কারা রসদ যোগায়। তাই বলে,—অনিদা, শুনেছি তোমার বাবা-কাকা বেঙ্গল ক্লাবের কর্মকর্তা। তাঁদের কথায় ক্লাবের প্লেয়ারও নেওয়া হয়। আমার কথা বলনা তাদের কাছে।

বিজিত বলে,

—সত্যি রে অনি। সুজিত দারুণ খেলে। ওর খেলা আমি দেখেছি। ও ভালো কোনও টিমে সুযোগ পেলে আরও ভালো খেলবে।

অর্কও বলে,

—তাহলে দ্যাখ না অনিমেষ।

—আরে বাবা। বাবা কাকামণি আর নিবেদিতার মধ্যে খেলা নিয়ে যখন তর্কবাধে তখন মনে হয় বাড়িতে বোম পড়বে। তারপর ওতে যোগ দেব আমি? আমায় মাফ কর ভাই। খেলার আমি কিছু বুঝি না বুঝতেও চাই না।

সুজিত খানিক হতাশ হয়ে বলে,—খেলার চান্স আর চাকরি সহজে কেউ কাউকে দেয় না জানি। ঠিক আছে নিজের জোরেই একদিন আমি নামী-দামী টিমে ঢুকবোই। কারো হেল্প আমার লাগবে না।

কথাটা ওদের বেশ কড়া করে শুনিয়ে ওঘরে এসে সুজিত বুট সাফ করতে থাকে।

শিখা বলে,

—মা চা করছো ওদের জন্য?

সাবিত্রী বলে,

—বিকেলে এসেছে ওরা, শুধু চা দিবি? নিদেন মুড়ি বাইরে গুপীর দোকানে গরম চপ ভাজছে এখন তাই দে। কিন্তু তোর বাবা তো নেই। আর আমার কাছে পয়সাও নেই।

সামনে সুজিতকে দেখে সাবিত্রী বলে,

—ও সুজিত! তোর দাদার বন্দুরা এসেছে। কিছু আনা না।

হু! যার বন্ধুরা এল—যাদের বাড়িতে গিয়ে নিজে খেয়ে আসে ভালো-মন্দ সেই দাদারই হুঁস নেই।

—ও কোথায় পয়সা পাবে?

—ওকেও খেটে রোজগারের ধান্দা করতে বল মা। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই টু-পাইস নানাভাবে খেটে রোজগার করে। কে দেবে ওকে রোজ রোজ?

—তা তুইতো খেটে ভালোই রোজগার করিস শুনি। কিছু দে না?

—আমার খরচ নেই তোমার বড়পুত্রকে খাটতে বলো।

শিখা বলে,

—তুই থাম ছোড়দা। দয়া করে চুপ কর। আমিই আনছি।

শিখাই তার ব্যাগ থেকে টাকা নিয়ে বেরিয়ে যায়। একটু পরে ওদের গল্পের আসরে মুড়ি আর গরম চপ দেখে অর্ক বলে,

—তুমি বাইরে গেছ দেখে ঠিক এইটাই আইডিয়া করেছিলাম।

সত্যি বিকেলে গরম আলুর চপ, মুড়ি আর চা দারুণ। নে অনি!

বিজিতও চপে কামড় দিতে থাকে তৃপ্তি ভরে। শিখা দেখছে। ওদের জন্য এটুকু করতে পেরে সে-ও তৃপ্ত। বলে,—

—তোমরা খাও। আমি চা আনছি।

সন্ধ্যা নেমেছে। ভবেশবাবুর আজ টিউশনি নেই। তাই বাড়ি ফিরে আসেন তাড়াতাড়ি। অনিমেষ, অর্কদের তখন কি একটা বিষয় নিয়ে তুমুল তর্ক শুরু হয়েছে। ওরাও ভবেশবাবুকে দেখে থেমে যায়। ভবেশবাবু বিজিতের এই ভদ্রসভ্য বন্ধুদেরও চেনেন। ওদের পরিচয়ও জানেন। অর্ক একজন কৃতি ছাত্র। ওর বাবা কোন মফস্বল শহরে থাকেন। ওখানের কলেজের অধ্যাপক।

ভবেশবাবু সুজিতের চারজন বন্ধুকেও দেখেছেন। একেবারে উঠতি মস্তানের মত চেহারা। কথাবার্তাও অভদ্র। মেসোমশাই কথাটাই তারা ভাল করে সহজভাবে উচ্চারণ করতে পারে না। ওদের জগতটাই আলাদা। আর অনিমেষ অর্কদের জগতটা স্বতন্ত্র।

ভবেশবাবু বলে,

—কি সামনে পরীক্ষা, পড়াশোনা কেমন চলছে?

অর্ক বলে,

—চলছে মেসোমশাই।

—তুমিতো কলেজের সেরা ছাত্র। ভাল করে পড়াশোনা করতে হবে। এম. এ. করে অধ্যাপক হবে। দেশে ভালো শিক্ষকের খুবই দরকার।

সাবিত্রী বলে,

—না বাবা। ওর কথা শুনো না। পারো তবে ভালো চাকরি-ই করো। সরকারি চাকরি। ওকে দ্যাখোনা এতকাল মাস্টারি করে আজও পেনসন পেলেন না। ওসব মাস্টারি-ফাস্টারির কাজে যেও না।

ওরা চলে গেছে। বাড়িটা নীরব। বিজিত ওঘরে বসে পড়ছে। শিখাও। ভবেশবাবু চুপ করে বসে আছেন। ভাবছেন সত্যিই এবার দিন চলবে কি ভাবে। দেখতে দেখতে কটা মাস পার হয়ে গেছে—পেনসন অফিসে যাতায়াত করছেন। কিন্তু আজও পেনসনের ব্যাপারে সঠিক কিছু জানতেও পারেননি যে কবে পাবেন—আদৌ তা পাওয়া যাবে কিনা। কারণ ভবেশবাবু পেনসন অফিসে বারবার গিয়ে দেখছেন তারও মতো অনেকেই নাকি বছরের পর বছর ওই অফিসে যাতায়াত করছে। এখনও তারা কিছুই পায়নি। একজনকে দেখেছেন বেচারা কেমন যেন পাগলই হয়ে গেছে। দূর গ্রামের স্কুলের শিক্ষক সে, আজও ওই অফিসের বাইরে গাছতলায় বসে বিড়বিড় করে ইতিহাসের ক্লাস নেয়। অবশ্য ছাত্র নেই।

এসব দেখে ভবেশবাবুর মনেও একটা নীরব আতঙ্ক, হতাশাও ফুটে ওঠে। এতদিন ধরে প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুয়িটির টাকা যা পেয়েছেন তাই ভাঙিয়ে চলছে। অবশ্য এটাকায় তিনি হাত দিতে চাননি। ভবেশবাবু বলেন সাবিত্রীকে,

—এতো শিখার বিয়ের টাকা, বিজিতকে পড়াতে হবে—তার খরচা। কিন্তু সংসার অচল হয়ে আসছে, তাই বাধ্য হয়েই তাকে এই টাকাতে হাত দিতে হয়। ভবেশবাবু দুঃখে বলে,

—আমার নিজের হাতে ছেলে মেয়ের ভবিষ্যত নষ্ট করে দিতে হল। শিখার কি হবে। বিজিত চেয়েছিল এম. এ. করতে।

সাবিত্রী বলে,

—আর পড়ে দরকার নেই বাপু। বিজিতের পরীক্ষা শেষ হলে ওকে বলো একটা কাজকর্মের খোঁজ খবর করুক। তবু কিছু রোজগার করলে সংসারের সাশ্রয় হবে। আর বড় ভাইকেই তো বাবার পর সংসারের ভার নিতে হয়।

—কেন তোমার ছোট কুমার?

ভবেশের কথায় সাবিত্রী বলে,

—ও তো ছেলে মানুষ। ও বাড়িতে খায় মাত্র। আর তো ও নিজের খরচ নিজেই জুটিয়ে নেয়। ওর জন্য ভাবতে হবে না।

তবু ভবেশবাবুর ভরসা যায় না। দরজার কড়াটা নড়ে ওঠে। —এসময় আবার কে এলো? বাড়িওয়ালা ধরণীবাবুর কণ্ঠস্বর শোনা যায়। ধরণীবাবুর দেহটা বেশ নাদুস নুদুস। এ অঞ্চলের পুরোনো বাসিন্দা অন্য একটা বাড়িতে নিজেরা থাকেন। বড়বাজারেও ওদের মসলার পৈত্রিক ব্যবসা।

এপাড়াতে বেশ কয়েকখানা বাড়ি ওদের। পায়ে পাতলা চটি, পরণে খাটো ধুতি। গায়ে ফতুয়া গেঞ্জি। গলায় হার বনেদীআনার লক্ষণ।

—বসুন ধরণীবাবু।

কদিন ধরেই কথাটা বলবো ভাবছিলাম—সময় পাইনি। আজ সময় পেতে চলে এলাম।

ভবেশবাবু অবশ্য ওর কাজটা কি হবে তা বুঝে নিয়েছিল। গত মাসের ভাড়া

এখনও দিতে পারেননি। আগে এমন হতো না। তখন মাস মাইনে পেলে আগে বাড়িভাড়া—মুদির টাকা, দুধের দাম সবই আগে মিটিয়ে দিতেন। এখন মাস মাইনে নেই। টিউশনির টাকাও ঠিকমত আসে না। তাই সব কিছুই অনিয়মিত ছন্দহারা হয়ে গেছে।

ধরণীবাবু এবার তার প্রসাধন শুরু করেছে। ব্যাবসাদার লোক। তবু ভবেশবাবুকে একটু অন্য নজরে দেখেন। তার গবেট মার্কা ছেলেকে ভবেশবাবুই উচ্চমাধ্যমিক পাশ করিয়েছেন অনেক পরিশ্রম করে। ফলে ধরণীবাবুর ছেলের বিয়েতে যৌতুকের টাকাটা একলাফে একলাখ থেকে আড়াই লাখে তুলেছিল। আরও একটু চাপ দিলে ওটা তিনলাখই হতো। কিন্তু তা আর করেনি।

ধরণীবাবু বলে,

—বাজারদর তো দেখছেন মাস্টারমশাই। সব কিছুই হুহু করে বাড়ছে, বাড়েনি শুধু বাড়ি ভাড়া। সরকার বাড়ির মালিকদের জন্য এতটুকু ভাবেনি মশাই। ভেবেছে শুধু ভাড়াটেদের কথা। আমরা যেন মানুষ নই। তবু আমাদের তো বাঁচতে হবে। তাই বলছি দয়া করে এবার ভাড়াটা বাড়ান কিছু। নিদেন পক্ষে শ'খানেক।

ভবেশবাবু চমকে ওঠেন। অবশ্য বলারও কিছু নেই। এ পাড়ায় এখন তিনটে ঘরের ভাড়া নিদেন আড়াই হাজার টাকা। তাও মেলে না। তারা দেন মাত্র দুশো টাকা। ধরণীবাবু অন্যায় কিছু বলেনি। ভবেশবাবু বলেন,

—আমি চেষ্টা করছি ধরণীবাবু।

—চেষ্টা নয় এবার করে দেখান। তাহলে চলি—সামনের মাস থেকে তাহলে ওই কথাই রইল।

ধরণী বের হয়ে যায়। ভবেশবাবু উঠে গিয়ে লাইট-পাখাটা বন্ধ করে দিয়ে বসেন। ওদিকে বারান্দায় একটা চল্লিশ ওয়াটের বাতি জ্বলছে। সারা বাড়িতে এই একফালি আলোই ভরসা। ভবেশবাবু বাধ্য হয়েই এই ব্যবস্থা করেছে। ছেলে মেয়েরা না থাকলে আলো পাখা সব বন্ধ করে অন্ধকারে বসে হাতপাখা নেড়ে হাওয়া খান। ইদানীং ইলেকট্রিক কোম্পানিও লাফে লাফে দর বাড়াচ্ছে। তাতে সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে আলো আর জ্বলবে না। অবশ্য তাতে ইলেকট্রিক কোম্পানির কিছু যায় আসে না। তার কাছে টাকাটাই বড়—তার জন্য অন্যের ভালোমন্দের কথা তাদের ভাবার প্রয়োজনও নেই।

সাবিত্রী বলে,

—ধরণীবাবু কি বলছিল গো?

—বাড়ি ভাড়া বাড়াতে হবে নিদেন একশো টাকা। বাজার দর বেড়েছে ওরা তো চাইবেই। যে যার কথা তো ভাববেই।

—কিন্তু আমাদের কি হবে? পেনসনের কি হলো গো। বছর গড়িয়ে গেল। কাল একবার যাও পেনসন না পেলে তো এবার উপোস দিতে হবে।

ভবেশবাবুও ভাবছেন কথাটা। যেতেই হবে সেখানে—না হলে বাঁচার পথ আর নেই।

বিজিত, অর্করা কলেজের পরীক্ষা দিচ্ছে। অর্ক ছাত্র হিসাবে ভালোই। বিজিত অনিমেষও। তাদের মধ্যে বিজিতের কাছে এই পরীক্ষা একটা অগ্নিপরীক্ষা। জীবন মরণ সমস্যা। বিজিতকে এই পরীক্ষার পাশ করতেই হবে। কারণ তাকে সংসারের ভার নিতে হবে।

সেদিক থেকে অনিমেষ বা অর্কের তেমন কোনও সমস্যা হবে না। তাই বিজিত কিছুদিন থেকে মন দিয়ে পড়াশোনা করেছে আর পরীক্ষার খাতাতে ভালোমত লিখতেও পেরেছে। কটা দিন কেটেছে তাদের কঠিন উৎকণ্ঠার মধ্যে। এবার পরীক্ষা শেষ হতে বিজিত অনিমেষদের বলে,

—যেন একটা কঠিন বাঁধন থেকে মুক্ত হলাম রে।

এবার সত্যিই বেকার হয়ে গেলাম।

অনিমেষ বলে,

—বেকার কি রে! তোরা তো এবার এম. এ., এম. এসসি করবি। আমাকে বাবা বোধহয় এবার ব্যাবসার কাজেই নামিয়ে দেশ-দেশান্তরে ঘুরপাক না খাওয়ায়। দুর্ভাগ্য আমারই।

বিজিত দেখেছে তার সংসারের অবস্থা। ভবেশবাবু এবার চোখে অন্ধকার দেখছেন। সামান্য জমানো টাকা যা ছিল তাই ভেঙে চলেছে এতদিন। কলসীর জল এবার তলানিতে ঠেকেছে। তাই বাজার খরচাও নাই। বিজিতের পরীক্ষা চলছিল। তাই বিজিতকেও সংসারের প্রকৃত অবস্থার কথা জানাতে পারেনি। আর তাছাড়া ওকে জানিয়েও কোন লাভ নেই। সাবিত্রী দেখেছে সংসারের অবস্থাটা। সুজিত এখন আরও নাম করেছে। কলকাতার দু-একটা নামী ক্লাবের হয়ে বাইরেও শীল্ড ম্যাচে খেলতে যায় আর ভালো টাকাও পায়। অবশ্য সুজিত ওসব রোজগারের পরিমাণ বাড়িতেও জানায় না।

সে সেসব টাকা নিজের সুটকেশে একটা খামে তা সঞ্চয় করে রাখে গোপনে আর মাঝে মাঝে গুণেও দেখে। তা প্রায় হাজার পাঁচেক টাকা জমেছে। তার এবার ব্যাঙ্কই এ্যাকাউন্ট করে—টাকাটা জমা দেবে। এখন একটা ক্লাবের হয়ে ভালো টাকার বিনিময়ে বহরমপুরে সে হুইলার শিল্ড খেলতে যাচ্ছে। টিমকে শীল্ড পাইয়ে দিলে প্রতিদিনের টাকা ছাড়া আরও পাঁচ হাজার টাকা বোনাস পাবে। সুজিত সেই স্বপ্নের খুশিতে শিষ দিতে দিতে তার ব্যাগ গোছাতে থাকে।

সাবিত্রীকে ঢুকতে দেখে আগেই টাকার খামটা সুটকেশের নিরাপদ আশ্রয়ে পাচার করেছে।

সাবিত্রী বলে, ও সুজিত তোর বাবার কাছে টাকাও নেই। বাজার খরচাও নেই। তোর কাছে শ-পাঁচেক টাকা থাকে তো দে। তোর বাবা পেনসনের টাকা পেলে সব দিয়ে দেবে।

সুজিত জানে তার বাবা প্রায়ই পেনসন অফিসে যাতায়াত করে কিন্তু আদৌ পেনসন কোনদিন পাবে কিনা জানে না। তাছাড়া তার টাকার খবর সে বাড়িতে জানতে দিতে চায় না।

সুজিত বলে,—টাকা! টাকা আমি কোথায় পাবো মা?

—শুনি খেলে টাকা পাস।

—টাকা পাওয়া যায় নামী-দামী টিমে খেললে। এসব ছোটটিম টাকা দেবে কোথা থেকে? হ্যাঁ আমি আজ বহরমপুর যাচ্ছি মা। ট্রেনে খাবার নিয়ে যাবো। খানিকটা পরোটা আর আলুর দম করে দিয়ো। সন্দেশটা আমিই কিনে নেব।

সাবিত্রী চুপ করে যায়। শিখা সমস্ত ব্যাপারটা দেখেছে। সে-ও জানে বাড়ির অবস্থা। বাবাও কেমন যেন দিশেহারা হয়ে গেছে। শিখা গতকাল তার টিউশনির টাকাটা পেয়েছিল। সে বলে,

—মা। চলো আমি টাকা দিচ্ছি।

সাবিত্রী যেন আধারে এতটুকু আলোর সন্ধান পায়। অনেক জ্বালায় বলে,

—সংসার চালাবার জন্য এবার থেকে ছেলেদের কাছে হাত না পেতে মেয়ের কাছেই হাত পাততে হবে।

—মা কথাটা বিজিতকে শুনিয়েও বলে। বিজিত মায়ের কথাটা শুনতে পায়। বাবার অসহায় অবস্থাটাও দেখেছে। বিজিত বুঝেছে এবার তার কিছু করা দরকার। সুজিত ওদিক থেকে মাকে তাড়া দিতে থাকে।

মা হলো খাবার? আমার ট্রেনের সময় হয়ে গেল। কি যে করো।

মা এরমধ্যে ওর জন্য খানকয়েক রুটি বানিয়েছে সঙ্গে আলুর দম। একটা কৌটোয় দিয়ে বলে,

—রুটি দিলাম।

—সেই জুতোর শুকতলা মার্কা রুটি আর আলুর দম। তোমাদের জন্য বাইরে আর প্রেস্টিজ থাকবে না। দাও—

সে ওই নিয়ে ব্যাগে পুরে বলে,

—চলি। শীল্ড জিততে পারলে তোমাদের জন্য বহরমপুরের ছানাবড়া নিয়ে আসবো, বাই—

সুজিত চলে যায়। বিজিত বলে,

—শিখা তোর সামান্য কটা টাকা থেকে আর কত দিবি?

শিখা বলে,

—বাবার মুখের দিকে চাওয়া যায় না রে। পেনশন কি আর পাবে না? সারাজীবন খেটে এটুকু পাবার কি হক নেই?

ভবেশবাবু বাজার করতে গেছেন। ফিরে এসে ভাতে ভাত খেয়ে আবার পেনসন অফিসে যেতে হবে? এবার আর জমানো পুঁজি নেই। বছর কয়েকের বকেয়া পেনশনই ভরসা। ওটা না পেলে এবার উপোস দিতে হবে।

সকালের দিকে বাবুরা বাজার করে। তাই তখন বাজারে দরও থাকে বেশি। বেলা বাড়তে অফিসের বাবুদের বাজার হয়ে যায়। তখন বের হয়ে যায়, ভবেশবাবুর মত বাতিল লোকরা। ওই সময় আনাজপত্র কম দামে পাওয়া যায় আর বিক্রেতাদের বাড়ি

ফেরার তাড়া থাকে তাই কম দামে তারাও ওইসব মাল ছেড়ে দেয়।

ভবেশবাবুও বাজার ঘুরে ঘুরে কেনাকাটা করেন—হাতে সবজির ব্যাগ—শরীরটা ক্লান্ত। কোনমতে ফিরছেন হঠাৎ পথের একটা পাথরে ছিটকে পড়েন তিনি। ছড়িয়ে যায় আনাজপত্র। দু একজন দোকানদার, পথচারীই ওকে তোলে। তারাই ওর ছড়ানো আনাজপত্র তুলে দেয় ব্যাগে। হাঁটুতে বেশ জোরে চোট লেগেছে। একজন বলে,

—বাড়িতে কি ছেলেরা নেই যে আপনি বুড়ো মানুষ এইভাবে বাজার করতে বেরিয়েছেন। আর কত বোঝা বইবেন?

ভবেশেরও মনে হয় সংসারের বোঝাটা এবার সত্যিই ভারি হয়ে উঠছে বইবার শক্তি তার নেই।

কোনমতে বাড়ি ফেরেন ভবেশবাবু। হাঁটুটা ছড়ে গেছে কাপড়ে রক্ত। সাবিত্রী আর্তনাদ করে ওঠে।

—একি করে এসেছো গো? ওরে বিজিত —শিখা—

ওরাও মায়ের গলা শুনে বের হয়ে আসে। ব্যাগটা রেখে ভবেশবাবু দাওয়ায় বসে পড়েছেন। বলেন,

—ও কিছু না। হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম হাঁটুটা একটু ছড়ে গেছে।

শিখা ততক্ষণে বাবার ক্ষতটা পরীক্ষা করে বলে,

—বেশ লেগেছে না বাবা। আমি একটু ডেটল লাগিয়ে দিচ্ছি—

—না-না ও কিছু না। ঠিক হয়ে যাবে। কই গো তোমার ভাত হলো। আজ একবার যাই পেনসন অফিসে দেখি বাবুদের দয়া হয় কিনা?

বিজিত বাবার এই উৎকণ্ঠার কথা জানে। বছর খানেক ধরেই এ ব্যবস্থা চলছে। তবু পেনসনের কোনও সুরাহা হয়নি। বাবার মুখেও শুনেছে যে কাগজপত্র সব রেডি হয়ে গেছে তবু কোনও এক অদৃশ্য কারণে পেনসন আর স্যাংশন হচ্ছে না। অসহায় মানুষটাকে দেখে বিজিতের দুঃখ হয়। সে বলে,

—এই অবস্থায় ওই পা নিয়ে সল্টলেকের অফিসে যাবে?

—কি করি বল? যাতায়াত করি যদি ওদের মন টলাতে পারি। না হলে তো বাঁচার আর কোনও পথই নেই রে। এরপর তো হাড়িও আর চড়বে না।

বিজিত একমনে ভাবতে থাকে। একটা মানুষের এই প্রশস্ত সংগ্রাম দেখে সে। বলে,

—তোমার কাগজপত্রগুলো আমাকেই দাও—

—তুই কি করবি?

—আমি নিজে যাবো দেখি যদি কিছু করা যায়।

ভবেশবাবু বলে,

—আমি এতদিনে পারিনি আর তুই কিনা একদিনে করবি?

সাবিত্রী বলে,

—তবু খবরটা তো নিতে পারবে। আজ আর তোমাকে ওই পা নিয়ে যেতে হবে

না। বিজিতই যাক ওই অফিসে।

পেনসন অফিসটা সল্টলেকের দিকে। ও জায়গাটায় ঠিকানা খোঁজা মুস্কিল। বাস যায় তবে তাও খুব কম। তবু ওই পেনসন অফিসের সামনে লোকজনের ভিড় থাকে অফিস টাইমে। বেশ কিছু বৃদ্ধ লোক রোজই অফিসের সামনে চাতক পাখির মতো ঘোরাফেরা করে। কেউ-বা ক্লান্ত শরীরে গাছতলায় বসে পড়েছে। সকলেরই মুখ প্রায় করুণ। মলিন বেশবাস। চোখে চশমা। অনেকের আবার হাতে লাঠিও রয়েছে। কতদূর দূর থেকে এরা এখানে ধর্না দিয়ে পড়ে আছে যদি তাদের পেনসনের কিছু সুরাহা হয়।

পেনসন অফিসের বাবুরা এগারোটা নাগাদ অফিসে আসে। বিজিত এদিক-ওদিক ঘুরে বেশ নাজেহাল হয়েই অফিসের সন্ধান করে এসে দেখে তখন ঘড়িতে সাড়ে দশটা বাজে। বাবুদের অবশ্য তখনও দেখা নেই। এরমধ্যে নানা এলাকা থেকে বৃদ্ধ অশক্ত বেশ কিছু মানুষ এসে জমায়েত হয়েছে। তাদের মধ্যে নারী-পুরুষও রয়েছে। বেশিক্ষণ দাঁড়াবার ক্ষমতাও তাদের নেই। তাছাড়া কেউ এসেছেন দূর মফস্বলের গ্রাম-মহকুমা শহর থেকে। অনেকেই রাত জেগে ট্রেনেও এসেছে মুড়ির পোটলা সঙ্গে নিয়ে। কারো-বা সঙ্গে লোকও আছে।

বিজিত এদিক-ওদিক তাকিয়ে সেসব দেখতে থাকে। গাছতলায় এক উসখো-খুসকো চেহারার ভদ্রলোককেও দেখতে পায়। মুখে একরাশ দাড়ি। পরনের জামা-কাপড়টাও নোংরা। উনি বছর তিনেক ধরে এখানে ঘুরতে ঘুরতে পেনসন না পেয়ে একরকম পাগল হয়ে গাছতলায় বিড়বিড় করে কাল্পনিক স্কুল খুলেছেন। বিনা বেতনে, বিনাছাত্রে ইতিহাস পড়াচ্ছেন কয়েক বছর ধরে।

একজন ওদের মধ্যে ধূপকাঠি বিক্রির চেষ্টা করছে। তিনিও আড়াই বছর ধরে পেনসন না পেয়ে এখন ধূপকাঠি বিক্রি শুরু করেছেন। এই অফিস চত্বরে, তাতে নাকি কিছু আয়ও হয় আর পেনসন কেসের তদারকও করা হয়। এত করেও সুফল কিছু হয়নি। বিজিত দেখছে ওদের। তার মনের মধ্যে তীব্র একটা জ্বালা যেন ঠেলে উঠছে।

ঘড়ির কাঁটা এগারোটা পার হয়ে গেছে। অফিসে দু-চারজন বাবুরা আসতে শুরু করেছে। বিজিত তখনও অপেক্ষা করছে। কয়েকজন দূরাগত বৃদ্ধ-বৃদ্ধা তখন তাদেরই ঘিরে ধরে। কর্মচারীদের মধ্যে একজন বলে,

—আরে মশাই সিটে বসতে দিন। তারপর ফাইল দেখবো। সল্টলেকের অফিসে আসা কি কম ধকলের কাজ মশাই। একটু দম নিতে দিন। ওরা দম নেবার জন্য এবার অফিসের সিটে বসে হাঁক পেড়ে চা, জল আনাতে ব্যস্ত। বিজিত তখন ওদের সেইসব কার্যকলাপ দেখছে। বৃদ্ধ বৃদ্ধারা তখন মরিয়া হয়ে তাদের পেনসনের খবর নিতে চেষ্টা করছে। কিন্তু বাবুদের টেবিলে তখন চা আর খবরের কাগজ এসে পড়েছে। বেশ কয়েকজন চায়ের কাপ নিয়ে খবরের কাগজ পড়তে শুরু করেছে। একজন বলে,

—এ সরকারও তেমন কিছু করে না রে। দেখছিস না এদের ভাবগতিক সুবিধার নয়।

কেউ বলে,—ইরাকের মানুষদের ওপর প্রতিবাদ হওয়া উচিত। মানবাধিকার কমিশন কি করছে।

এদিকে তখন মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত বৃদ্ধ বৃদ্ধার দল আবেদন নিবেদন করছে।

—ভাই আমার কেসটা।

—ক'বছর ধরে ঘুরছি মশাই তবু পেপার রেডি হল না।

—অফিসের ভদ্রলোক চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলে,

—মাসে মাসে এতগুলো টাকা পাবেন। এরিয়ার পাবেন একটু ঘুরবেন না। অন্যজন বলে,

—আরে মশাই, জেলা অফিসই দেরী করে পেপার তৈরি করে। সেখানে যান।

—কিন্তু তারা ছ'মাস আগে সমস্ত পাঠিয়ে দিয়েছে।

—ভদ্রলোক গম্ভীরভাবে বলে,

সময় লাগবে মশাই। সময় লাগবে। সরকারি টাকা বলে কথা।

বিজিত এবার এগিয়ে আসে। বাবার কাছে তার কেসের ডিলিং ক্লার্কের নামটা জেনে এসেছিল। বিজিতের মাথায় এসব দেখেশুনে আগুন চেপে গেছে। দেখছে এই মানুষগুলোর এতটুকু সহানুভূতি নেই। এরমধ্যে দু-একজন দালালও জুটে গেছে। ওরা দু-একজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে অন্যদিকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলে,

—আপনাদের কেস তিনমাসের মধ্যে করে দোব। পেনসনও পেয়ে যাবেন। তবে ইয়ে মানে কিছু খরচ-খরচা করতে হবে।

বিজিত দেখছে সেই দালালদেরও অফিসে যাতায়াতের অবাধ স্বাধীনতা রয়েছে। আর তাদের এলেমও আছে। বিজিত এবার ওই বাবুদের সিটের কাছে এগিয়ে আসে। বিজিত বলে,

—ঘোষবাবু কে?

ওদিকে এক ভদ্রলোক মন দিয়ে তখন খবরের কাগজ পড়ছে। সামনে চায়ের কাপ। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট নিয়ে খবরের কাগজের পাতায় গভীর মনঃসংযোগ করছে। অন্যজন তাকে দেখিয়ে বলে,—ওই তো ঘোষবাবু।

বিজিত এবার ওর হাতের খবরের কাগজটা টান মেরে সরিয়ে বলে,—এটা খবরের কাগজ পড়ার জায়গা নয়।

ঘোষবাবুও এমন কাণ্ড কেউ ঘটাবে ভাবতে পারেনি। সে-ও ওই তরুণের উদ্দেশ্যে ফুঁসে ওঠে।

—আপনি কে মশাই অফিসে ঢুকে মস্তানি করবেন,

বিজিত এবার ওর কলার ধরে হ্যাঁচকা টানে চেয়ার থেকে তুলে ধরেছে। গর্জে ওঠে।

—মাসের পর মাস, বছরের পর বছর এরা পথে পথে ভিখারীর মত ঘুরবেন, এদের ন্যায্য প্রাপ্য পাবে না আপনাদের জন্য। কি ভেবেছেন আপনারা? সরকারের

মাইনে নেন কিসের জন্য? অফিসে এসে খবরের কাগজ পড়ার জন্য—নাকি ঘুমোবার জন্য।

ঘোষবাবু বলেন,

—এসব কি হচ্ছে? অফিসে মস্তানি।

বিজিতের এই কাণ্ড দেখে এবার বঞ্চিত বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও খুশি। তারা বলে,

—ঠিকই করেছ। আমরা কি মানুষ নই?

বিজিত বলে,

—আপনাদের এই দুর্ব্যবহার-ই আমাদের মস্তান করে তুলেছে। এসব কেসের পেপার তো তৈরি। এই যে ভবেশ রায়-এর কেসের, বছর ঘুরে গেল কি করছেন? জবাব দিন—নইলে মস্তানির আরও নমুনা দেখাবো। তুলে আছাড় মারবো—এত লোকের কারো পেপারস হয়নি। বৃদ্ধের দল এবার সোচ্চার হয়ে ওঠে।

—আজ তিনবছর ধরে ঘুরছি।

সেই ইতিহাসবিদ শিক্ষকও এসে পড়ে। ওদিকে গোলমালে ঠেলাঠেলিতে একটা টেবিল উলটে পড়ে। অন্য কয়েকজন কর্মচারীও এসে পড়ে। ওরা চেষ্টা করছে বিজিতের শক্ত হাত থেকে ঘোষবাবুকে উদ্ধার করতে। অফিসে হইচই কলরব শুরু হয়। এরমধ্যে অফিসের বড় কর্তাও এসে পড়েন। তিনিই কোনরকমে থামান এখণ্ড যুদ্ধকে।

ততক্ষণে উত্তেজিত কর্মীরা চিৎকার করে, আর এতদিনের বঞ্চিত সেই বৃদ্ধ মানুষের দলও আজ তাদের থেকেও বেশি জোরে গলা তুলেছে।

বিজিত বলে,

—আমরা কি বছরের পর বছর ঘুরবো। আমাদের ন্যায্য প্রাপ্য কেন পাব না?

বড় সাহেবই এবার বিজিতকে বলে,

—এর প্রতিকার হবে। আপনারা শান্ত হোন। আমি আজই ফাইলগুলো দেখে যা করার তা করবো। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। আমি নিজে দেখছি। কথা দিচ্ছি এরপর আর অযথা কারো কোনও কেস আটকে থাকবে না।

বিজিতকেও তিনি ডেকে নিয়ে যান তার ঘরে। আরও কয়েকজনকে ডাকেন।

ভবেশবাবু সন্ধ্যার দিকে দুটো টিউশানি করেন,। কদিন ধরেই সংসারের অভাবের ছাপটা প্রকট হয়ে উঠছে। এই সমস্যা সমাধানের পথ সামনে নেই। পেনসনও কবে পাবেন জানেন না। পা-টাতে ভীষণ ব্যথা তবু ওই ব্যথা নিয়েই টিউশানিতে এসেছেন। কাজে ফাঁকি দিতে তার বিবেকে বাধে। কোনও রকমে বাড়ি ফিরেছেন ভবেশবাবু। সাবিত্রীকে বলে,

কি গো বিজিত ফেরেনি? সেই যে অফিসে গেল—

সাবিত্রী বলে,

—না তো?

এসময় বাড়ির দরজায় কড়াটা নড়ে ওঠে। ভবেশবাবু বলেন,

—ওই এসেছে বোধহয়। দ্যাখো কোন খবর এনেছে কি না? ঘোষবাবু তো বলেছেন এ সপ্তাহে হয়ে যাবে। কিন্তু ঢুকছে পাড়ার গোপাল মুদি। বড় রাস্তার ওদিকে ওর পৈত্রিক মুদিখানার দোকান। এতদিনে ওর দোকানেই মাল নিয়েছেন ভবেশবাবু। কিন্তু মাস ছয়েক হল ওর টাকাও বাকি পড়েছে। ওই গোপাল কদিন ধরেই যাতায়াত করছে। গোপাল বলে,

—বলেছিলেন আজ টাকাটা মিটিয়ে দেবেন। দু-মাসের প্রায় চার হাজার টাকা বাকি পড়ে আছে —এবার আর টাকা না নিয়ে যাবো না।

ভবেশবাবু বলেন,

—টাকার যোগাড় করতে পারিনি গোপাল। আজ বাজারে হোঁচট খেয়ে হাটুতে চোট পেলাম। দু-এক জায়গায় যাবার কথা যেতেও পারিনি কদিন ধরে।

গোপাল এবার ফুঁসে ওঠে।

—দেখুন মাস্টারমশাই। এত সর্ত করে মাল দিইনি। এতদিন ধরে টাকা বাকি রেখেছি। এবার দেখছি টাকা মেরে দেবার মতলব করছেন। আমি যে সে লোক নই মশাই। টাকা কি করে আদায় করতে হয় জানি। আচ্ছা লোকতো মশাই ইতর ছোটলোক।

কথাগুলো যেন ভবেশবাবুর গালে এক একটা চড়ের মতো আঘাত করে। আর্তনাদ করে ওঠেন তিনি,

—না-না গোপাল বিশ্বাস করো।

—আপনাকে আর বিশ্বাস করি না মশাই। আগে মাস্টার বলে মান খাতির করতাম। এখন দেখছি জোচ্চোর ফেরেব্বাজ।

সাবিত্রী শিখাও বের হয়ে এসেছে। দেখছে তারা ভবেশবাবুর নিদারুণ অসহায় অবস্থাটা। তাদেরও করার কিছু নেই। গোপাল বলে, গলায় গামছা দিয়ে এবার টাকা আদায় করবো। এমন সময় বাড়িওয়ালা ধরণীবাবু ঢুকেছেন বাড়িতে। সে-ও আশা করেছিল বাড়তি ভাড়া সমতে বাড়ি ভাড়া তার বাড়িতে পৌঁছে যাবে। আগে তাই যেতো। কিন্তু ক'মাস ধরে বাড়ি ভাড়া আর পৌঁছায় নি। অথচ ভাড়াটেরা বাড়ির সন্ধানে হন্যে হয়ে তার কাছে আসছে। এই বাড়ির ভাড়া পাবেন এখন কম করে আড়াই হাজার টাকা সেই সাথে বিশ হাজার টাকার সেলামী। এবার ধরণীবাবুও গোপালের লম্ফঝম্ফ দেখে বুঝেছে সে টাকা পায়নি, তাই ধরণীবাবু আজ স্বমূর্তি ধরে বলেন,

—ভবেশবাবু আর বাড়ি ভাড়ার দরকার নেই মশায়। মানে মানে বিদেয় হোন এবাড়ি ছেড়ে। তিনমাস ভাড়া বাকি আর আজও চুপ করে থাকবো না। এখন দেখছি আমার টাকাও মারতে চান।

ভবেশবাবু এবার দুজনের যুগপৎ আক্রমণে ধরাশায়ী হবার উপক্রম। কি উত্তর দেবেন জানেন না। কোনও কথাই আর তার বলার নেই।

ওদিকে গোপালও বলে,—টাকা দেবার কি হবে তাই বলুন। ধরণীবাবু ছাড়লেও

আমি ছাড়বো না মশাই। মহাজনের টাকা তো দিতে হবে। নইলে মহাজন আমার মালপত্রই আটকে দেবে।

বিজিত বাড়ি ঢুকছে। সে দরজার বাইরে থেকে ওদের তর্জন-গর্জন শুনেছে। বাড়ি ঢুকে দেখে বাবার চোখে-মুখে কাতর অসহায় চাহনি, বিজিত বলে,

—আপনার টাকা আপনি পাবেন গোপালবাবু, আর ধরণীবাবু আপনার সব টাকাই পরশু পাবেন।

গোপাল বলে,

—বাবা তো একথা কদিন ধরেই বলছে এবার তুমি!

ধরণী বলে,

—তা টাকাটা আসবে কোত্থেকে। লটারি পেয়েছ নাকি? না সরকারি চাকরি?

ভবেশবাবুও বুঝতে পারে না বিজিত কোথায় টাকা পাবে। ছেলের দিকে চেয়ে থাকেন তিনি। বলেন,—কি বলছিস বিজিত? এতটাকা কোথায় পাবি পরশু?

বাবা, আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে থেকে তোমার পেনসন-এর অর্ডার করিয়ে নিয়ে এসেছি। পেনসন বুক, এরিয়ার পেনসন-এর চেক এসবও তৈরি করে এনেছি। কাল সই করে তোমায় নিয়ে যাবো ব্যাঙ্কে। পরশুর মধ্যে টাকাটা পেয়ে যাবো। আর সামনের মাস থেকে পেনসনও পাবে ব্যাঙ্ক থেকে।

ভবেশবাবু উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন,—সত্যি বলছিস বিজিত!

হ্যাঁ। আর ধরণীবাবু, গোপালবাবু আপনারা পরশু সন্ধ্যায় আসবেন। সব টাকা পেয়ে যাবেন।

গোপাল টাকা পাবার আশা দেখে বলে,—তাই আসবো। মানে জানো না তো মহাজনের টাকা। তারা তো ছাড়ে না। তাই মাথার ঠিক থাকে না।

ধরণীবাবু বলেন,

—তাহলে ওই কথাই রইল। চলি—তবে হ্যা ওই বাড়তি ভাড়াটা চাই কিন্তু।

ওরা চলে যাবার পর সাবিত্রী এগিয়ে আসে। আজ এতদিন পর এই নিরাশার সংসারে বিজিত যেন আশার আলো নিয়ে আসে।

সাবিত্রী বলে,

—তাহলে পেনসন বকেয়া পেনসন সব পাবে কাল। কত টাকা রে?

বিজিত বলে,

—মাসে মাসে হাজার পাঁচেক আর বকেয়া পেনসনও হবে প্রায় ষাট হাজার টাকার মতো।

ভবেশবাবু বলেন,

—ওরে বিজিত। আমি যা এতদিন ধরে এত চেষ্টা করে পারিনি—তা তুই একদিনেই করতে পারলি কি করে?

—অবশ্য ডোজটা একটু কড়াই হয়ে গেছল। কিন্তু মাথার ঠিক রাখতে পারিনি। তাতেই অফিসে হইচই পড়ে যায়। খোদ বড় সাহেব এসে পড়েন। আর প্রায় চল্লিশজনের

বকেয়া পেনসনের কেসের মীমাংসা হয়ে গেল আজ। তারাও দু-তিন বছর ধরে ঘুরে ঘুরে শেষে নিশ্চিন্ত হয়েছে।

ভবেশবাবু বলেন,

—ঠিকই করেছিস রে। আজকের সংসারে বেঁচে থাকতে গেলে ফোঁস করতেই হবে।

সাবিত্রী বলে,

—নে বাবা। হাত-মুখ ধুয়ে নে, সেই সকালে বের হয়েছিস। খেয়ে নিবি চল।

—তাই যা বাবা। আজ তুই এই সংসারের মানুষদের মুখের অন্ন এনেছিস বাবা।

বিজিত শিখা খেতে বসেছে। শিখা এবার উচ্চমাধ্যমিক দেবে। শিখা বলে,

—বাবা-মা আজ খুব খুশি হয়েছে রে দাদা। তবু সংসারের কিছুটা সুরাহা হলো। তুইও এবার এম.এ-টা পাশ কর। অর্কদা বলেছিল তুই পড়লে ফার্স্ট ক্লাস পাবি রে। তখন অধ্যাপক হতে পারবি।

—ওসব আমার কাছে স্বপ্নরে। নিজের ভবিষ্যত সুখী গড়ার চেয়ে তোদের বর্তমানকে সুখী করাটাই আমার একমাত্র কাজ। তাই আর পড়ার কথা ভাবছি নারে—দেখি যদি কোন চাকরি পাই।

শিখা বলে,

—বাবার তো এরিয়ার পেনসন পেয়েছে।

—বাবা চান ওই টাকায় তোর বিয়ে দিতে।

ভবেশবাবুই কথাটা বলেন সাবিত্রীকে,

—কন্যাদায় মহাদায়—শিখার বিয়েটা দিতে পারলে আমি নিশ্চিন্ত হই। এ টাকা থেকে ওই কাজই করবো।

বিজিত সায় দেয়,

—তাই ভালো বাবা।

—কিন্তু তোর পড়ার খরচও আছে।

—বাবা, এখন থেকে আমি টিউশনি বা পার্টটাইম কোনও কাজই খুঁজে নেবো। আর যদি পারি প্রাইভেটে পড়াটা চালাবো।

শিখা বিজিতকে জানায়,

—বাবার ধারণাটা সেকেলেই রয়ে গেছে। বিয়ে থা করে বন্দি হবার চেয়ে আমি নিজের পায়েই দাঁড়াতে চাই দাদা।

—দেখা যাক। তবে আমার মনে হয় বাবার উপর আর চাপ না দেওয়াই ভালো। আমিও বাবাকে একটু স্বস্তি দিতে চাই—তাকে ভাবনামুক্ত করতে চাই।

বিজিতের পরীক্ষার ফল বের হতে আর বেশি দেরী নেই। এরমধ্যে বিজিত কয়েকটা অফিসে যাতায়াত শুরু করেছে। একটা অফিসে দরখাস্ত আর বায়োডাটা জমাও দিয়েছে। তারাও কথা দিয়েছে সময়মত তার নিয়োগপত্র যাবে। কিন্তু এখনো সেরকমভাবে কোনও চিঠি আসে নি। তাই বিজিত এবার চিন্তায় পড়েছে।

অর্ক কদিন কলকাতায় ছিল না। ও গেছল তার মফস্বল শহরের বাড়িতে। ফিরেছে অর্ক। অনিমেষ আর অর্ক এসেছে বিজিতের বাড়িতে।

ভবেশবাবু বলেন,

—কালতো তোমাদের রেজাল্ট বের হচ্ছে অর্ক, অনিমেষ।

—তাইতো ভাবছি।

—ভাবার কিছু নেই এবার ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে যাও। কি অনিমেষ?

শিখা ওদের জন্য চা, মুড়ি নিয়ে আসে। ভবেশবাবু বলেন,

—তোমরা কথা বল। যাই টিউশনিটা সেরে আসি।

তখন সন্ধ্যা নামছে। ভবেশবাবু ইদানীং চোখেও কম দেখছেন। ছানি পড়েছে। তবু বের হতে হয় জীবিকার সন্ধানে।

বিজিত বলে,

—বাবাকে এই টিউশনির চাপ থেকে মুক্তি দিতে হবে। এবার একটা কিছু করতেই হবে।

বড়লোকের মেয়ে নিবেদিতা। তবু নিবেদিতার মনে যেন ওই বিজিতের কথা মনে পড়লে একটা সুর জাগে। ও চায় বিজিতের মত ছেলে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হোক। তাই সে-ও ওদের পরীক্ষার ফলের জন্য উদগ্রীব হয়েছিল। ওইদিন নিবেদিতাও কলেজে এসেছে। ওদিকে অফিসে তখন ছাত্রদের ভিড়। কলেজের বোর্ডে পরীক্ষার রেজাল্ট-এর কাগজ টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। ছেলেমেয়েরা সেখানে ভিড় করেছে। অখিল এবারেও পরীক্ষা দিতে পারেনি। টেস্টে-ই গোঁতা খেয়েছে।

নিবেদিতার সেকেন্ড ইয়ার চলছে। তাকে ওই রেজাল্টের বোর্ডের দিকে চেয়ে নাম খুঁজতে দেখে অখিল বলে,

—কার নাম খুঁজছ? নিশ্চয় নিজের নয়—বোধহয় ও ব্যাটা বিজিতের?

নিবেদিতা জবাব দেয় না।

অখিলই বলে,

—ওর নাম ওই লিস্টে পাবে না ম্যাডাম। ও শালা লটকেছে।

নিবেদিতা চমকে ওঠে।

তখনও বিজিত, অর্করা আসেনি। নিবেদিতা ভাল করে ওদের নাম খুঁজে দেখে সব ঠিকঠাকই রয়েছে। ওরা তিনজনেই ভালোভাবে পাশ করেছে অবশ্য অর্কের নাম্বারই বেশি। তারপর বিজিত। তারপর অনিমেষ। নিবেদিতা খুশি হয়। দেখে কলেজের লবির ওধার থেকে তিনমূর্তি হন হন করে আসছে। অনিমেষ নিবেদিতাকে দেখে বলে,

—কিরে নিবেদিতা! ওই অবধি যাবো না কেটে পড়বো রে।

নিবেদিতা খুশি ভরে বলে,

—না রে। দারুণ রেজাল্ট হয়েছে তোদের। বিজিতদা তুমিও অনার্স পেয়েছ। অর্কদা তো টপ।

অনিমেষ বলে,

—আর আমি টেনেটুনে পাশ করেছি?

—না-না। তুইও ভালোভাবেই উতরেছিস্। দ্যাখনা—

বিজিত, অর্করা আজ দারুণ খুশি। অর্ক বলে,

—যাই বাবাকে একটা ফোন করতে হবে। পরে দেখা হবে।

বিকেলে বিজিত ফিরছে সঙ্গে নিবেদিতা। ওর গাড়িতে ফিরছে বিজিত।

নিবেদিতা বলে,

—আজ তোমাকে খাওয়াবো—চল চৌরঙ্গির দিকে।

বিজিত জানে তার পকেট শূন্য। তবু বলে সে,

—ওটা তো আমারই করা উচিত। কিন্তু—

নিবেদিতা বলে,

—ওসব পরে হবে। চলতো—

সন্ধ্যা নামছে ময়দানে। গাড়ি থেকে নেমে ওরা দুজনে বসে আছে সবুজ ঘাসে। মাঠ এখন কিছুটা ফাঁকা—দু-একটা আলো সবে জ্বলে উঠেছে।

নিবেদিতা বলে,

—এবার এম.এ টা কর।

—আমি নিজেকে নিয়ে ভাবি না নিবেদিতা। আমার চাওয়ার জগৎ আলাদা। আমি চাই আমার আশপাশে যারা আছে তাদের সুখী করতে। তাই হয়তো নিজের কথাটা সব সময় ভাবা হয়না।

—তা ভাবো। তবু নিজেরটাও তো ভাবা দরকার।

সন্ধ্যার আঁধার ঘনাচ্ছে। এমন আঁধারের মাঝেও আলোগুলো জ্বলে ওঠে। নিবেদিতার মনেও অমন আলোর প্রকাশ জাগে বিজিতকে ঘিরে। তার মনও এক নিভৃত স্বপ্ন দেখে। তার মনেও কিসের সুর ওঠে বিজিতকে কেন্দ্র করে।

বিজিত কথাটা বারবার ভেবেছে আর তাই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজিত। অনিমেষ এবার একটা কিছু করতে চায়। তাই অফিসে বসার কথা ভাবে। বিজিত বিভিন্ন অফিসে ঘোরাঘুরি করছে। সেদিন অনিমেষকেও বলেছে,

—একটা কিছু করতে হবে। আর পড়াশোনা হবে না রে।

—অনিমেষদের ব্যাবসা এখন অনেক বেড়েছে। দেশে-বিদেশে তাদের মালের কাটতিও বেশ। নরেশবাবু বিদেশের বাজারের দিকেই বেশি নজর দিয়েছেন। ইংল্যান্ড আমেরিকাতেও তাদের মাল যাচ্ছে।

নরেশবাবু বলেন,

—অনিমেষ তুমি ওই বিদেশের ব্যবসাপত্রগুলোই দেখবে। ওখানের এজেন্টদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে। আর সিপমেন্ট যেন হয় ঠিক সময়ে তাই দেখবে।

অনিমেষ তারপর থেকে অফিসে বের হচ্ছে। অর্ক এখন এম.এ করছে। তবু ওদের যোগাযোগ ঠিকই হয়। ছুটির দিন অনিমেষের বাড়িতে ওদের আড্ডা বসে। কখনও

বিজিতদের বাড়িতে আড্ডা জমে। শিখাও যোগ দেয় সেই আড্ডায়। চা-মুড়ি সাপ্লাই করে। শিখা বলে,

—দেখো অর্কদা-অনিদা আমাদের বাপু চা-আর মুড়ি বড়জোর আলুর চপ অবধি দৌড়, তোমাদের মত কাটলেট দিয়ে আপ্যায়ন করতে পারবো না।

অর্ক বলে,

—এই তো ভাল। তবু নিজেকে এই মাটির মানুষ বলে মনে হয়। আর তোমার মুড়ি মাখাটাও দারুন।

অনিমেষ অর্ককে দেখে। অনিমেষ, অর্ক আর শিখার মধ্যে নিবেদিতা আর বিজিতের সম্পর্কটা খুঁজে পায়। বুঝতে পারে শিখার চোখের ভাষা সেই উষ্ণতার ছোঁয়া, যে-ছোঁয়ায় নিবেদিতা বিজিতের জন্য পথ চেয়ে বসে থাকে।

কোনদিন বিজিত আড্ডায় না এলে নিবেদিতাই বলে,

—আজ তোদের সেই বিপ্লবী বন্ধুর দেখা নেই যে।

অনিমেষ বলত,

—তার এত খোঁজে তোর কি দরকার?

নিবেদিতা দাদার কথার জবাব দিতে না পেরে কিছুটা বিব্রত বোধ করে। তবু সামলে নিয়ে বলে,

—থ্রি মাস্কেটিয়ার্সদের একজন কে না দেখলে কেমন লাগে। তাই বললাম।

অনিমেষ অর্ককে দেখে। ওই সলজ্জ মুখচোরা তরুণের মনেও যেন শিখার একটা ঠাঁই রয়ে গেছে। ওরা স্বপ্ন দেখে।

অনিমেষ কঠিন বাস্তবে মানুষ হয়েছে। সেই প্রাচুর্য আছে। সেই বিলাসিতা আছে। তাই মনের পাওয়ার দাবিটা স্বতন্ত্র। তারা চায় পার্থিব জগতের সব সুখ। তাই বোধহয় অনিমেষের জীবনে তেমন কেউ আসেনি। সে কারো জন্য পথ চেয়ে প্রতীক্ষা করে থাকে না।

নিবেদিতা রয়েছে অনিমেষের বসার ঘরে। নিবেদিতা জানে বিজিতের সংসারের অবস্থা। তবু নিবেদিতার কেমন যেন দুর্বলতা রয়েছে বিজিতের জন্য। সে-ও চায় বিজিত পায়ের নীচে মাটি পাক। অনিমেষও ভেবেছে কথাটা। বিজিতের জন্য কিছু করতে পারলে সে-ও খুশি হবে। তাই সেদিন অনিমেষ তার বাবা নরেশবাবুকে কথাটা বলে। নরেশবাবুও বিজিতকে দেখেছেন। অবশ্য নরেশবাবু যখন বসার ঘরে থাকেন তখন অন্য মানুষ। তখন খেলার জগতের লোকজন, অনেক ক্লাবের কর্মকর্তারা তার কাছে আসেন। আই এফ. এ-র সদস্য তিনি আবার ইস্টবেঙ্গল ক্লাবেরও সভাপতি ফুটবল খেলার জন্য প্রচুর টাকাও ব্যয় করেন। ওর ক্লাবের সেক্রেটারি বিপুল বাবু ওর নিত্যসঙ্গী। খেলার জগতের বিশেষ পরামর্শদাতা। তখন সেই বিরাট শিল্পপতি অন্য মানুষ। নিবেদিতাও বাবার এই স্বাভাবটা পেয়েছে। সেও খেলার জগতের অনেক খবর রাখে। নরেশবাবুর অফিসে খেলার জগতের লোকদেরই আনাগোনা।

নরেশবাবু এমনিতে হৃদয়বান লোক। অনেক দুস্থ খেলোয়াড়কে তিনি তাদের কোম্পানির ট্রাস্ট থেকে নিয়মিত সাহায্য করে থাকেন। সেদিন অনিমেষও ওর বাবাকে বলে,

—বাবা বিজিত খুব ভালো ছেলে। বিজিত অনার্স নিয়ে পাশ করেছে। তবে বাড়ির অবস্থা তেমন নয়। ওকে যদি আমাদের কারখানায় একটা কাজকর্ম দিতে পারেন। এখন তো নতুন মিলে লোকজন নেওয়া হচ্ছে।

নিবেদিতা ওদিকে বসে একটা খেলার পত্রিকা দেখছিল। সে-ও শোনে দাদার কথা। নরেশবাবু বলেন,

—ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে পাশ করেছে?

—হ্যাঁ বাবা।

—তোমার বন্ধুকে ওই সেমি স্কিলড মিস্ত্রীর কাজে না ঢুকিয়ে ওকে দুবছর ট্রেনিং কোর্স করতে বলে।

বিজিতও এইসময় এসে পড়েছে। ওদের বসার ঘরে। অনিমেষ ওকে দেখে বলে,

—বাবা, এই বিজিত-এরই চাকরির ব্যাপারে বলছিলাম।

নরেশবাবু বিজিতকে দেখছেন। এবার নিবেদিতাও এগিয়ে এসে বলে, —খুব ভালো ছেলে বাবা। সৎ-ভদ্র—

নরেশবাবু বিজিতকে বলেন,

—ওই সামান্য চাকরি করা কি ঠিক হবে?

বিজিতের এখন কাজের দরকার। তাই কোনরকম দ্বিধা না করে সে বলে,

—তাই করবো।

—তার চেয়ে আমি যা বলি শোন। তোমার ভাল হবে এতে। তুমি আমাদের কোম্পানির কাছে পড়ার জন্য সাহায্য চেয়ে একটা দরখাস্ত দাও। আমাদের ট্রাস্ট থেকে তোমায় ট্রেনিং কলেজে পড়ার ব্যবস্থা করে দেবে। মাসে হাজার দেড়েক টাকা স্টাইপেন্ড পাবে। কোর্সটা শেষ করতে পারলে তখন তোমাকে কোম্পানিতে ইঞ্জিনিয়ার করে নিতে পারবো। তুমি ওই সাহায্যর জন্য একটা এ্যাপ্লাই করো—ওটা পেয়ে যাবে।

বিজিত বলে,

—ওতো কোম্পানির দয়ার দান!

নরেশবাবু অবাক হয়ে বলেন,—দয়ার দান!

নিবেদিতা অবাক হয়ে বলে,—এসব কি বলছ বিজিত। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সুযোগ পাবে।

অনিমেষ অবশ্য বিজিতকে চেনে, সে-ও বুঝেছে বিজিতের মত প্রতিবাদী চরিত্রের ছেলে ওইভাবে সাহায্য ভিক্ষার আবেদন হয়তো জানাবে না। বিজিতের কাছেও এটা মনঃপূত হয়নি। সাহায্য ভিক্ষা করতে হবে। আর রোজগারের জন্য তিনবছর অপেক্ষা করতে হবে। অথচ তার সংসারে, অভাব এত বেশি যে আর এক সপ্তাহ ও অপেক্ষা করা যাবে না। তাই বিজিত নরেশবাবুকে বলে,

—আমি আমার পরিশ্রমের বদলে মূল্য চেয়েছিলাম। কারণ চাকরির দরকার তাই বলে দয়ার দান সাহায্য এসব আমি চাইনি।

নরেশবাবু বলেন,

—দয়ার দান। সাহায্য এসব কথা উঠছে কেন? আমি তোমাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছিলাম মাত্র। অনেককেই এই ট্রাস্ট থেকে সাহায্য করা হয়।

নিবেদিতা বলে,

—তুমি বাবার কথা শোন বিজিত। এতে ভালোই হবে। ক'বছর পরে ভালো চান্স পাবে।

বিজিত বলে;

—এ সাহায্য আমি নিতে পারি না। আমি এ চাইনি। আমি এই দাম নিতে পারলাম না স্যার। আমাকে ক্ষমা করেন।

বিজিত বের হয়ে যায়। নিবেদিতা ওকে কি বলতে যায়। কিন্তু বিজিত ওর কথায় কান না দিয়ে হনহন করে বের হয়ে গেল।

অনিমেষও নীরবদর্শকের মতই চেয়ে থাকে। সে-ও ভাবতে পারেনি যে বিজিত এইভাবে বাবার এই প্রস্তাবকে তুচ্ছ করে বের হয়ে যাবে। এটাকে নরেশবাবু মোটেই সহজভাবে মেনে নিতে পারেন নি। তার সাহায্য এই দানের জন্য কজন দিনরাত তার পিছনে ঘুরছে। তাকে বিরক্ত করে। কিন্তু তিনি অনিমেষ-এর কথায় বিজিতকে এই সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন। আর ওই ছেলেটা তার দান এভাবে প্রত্যাখান করে নরেশবাবুকে এইভাবে অপমান করে চলে যাবে এটা ভাবতেও পারেননি তিনি। নরেশবাবু বলেন,

—এ কাকে এনেছিলি অনিমেষ। নিজের ভালো-মন্দও বোঝে না। অবাধ্য, গোঁয়ার, মুখের উপর যা-তা কথা বলে অপমান করে গেল।

অনিমেষ বলে,

—ওর সংসারে হয়তো খুবই অভাব তিন বছর অপেক্ষা করার সামর্থ্য নেই।

—তাই আমার মুখের উপর এইভাবে কথা বলে যাবে। ননসেন্স। নিবেদিতাও বিজিতের এ ধরনের আচরণটাকে মোটেই ভালোচোখে দেখে না। সে-ও হতাশ-ই হয়। বরং মনে মনে বিজিতের ওপর রাগও হয়। আরও কিছু হয়তো বলতেন নরেশবাবু, পি.এ এবার ফাইল পত্র নিয়ে হাজির হয়ে বলে,

—এখনও তৈরি হননি স্যার। আজ বেলা এগারোটায় চেম্বার অব কর্মার্সের মিটিং।

নরেশবাবুর খেয়াল হতে বলেন,

—আগে থেকে বলে রাখবে তো। তাহলে এসব ঝুট-ঝামেলাকে পাত্তাই দিতাম না। নিবেদিতা ভিতরে চল মা। বের হতে হবে এখুনি। সব গোছগাছ করে দিবি। তোর মা তো এখন ঠাকুর ঘরে। ডাকলেও সাড়া মিলবে না।

যাবার সময় নরেশবাবু অনিমেষকে বলেন, —তোমার বন্ধুকে মাথা ঠান্ডা করে ভেবে দেখতে বলো। নিজের ভালো-মন্দ পাগলেও বোঝে—আর ও বুঝবে না।

শিখা কলেজে ভর্তি হয়েছে। অর্ক এম.এ দিচ্ছে। শিখার এক ছাত্রীর বাড়ির ওদিকেই অর্কের ফ্ল্যাট। এখানে অর্ক একাই থাকে। এবার সে একটা কলেজে কাজের চেষ্টা করছে। অবশ্য তার সঙ্গে গবেষণাও চালিয়ে যাবে। তার গাইড এবং প্রিয় অধ্যাপকও চান অর্কের মত একজন কৃতি ছাত্র তার কলেজে অধ্যাপনা করুক

শিখা সেদিন কলেজ সেরে ফিরছে। হঠাৎ দেখা অর্কের সঙ্গে। অর্ক সেদিকে গেছল। অর্ক ওকে ডেকে বলে,

—তুমি এখানে?

—আমিতো এই কলেজেই পড়ি।

—বিজিতের খবর কি? কদিন তার দেখা পায়নি—

শিখা বলে,

—কি সব কাজকর্মের চেষ্টাতে ঘুরছে।

অর্ক বলে,

—ওই তো আমার বাড়ি। চলো ব্যাচেলার্স ডেনটাকে দেখে যাবে। শিখার মনে স্বপ্ন জাগে। সে-ও পায়ে পায়ে এগিয়ে চলে। অর্কের কাজের লোকটা তখনও ঘুমোচ্ছে। অসময় বেল বাজাতে সে বিরক্ত হয়ে দরজা খুলে দেয়। সামনে অর্ক আর শিখাকে দেখে অবাকই হয়।

—বাবু। আপনি!

—ফিরে এলাম। যা, চা বানা আর ডিমের ওমলেট-টমলেট কিছু একটা বানিয়ে আন। দেখ কি আছে?

শিখা বলে,

—ব্যস্ত হচ্ছেন কেন অর্কদা। ওসব লাগবে না। শুধু চা হলেই হবে।

ভূষণ চলে যায় কিচেনে। অসময়ে তার ঘুম ভাঙার জন্য সে বেশ বিরক্ত হয়েছে। শিখা অর্কের পড়ার ঘরটাকে দেখে। যত্রতত্র বই কাগজপত্র ছড়ানো। ঘরের কোণে বাজে কাগজের স্তূপ। টেবিলটাতে বই খাতা ছড়ানো। ঘরের কোণে ঝাঁট পড়েনি কতদিন। মাকড়সার জাল দু-এক জায়গায়। শিখা বলে,

—যা জঞ্জাল করে রেখেছো কোনদিন না কাঁকড়া বিছেতে না কামড়ায়।

শোবার ঘরের অবস্থাও তেমন, আর্ক বলে,

—যা করার ভূষণই করে। তবে প্রফেসারের চাকরি পেলে এবার ঘর গোছাবার লোক আনার কথা ভাবতে হবে।

—তাহলে নিজেদের কথা নিজেদের ভবিষ্যতের কথাও ভাবো? তোমাদের তিন বন্ধুকে তো দেখি মাথায় ওসব ভাবনাই নেই।

অর্ক বলে,

—মাঝে মাঝে ভাবতে সাধ হয়। তবে সাধ্যও তো থাকা চাই। নাহলে ভেবে লাভ কি বলো?

ভূষণ এরমধ্যে ওমলেট টোস্ট এনেছে।

অর্ক বলে,

—নাও খেয়ে নাও। ঠান্ডা হয়ে যাবে।

—তুমিও নাও। এত খাওয়া যাবে না। ইস দেরী হয়ে গেল। বাড়ি ফিরতে হবে। মা ভাববে।

অর্ক বলে,

—চলো তোমাকে পৌঁছে দিই। সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

শিখাও যেন কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়। আগেও শিখা এ অঞ্চলে আসা-যাওয়া করেছে। তখন এ অঞ্চলে শান্তিতেই আসা-যাওয়া করা যেতো। ইদানীং বেশ কিছু বখাটে ছেলে পাড়ায় মাতলামি করে। তাদেরই দেখা যায় ভোটের সময় হন্যে হয়ে কোন দাদার জন্য জিপ চড়ে ঘুরছে। মিটিং মিছিল-এ গলা ফাটিয়ে চিৎকারও করে। আর ভোটের দিন বুথ জ্যাম করে না হয় নানা কৌশলে ছাপ্পা ভোট দিয়ে দাদাদের জিতিয়ে আবীর মেখে বিজয় মিছিলে নৃত্য করে। সেই অধিকারেই এখন দাদাদের চ্যালারা ওইসব অঞ্চলে দাপিয়ে বেড়ায়। এখান ওখান থেকে ধমকে-ধামকে মোটা টাকা রোজগার করে। আর পথে-ঘাটে এদের উৎপাতে মেয়েদের যাতায়াত করাও সম্ভব হচ্ছে না। উড়ো কাগজ, বিশ্রী গানের কলি, ইঙ্গিত এসবও আসে। শিখা তাই অর্ককে সঙ্গে আসতে দেখে নিশ্চিন্তই হয়।

অর্কও জানে এসব, সে বলে,

—সমাজে এবার এইসব আবর্জনার প্রাধান্য আসছে।

—তাই দেখছি। সমস্ত পরিবেশটাকে এরা বিষিয়ে দিয়েছে।

অনিমেষ এসেছে বিজিতের বাড়িতে। বিজিতের জন্য সে ভাবে। তাই সন্ধ্যাতেই এসেছে। এর মধ্যে অর্ক-শিখাও এসে পড়ে। ওরাও শোনে অনিমেষের মুখে ওর বাবার প্রস্তাবটা।

ভবেশবাবুও শোনেন। বিজিত তখনও ফেরেনি। বিজিত এরমধ্যে দু-এক জায়গায় চাকরির সন্ধানও করেছে। একটা অফিসে কদিন যাতায়াত করছে—আর আজ সেখানেই গেছে সে। বেশ কর্মব্যস্ত অফিস। বহু লোকজন ভিড় করেছে। ব্যস্ত কাউন্টারে তাড়াতাড়া নোটের লেনদেন হচ্ছে। বেশ কয়েকজন লোক টাকা গুনতে হিমসিম খাচ্ছে। ভিতরেও বেশ কিছু লোকজন কর্মব্যস্ত। দেখেই বোঝা যায় বেশ চালু অফিস। সেই অফিসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর-এর কাছে পাঠিয়েছিল বিজিতের এক বন্ধুর দাদা। সেই সুবাদে ম্যানেজিং ডিরেক্টর বলে,

—সামনের পয়লা তারিখ থেকে জয়েন করতে পারবেন?

এখনও দশদিন অপেক্ষা করতে হবে। তবু কাজটা হবে দশদিন পরই। অফিসের নিয়মও এইটাই। প্রথমদিন থেকে সব হিসাব হয়। বিজিত বলে,

—হ্যাঁ স্যার।

সে এবার মনস্থির করে ফেলে। ম্যানেজিং ডিরেক্টর বলেন,

—তাহলে কাল এসে এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা নিয়ে যাবেন। মন দিয়ে কাজ করুন।

আমি চাই কাজের লোক। আমার একটাই কর্ম ধর্ম আর সততা। বুঝলেন মশাই —সততাই আমাদের বিজনেসের অনলি মূলধন। টাকা নয়—টাকা আজ আছে কাল নেই। সততা থাকবে চিরকাল।

বিজিতও এহেন সৎ কর্মকান্ডে জড়িত হতে চায়। সে বলে,

—তাহলে কালই আসছি স্যার। নমস্কার, বলে বেড়িয়ে আসে।

খুশি মনে বাড়ি ফিরছে বিজিত। চাকরিটা তাহলে হবে। মাস কাবারে সংসারে বেশ কিছু টাকা তুলে দিতে পারবে বাবার হাতে। বাবাও খুশি হবেন। বিজিত তাকে দায়মুক্ত করেছে। এইটাই বিজিতের কাছে সবচেয়ে বড় পাওনা। আর দিন দশেক কোনমতে টেনে নিতে পারলে সে নিজেই রোজগার করতে পারবে।

বাড়ি ঢুকে দেখে বাইরের ঘরে তখন অনিমেষ অর্করা কি একটা জরুরি মিটিং-এ ব্যস্ত। সুজিত অবশ্য এসব মিটিং-এ থাকে না। সে কোথায় খেলতে গেছে এখনও ফেরেনি। ভবেশবাবুও রয়েছেন।

—বিজিত অনিমেষ, অর্ক তোর জন্য বসে আছে। এত দেরি হল তোর?

—একটু কাজে আটকে পড়েছিলাম! তোরা বোস আসছি। অ্যাই শিখা চা মুড়ি হয়ে গেছে।

সাবিত্রীও এরমধ্যে রান্নাঘর থেকে এসে এদের আলোচনা শুনতে গেছে। বিজিতকে তিন বছর ধরে কি যেন পড়াশোনা করতে হবে এরা তাই বলছিল। সাবিত্রী সবই শুনেছে। কোনও মন্তব্য করেনি।

শিখা বলে,

—তুই হাত-মুখ ধুয়ে আয়। আমি চা মুড়ি আনছি।

ভবেশবাবু কথাটা ভেবেছেন। বিজিতের এই সুযোগটাকে নেওয়া উচিত। এবার ভবেশবাবু বলেন,

—বিজিত আমি সব শুনেছি। অনিমেষের বাবার প্রস্তাবটা তুমি মেনে নাও। এই তিনটে বছর আমি কষ্টে-সৃষ্টে চালিয়ে নেব।

শিখাও বলে,

—এমন চান্স ছাড়িস না দাদা। তুই ইঞ্জিনিয়ার হতে পারবি ওদের সাহায্যে ভালো চাকরি পাবি তখন। এই কটা বছর যেভাবে হোক চলে যাবে আমিও কটা টিউশনি নোব। তুই এই সুযোগ ছাড়িস না দাদা।

সুজিত এর মধ্যে ফিরেছে। সে স্নান করে পরিপাটি পোশাক পরে গলায় পাউডার লাগিয়ে পাড়ার ক্লাবে তার ভক্তবৃন্দকে দর্শন দিতে যাবে। সে এবার গড়ের মাঠের কোন টিমে চান্স পাচ্ছে। যদিও ছোট টিম। এবার বড় দলের বিরুদ্ধেও লীগে খেলতে পারবে। তাকে উপরে উঠতেই হবে। সুজিতও শুনেছে ওদের আলোচনা। আর দাদা যে এতে রাজি নয় সেটাও শুনেছে। তাই সুজিত বলে,

—হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিস না দাদা। মুফত মে ইঞ্জিনিয়ার হবি। বিজিত চুপ

করে থাকে। সুজিত বলে,

—এটা তোর ব্যাপার। আমি বাবা তোর ব্যাপারে নাক গলাতে যাবো না। চলি—

চলে যায় সুজিত বিরক্তি ভরে।

অনিমেষ বলে,

—কি রে বিজিত। তাহলে বাবাকে বলি—এখনও অফারটা আছে।

আমার মতামত আমি জানিয়ে এসেছি। ওভাবে দয়া সাহায্য নিয়ে তিন বছর সংসারকে বঞ্চিত করে আমার ভবিষ্যৎ গড়তে চাইনা রে।

শিখা বলে,

—দাদা তোর নিজের ভবিষ্যৎ বলে কথা। তোর কি কিছু পেতে ইচ্ছা করে না?

বিজিত বলে,

—আমার কোনও ভবিষ্যৎ নেই রে। বর্তমানই আমার কাছে বড়। তার মুখোমুখি হবারই চেষ্টা করি। আর পাওয়ার কথা বলছিলি, আমার পাওয়া হিসাবের সঙ্গে মেলে না।

অর্ক বলে,

—তবু অনির কথাটা ভেবে দ্যাখ বিজিত।

—আমার সিদ্ধান্ত আমি নিয়ে ফেলেছি অর্ক। আমার পক্ষে ওই দয়ার দান গ্রহণ করা সম্ভব নয়। যদি তুই কোনদিন আমার পরিশ্রমের মূল্য দিয়ে কাজ দিতে চাস—নিশ্চয়ই যাবো।

অনিমেষ বলে,

—তোর অমত থাকলে জোর করব না। আজ চলি—শোন পরে দেখা করিস। কদিন বোধহয় ব্যাবসার কাজে বাবা আমাকে বিদেশেই পাঠাবেন।

অর্ক বলে,

—ভালোইতো যা দেশ-বিদেশ ঘুরে আসবি।

—ঘুরে বেড়ানো এক কথা আর ধান্দা করতে যাওয়া অন্য কথা। কোনও আনন্দ নেই। চলি—

—চল আমিও উঠবো।

অর্ক ও অনিমেষ বেরিয়ে যায়। ভবেশবাবু তবু বলেন,

—বিজিত। এটা তুই ঠিক করলি না।

—ঠিকই করেছি বাবা। তোমাকে এবার একটু স্বস্তি দিতেই হবে। কত আর বোঝা টানবে? আমি একটা চাকরি পেয়েছি বাবা। সামনের মাস থেকেই সেখানে জয়েন করতে হবে।

ভবেশবাবু ওর দিকে চাইলেন,

—চাকরি? চাকরি করে শেষ হবি?

সাবিত্রী ওই চাকরির কথা শুনে খুশিতে যেন উপছে পড়ে—চাকরি পেয়েছিস বাবা? তা কিসের চাকরি রে? কত টাকা মাইনে?

—বড় অফিসের চাকরি।

সাবিত্রী ভবেশকে বলে,

—তুমি আর বাগড়া দিয়ো না বাপু। আজকালকার বাজারে এমন চাকরি পাওয়া কি সহজ কথা। বাবা বিজিত তুই হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিস না। ওই চাকরি নে বাবা। তবু এই অভাবের মধ্যে একটু আশার আলো দেখে।

—তাই ওই চাকরিটাই নেব।

ভবেশবাবু আর কথা বলেন না। বেশ জানেন এই সংসারে তার কথার কোন দামই নেই। বাঁচার জন্য মানুষ সব মূল্যবোধ, আদর্শকেও তুচ্ছ করতে পারে। এরা তাই করেছে বাঁচার মাশুল দিতে গিয়ে। এখানে বর্তমানই সব। ভবিষ্যৎ এদের অনিশ্চিতের অন্ধকারে আছন্ন হয়ে গেছে।

কিছুদিন থেকেই ভবেশবাবুর শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না। জ্বরও হয়েছিল সঙ্গে শ্বাসকষ্ট। কিন্তু কিছুই জানায়নি। ওষুধ কেনার টাকাও নেই। পেনসনের টাকাই ভরসা—তাতেও দিন চলে না। তাই অসুখের কথাটা চেপেই ছিলেন ভবেশবাবু। মাসের শেষ। পয়সার যোগানও শেষ। কিন্তু রোগটা বেড়ে ওঠে। সাবিত্রী বলে,

—এখন কি হবে বিজিত।

সুজিত এসময় নেই। সে তাদের টিমের হয়ে গৌহাটি খেলতে গেছে। অবশ্য থাকেলও সে টাকা দিত কিনা জানে না বিজিত। ডাক্তারবাবুও বলেন,

—বিজিত ওষুধপত্র কিনতে হবে। ঠিকমত ওষুধগুলো না খেলে রোগ আরও বেড়ে যাবে।

তিনি লম্বা একটা ওষুধের ফর্দও দিয়ে যান। সাবিত্রী তার শেষ সম্বল থেকে ডাক্তারের ফিটা কোনও মতে মিটিয়ে দেয়। কিন্তু ওষুধ কেনার টাকা নেই। ওদিকে ভবেশবাবুর শ্বাসকষ্টও বাড়ছে। শিখা বাড়ি থেকে বের হয়েছে যদি কোথাও কিছু টাকা মেলে। বিজিত ভাবতে থাকে। সেই ঘটনার পর আর অনিমেষ-এর বাড়িতে যাবার সময়ও হয়নি। ওর কাছে গেলে কিছু টাকা সহজেই মিলবে কিন্তু বিজিত কারো কাছে হাত পাততে পারবে না।

কি করবে বুঝতে পারে না বিজিত। টাক তার চাই। আনমনে চলেছে মেডিকেল কলেজের পাশ দিয়ে। ওদিকে রোগীদের আত্মীয়-স্বজনদের ব্যস্ত আনাগোনা। বহু উৎকণ্ঠিত মুখের জটলা। একজনের আত্মীয়ের জরুরি অপারেশন করা দরকার। কিন্তু ব্লাড ব্যাঙ্কে সেই গ্রুপের রক্ত নেই। এখানে ওখানে ছুটেও তারা রক্তের ব্যবস্থা করতে পারছে না।

রোগীর জীবন মরণ সমস্যা। তারাই বলাবলি করে যদি ওই গ্রুপের রক্তের কেস পাওয়া যায়। রক্ত চাই টাকা যা লাগে দেওয়া যাবে। বিজিত ওদের কথা শুনতে পায়—দাঁড়িয়ে পড়ে সে। টাকার খুবই দরকার বাবাকে সুস্থ করে তুলতেই হবে। ওদের দরকার রক্তের। বিজিত এগিয়ে আসে ওদের দিকে। বলে,

—কোন গ্রুপের রক্ত চাই আপনাদের?

গাড়ি থেকে ভদ্রলোক নেমে এসে বলে,

—এ পজিটিভ। কোথাও পাচ্ছি না ভাই। এদিকে রক্তের খুবই দরকার।

বিজিত তার রক্তের গ্রুপ জানে। এর আগে পাড়ার রক্তদান শিবিরে কয়েকবার রক্তদান করেছে। কিন্তু আজ ওকে রক্ত দিতে হবে বাবার জন্য। অর্থের জন্য। তাই সে এগিয়ে যায়,

আমারও ওই গ্রুপের রক্ত।

ভদ্রলোক সুস্থ সবল তরুণকে দেখে বলে,

—তোমার রক্ত দেবে ভাই! যত টাকা চাও দেব! আমার ছেলে ঠিক সুস্থ হয়ে ওঠার জন্যে আমি টাকার কার্পণ্য করব না।

লোকটা চায় তার একমাত্র সন্তানকে বাঁচাতে আর বিজিত চায় তার বাবার জীবন বাঁচাতে। বিজিত বলে,

— ঠিক আছে। রক্ত এমনিই দিয়েছে কয়েকবার—তবে এখন টাকার দরকার।

—তা পাবে, ভাল টাকাই দেব। চলো

ভদ্রলোক বিজিতকে নিয়ে আসে হাসপাতালে। বিজিতও রক্ত দেবার জন্য তৈরি হয়। ব্যাপারটা দেখেছে সেই ডাক্তারবাবু। বিজিতকে তিনিও চেনেন। বিজিত যে এইভাবে রক্ত দিতে আসবে তা ভাবেননি। রক্তের গ্রুপ একই। ভদ্রলোকও নিশ্চিন্ত হয়। রক্ত দেবার পর বিজিতকে একটা খাম দিয়ে বলে,

—হাজার টাকাই দিলাম ভাই—তোমার ঋণ শোধ করা যাবে না। তবু এটা নাও।

বিজিত বের হয়ে আসে। কি আনন্দ তার মন ভরে উঠেছে। সে আজ বাবার সব ওষুধ, ফল সন্দেশ কিনে বাড়ি ফেরে। সাবিত্রীও খুশি হয়। —ওরে এসব এনেছিস। টাকা কোথায় পেলি?

ভবেশবাবুও সব দেখছেন। বিজিত বলে,

—ইয়ে এক বন্ধু দিল। ওকে বলেছি মাইনে পেলে শোধ করে দেব। বাবা এবার ওষুধগুলো ঠিক নিয়ম করে খাও তো। আর ফল-টলও খেতে হবে।

সাবিত্রী বলে,

—দ্যাখ তাহলে চাকরির জোর কত। ওরে ওইটা দেখিয়ে তবু টাকা পেলি। ওষুধপত্র এলো।

পরদিন ডাক্তারবাবু এসেছেন। এরমধ্যে ওষুধপত্র ঠিকমতো খেতে ভবেশবাবুও অনেকটা সুস্থ হয়েছেন। ডাক্তারও দেখে সব ওষুধ এসেছে। ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখে বলেন,—ওষুধে কাজ হয়েছে দেখছি। ওই ওষুধই চলুক। কদিনেই সুস্থ হয়ে উঠবেন। বিজিত, কাল কেমন থাকে জানাবে।

ডাক্তারবাবু বারান্দায় বের হয়ে আসতে বিজিত ওর ফিটা দিতে যাবে।

—আপনার ফি!

ডাক্তার এবার বিজিতের দিকে চাইলেন। তিনি কালই দেখেছেন ওই টাকা বিজিত তার রক্ত বিক্রি করে সংগ্রহ করেছে। ডাক্তারবাবু বিজিতের হাতটা ধরে বলেন,

—বিজিত কাল নিজের রক্ত বিক্রি করে তুমি যে টাকা এনেছ তা দিয়ে তোমার বাবাকে সারিয়ে তোল। ওর থেকে ভিজিটের টাকা আমি হাত পেতে নিতে পারবো না। আমিও একজন ডাক্তার-মানুষের কষ্ট দূর করার ব্রত নিয়েছি কসাই হতে পারব না।

ডাক্তারবাবু! বিজিত অবাক হয়।

ডাক্তার বলে,

—তোমার মতো ছেলে আমার একটা থাকলে নিজেকে অনেক ভাগ্যবান মনে করতাম। চলি।

ঘরের এদিক থেকে ভবেশবাবু ওদের সব কথাই শুনেছেন। আজ তিনিও বিস্মিত হতবাক। সাবিত্রী ঢুকছে ফলের রস নিয়ে— নাও এটুকু খেয়ে নাও। ভবেশবাবু দেখছেন। ওই ওষুধপত্র —এসব এনেছে বিজিত নিজের দেহের রক্তের বিনিময়ে। বাবার প্রতি তার শ্রদ্ধার্ঘ।

—কি হলো ওষুধটা খাবে না?

সাবিত্রীর কথায় ভবেশবাবু বলেন,

—দাও। খাবো বৈকি। এর দাম অনেক। অনেক—অবেগে ভবেশবাবুর কণ্ঠস্বরও ভরে ওঠে।

কয়েকদিন বিজিত বাবাকে নিয়েই ব্যস্ত ছিল। অনিমেষ এখানে আসতে পারেনি। আজ এসেছে বিজিত—অনিমেষের বাড়িতে। নিবেদিতা বিজিতের সেদিনের কথাগুলো ভুলতে পারেনি। নিবেদিতাও বিজিতকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিল। অনিমেষও জানে নিবেদিতা বিজিতের সম্পর্কটা। অনিমেষও বিজিতকে সত্যিই ভালোবাসে। অনিমেষ বড়লোকের ছেলে হলেও তার মনে একটা আদর্শ বোধ আছে আর বিজিতের সঙ্গে সেটা মেলে। অনিমেষও চায় বিজিত এই সমাজে প্রতিষ্ঠিত হোক—তবেই নিবেদিতার যোগ্য হতে পারবে। দুজনে সুখী হবে।

এতসব ভেবেই অনিমেষ বিজিতের জন্য বাবাকে বলেছিল। নিবেদিতাও মনে মনে খুশি হয়েছিল বাবার সুনজরে বিজিত আসবে। বিজিতের মত সৎ আদর্শবান ছেলে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হলে সেদিন নিবেদিতার স্বপ্নই সফল হবে।

কিন্তু বিজিত সেই কথাটা ভাবেনি। নরেশবাবুর ওই প্রস্তাবকে সে প্রত্যাখান করেছিল সহজেই। নরেশবাবুও বিজিতের উপর বিরক্ত হয়েছিলেন আর নিবেদিতাও মোটেই খুশি হয়নি। বিজিত তারপর আর কদিন এ বাড়িতে আসেনি। ধনীর মেয়ে নিবেদিতা। তার আশপাশে এখন এই সমাজের অনেক ছেলেই মেলামেশার জন্য এগিয়ে আসে। তবু নিবেদিতা বিজিতের দিকেই এগিয়েছিল। কিন্তু বিজিত তার দাম দেয়নি। নিবেদিতার মন অভিমানে ভরে উঠেছিল।

বিজিত কদিন পর এসেছে অনিমেষের কাছে। অর্ক এখন একটা কলেজে অধ্যাপনা করছে। সে-ও আসে এ বাড়িতে। তবে আজ আসতে পারেনি তার থিসিসের কাজ

আটকে পড়েছে কোথাও।

অনিমেষ বলে,

—আয়।

অনিমেষের ঘরের টেবিলে ফাইলপত্র, ওদিকে অনিমেষ কি সব জিনিসপত্র গোছাচ্ছে।

বিজিত বলে,

—কি ব্যাপার রে। কোথাও যাবি নাকি।

অনিমেষ বলে,

—হ্যারে মাস দুয়েকের জন্য লন্ডন। ওখান থেকে নিউইয়র্ক শিকাগোতে যেতে হবে। বাবা এখন বিদেশেই মধুর সন্ধান পেয়েছে। তাই এই মৌমাছিকে সে দেশের মধু সংগ্রহ করতে পাঠাচ্ছেন। আপাতত কিছুদিনের জন্য। মাস দু-তিন থাকবো না।

বিজিত বলে,

—সত্যি মিস করবো এতদিন তোকে। অর্কটাও থিসিস আর কলেজ নিয়ে ব্যস্ত। ভাবছি ওই চাকরি নিয়েই আবার গতানুগতিক জীবন বাঁচাতে হবে।

—বেশতো। নিশ্চিন্ত জীবন। বলে অনিমেষ—

—ওইখানেই তো গোলমালরে। ওই নিশ্চিন্ত গুডবয়ের জীবন আমার সয় না। জীবনটা হবে যাযাবরের মত। অবশ্য একদিক থেকে সান্ত্বনা আমাদের জীবনে লড়াই পদে পদে। এই লড়াই করে চলতে হবে। আচ্ছা নিবেদিতাকে দেখছি না।

অনিমেষ লক্ষ্য করেছে ব্যাপারটা। অন্য সময় বিজিত এলে নিবেদিতাও যেকোনও ছুতোয় তার ঘরে আসে।

অনিমেষ বলে,

—কে জানে? সামনে তো জোর কদমে লীগের খেলা আসছে। বাবার সঙ্গে বোধহয় এবার ঘটি-বাঙ্গাল টিমের লড়াই-এর রণকৌশল নির্ধারণ করছে।

এবাড়িতে অনিমেষ আর তার কাকা দেবেনবাবু মোহনবাগান টিমের অন্ধ সমর্থক আর নরেশবাবু নিবেদিতা তো বেঙ্গল টিমের মাথায় বসে আছে। তাই প্রায়ই অবসর সময়ে ওদের মাঠের ফুটবল ঘরে এসে পড়ে। এইখানেই ওদের লড়াই শুরু হয়।

বিজিতও আজ নিবেদিতার অনুপস্থিতিতে বেশ অবাক হয়। ব্যাপারটা তার কাছেও খারাপ লাগে।

বেরিয়ে আসে বিজিত। দেখে ওদিকের বাগানে নিবেদিতা একটা কুল গাছের কি যেন পরিচর্যা করছে। বিজিতও এগিয়ে যায় ওদিকে। বাড়ির পিছনে আগে থেকেই এই পুকুর বাগান ছিল। অতীতে যখন এদিকে কোনও বসতি ছিল না। তখনই নরেশবাবুর পিতৃদেব এই বাড়ি এইসব করেছিলেন। নরেশবাবু সেসব বাগানকে আরও সাজিয়েছেন। নিবেদিতা বিজিতকে অবশ্য আগেই দেখেছিল অনিমেষের ঘরে। আর সে ইচ্ছা করেই যায়নি। নিবেদিতার জেদী মন কেমন বিগড়ে গেছে বিজিতের উপর।

বিজিত বলে,

—আমি এসেছিলাম। কই তুমি তো গেলে না?

—আমার জন্য তো আসনি। বন্ধুর সাথে গল্প করছ তাই আর ডিসটার্ব করিনি।

আবার নিবেদিতা গাছের পরিচর্যায় মন দেয়।

বিজিত বলে,

—তুমি আমার উপর রাগ করেছ নিবেদিতা।

—রাগ করবো কেন? তাছাড়া তোমার ভবিষ্যতের ব্যাপার। ওটা তুমি নিজেই বুঝে নিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছ। তাতে আমার রাগ করার কি আছে? বিজিত নিবেদিতাকে দেখছে।

—এছাড়া আর পথ ছিল না। এখন চাকরিটা নিয়ে তবু বাবাকে একটু শান্তি দিতে পেরেছি।

—বাবার কথা শুনলে সেটা আরও ভাল করেই পারতে। আর তাতে আমাদের স্বপ্নও সত্যি হতো। তা নয় নিজের ওই সামান্য পাবার আশায় আমার স্বপ্নকেও মিথ্যা করে দিলে। তোমাকে ঘিরে আমারও অনেক স্বপ্ন ছিল— সব, সব কিছু তুমি মিথ্যা করে দিলে।

নিবেদিতা আরও কি যেন বলতে চেয়েছিল। বিজিত আজ শুনেছে ওর সেই না বলা কথাগুলো। কি নীরব বেদনায় নিবেদিতার কথাগুলো বেদনাই হয়ে ওঠে। নিবেদিতা চলে গেল বাড়ির মধ্যে। বাগানে একা দাঁড়িয়ে আছে বিজিত। এতদিন সে নিজের কথা তার আশা স্বপ্নের কথা নিয়ে তেমন ভাবেনি। এর আগেও নিবেদিতা এসেছে তার কাছে। সেই চোখের ভাষা বিজিত বোঝার চেষ্টাও করেনি।

আজ মনে হয় বিজিতের সত্যি তার অজানতে তার জীবন থেকে অনেক কিছুই হারিয়ে গেছে যা আর কোনদিনই ফিরে আসবে না। পূর্ণতার জগতের স্বপ্ন দেখে সকলেই। বিজিতের মনে হয় তার জীবনে আছে শুধু শূন্যতার বেদনাই।

সন্ধ্যা নামছে। বাগানে ঘরে ফেরা পাখিদের কলরব ওঠে। ওদের ঘরের ঠিকানা আছে— আপনজন আছে। কিন্তু এই বিশ্বে বিজিত যেন নিঃসঙ্গ একা। তার সুখের ঠিকানাগুলোও সব হারিয়ে গেছে।

বিজিত এখন চাকরিই করছে মন দিয়ে। একটা প্রাইভেট ফাইনান্স অফিসে কাজ পেয়েছে বিজিত। আধুনিক পশ এলাকা পার্কস্ট্রিট অঞ্চলে ওদের অফিস। বিজিত দেখেছে ওদের অফিসটাও বেশ সুন্দর করে সাজানো। অফিসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ব্রজবাবুও সৌখিন লোক। বলেন তিনি,

—অফিস-এর কাজের পরিবেশে চাই হে—নাহলে কাস্টমাররা তাদের টাকা দিতে আসবে কেন? আর আমি চাই আমার স্টাফরাও সব ফিট-ফাট কেতা দুরস্ত হয়ে আসবে।

বিজিত দেখছে এদের ফার্মের কাজও ভালোই চলছে। মফস্বলেও এদের ব্রাঞ্চ আছে। সেখান থেকেও লাখ লাখ টাকা আসছে—এখানে। আর এখানে কাউন্টারেও লোকজনের ভিড়। টাকা যেন উড়ে আসছে। এরা সেই সব টাকা নাকি সরকারি সংস্থায়, শেয়ার-মার্কেটে অন্যত্র খাটিয়ে ওই হাজার হাজার কাস্টমারদের তাদের টাকার চড়া

সুদও দেয়। আর লোকেও তাদের টাকার এহেন সুদের পরিমাণ দেখে দলে দলে এসে টাকা জমা দিয়ে যাচ্ছে। বিজিত সেইসব টাকার হিসাব যেখানে রাখা হয় সেই বিভাগে কাজ করে।

ব্রজবাবু গভীর জলের মাছ। এর আগেও এমনি নানা ব্যাবসা করেছে, শেয়ার বাজারের দালালির চেষ্টাও করেছে। তারপর নানা ঘাট ঘুরেছে। আর এই যাযাবর জীবনে অনেক লোকের সংস্পর্শেই এসে প্রভূত জ্ঞান অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, শেষে এসেছিল এদিকের নামী জননেতা নিখিলবাবুর কাছে। নিখিলবাবু নানা কাজ নিয়ে ব্যস্ত। তস্য সুপুত্র ওই অখিলই বার দুয়েক কলেজে ফেল করে পড়া ছেড়ে এখন বাবার পরামর্শে ব্যাবসাতে নেমেছে। আর বর্তমানের সব থেকে চালু ব্যাবসা প্রমোটারিতেই নেমেছে। তার পিছনে এমন সুযোগ্য পিতৃদেব আছেন। আর অখিলের দলবলও কম নয়। ইদানীং এই প্রমোটারির কাজে নামার জন্য তার চারিপাশে অনেক হাতকাটা তেলিয়া, গালকাটা গুপী, পেটো, পল্টু, ন্যাপলা, কাল ইত্যাদি মার্কামারা ছেলেরা এসে জুটেছে। অবশ্য তারা এখন ইট, বালি, স্টোনচিপসের সাপ্লায়ার, এলাকাতে বেশ কিছু লোকই বাড়ি তৈরীর কাজ করে। ওদের কাছ থেকে তাদের মাল নিতেই হবে। না হলে তাদের কাজও বন্ধ করে দেবে তারা। তাদের মালও লোপাট হয়ে যাবে। আর থানা পুলিশ করেও লাভ হবে না। অখিলের ওই ব্যবসা তাই এখন ভালোই চলছে আর ব্রজবাবুও এখন নিখিল অখিলের বড় গাছে ভেলা বেধে এখানে এই ব্যাবসা চালু করেছে।

অখিল অবশ্য চতুর ব্যক্তি। সে এরমধ্যেই এই ব্যবসার ব্যাপারটাও বুঝে নিয়েছে। সে এই অফিসে আসে না। ওদের দেখা-সাক্ষাৎ হয় অখিলের বাড়িতে। ব্রজবাবুও জানে এইসব ব্যাবসা করতে গেলে অখিলদেরও কিছু বখরা দিতে হবে।

ওদের ব্যবসার সেই ধারাটাকে বিজিতও ঠিক বুঝতে পারে না। দেখে প্রতিদিন মফস্বলের বহু অফিস থেকে, এখানের ওই সব ক্যাস কাউন্টার থেকেও প্রচুর টাকা সংগৃহীত হয়। ওরা আমানতকারীদের তার রসিদ কাগজপত্রও দেয়। মাসে মাসে প্রচুর টাকা সুদবাবদও দেওয়া হয়। বিজিতও মাসের শেষে ঠিক মতো মাইনেও পায়।

অবশ্য ব্রজবাবু আড়ালে তার খেলা খেলে চলেছে। আর শেষ রক্ষা করার জন্যই তার অখিলদের লোকেদের দরকার তাই তাদের কাছেই মাসের শেষে মোটা টাকা প্রণামী যায়। বিজিত সংসারের চেহারাটাও কিছু বদলেছে। সুজিত ও ভবেশবাবুও এখন কিছুটা নিশ্চিন্ত, প্রতিদিনের খরচার জন্য এখন আর ভাবতে হয় না। এবার সাবিত্রীও স্বপ্ন দেখে, সে বলে ভবেশকে—

—এবার শিখার বিয়েটা দিয়ে বিজিতের বিয়ে দিতে চাই গো।

—যা হোক চাকরি করছে, এখনতো অফিস থেকে লোনও কিছু পাবে বিজিত। দ্যাখনা শিখার বিয়ের কথা বলে। সুজিত কি বলে।

সুজিত অবশ্য নিজের ভবিষ্যতের কথাই ভাবে। এখন সে কলকাতার কোন একটা ছোট টিমে খেলছে। অবশ্য ডিভিসনের নীচের দিকের টিম। সেখানে এবছর ওই টিমে

ও বেশ সুনামের সঙ্গে খেলেছে। সুজিতের ছবিও মাঝে মাঝে কাগজে বের হয়

ভবেশবাবু বলেন,

—হ্যারে, বলছিলি তোদের টিম থেকে নাকি তোকে চাকরি দেবে?

সুজিত বলে,

—ভালো টিমে চান্স পেলে সব হবে বাবা।

বিজিত সুজিতের খেলার খুবই ভক্ত। সে অফিস ছুটির পর চলে যায় গড়ের মাঠে। সুজিতের টিমের খেলাও দেখে। বিজিত বলে,

—তুই অনেক ভালো খেলছিস সুজিত। ঠিকমতো খেলাটা চালিয়ে যা। দেখবি একদিন সুযোগ আসবেই।

সুজিত বলে,

—বেঙ্গল টিমের প্রেসিডেন্ট তো অনিমেষদার বাবা কি যেন নাম। বিজিত জানে সেখানেও বলার পথ সে রাখেনি। তাই বিজিত বলে,

—তুই খেলে যা। দেখবি নিজের চেষ্টাতেই তুই ভালো দলে চান্স পাবি। কারো, দয়ায় নয়।

শিখাও বলে,

—তাই ভালো রে।

শিখা বাইরে যাবার জন্য তৈরি হতে সাবিত্রী বলে,

—এখন আবার কোথায় বের হবি শিখা!

শিখা বলে,

—মানিকতলার ওদিকে একটা অনুষ্ঠান আছে মা। আমার ছাত্রীদের পাড়ার অনুষ্ঠান। ওখানে যেতে হবে। দেরী হবে না তাড়াতাড়িই আসবো।

—এবার ওসব গ্লানের অনুষ্ঠান ছাড়তো। ঢের হয়েছে।

শিখাকে এদের অনুষ্ঠানে আসতে হয়েছে। এরা বেশ কয়েকবার তাকে বলেছে। তাছাড়া ছাত্রীর মাও এদের সঙ্গে যুক্ত তার কথা শিখা এড়াতে পারেনি তাই আসতেই হয়েছিল। ভেবেছিল তাড়াতাড়িই ফিরবে। কিন্তু এমনিতেই অনুষ্ঠান শুরু হতে দেরী হয়ে যায়। তারপর এর আবৃত্তি—ওর গান—পাড়ার সেক্রেটারির ভাইঝির সাপুড়ে নৃত্য ইত্যাদি খুচরো অনুষ্ঠান, সভাপতির ভাষণ পর্ব শেষ হতেই দেরী হয়ে যায়। তারপর শুরু হয় মূল অনুষ্ঠান। শিখার অনুষ্ঠান হতে রাতই হয়ে যায়।

অখিল এ ক্লাবেরও অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। সে-ও দলবল নিয়ে তার অনুষ্ঠানে এসেছে। এর মধ্যে অখিলের জন্য কর্মকর্তারা কোনও রসিক ব্যক্তির বাড়িতে বিশেষ আপ্যায়নের ব্যবস্থাও রেখেছে। তাকে খুশি রাখা দরকার। অখিলের চোখে গোলাপী নেশার আমেজ।

হঠাৎ বের হবার মুখে মঞ্চের দিকে তার চোখ পড়ে মঞ্চে তখন গান গাইছে শিখা। অখিল ওকে দেখছে। বেশ গাইছে—আর তাছাড়া ওর গানে একটা মাদকতাও

রয়েছে। আর সেটা আকর্ষণ করে ওই অখিলকেও। অখিলের চ্যালারাও জানে তাদের গুরুর স্বভাব চরিত্রের কথা। এখন ভালো টাকাই রোজগার করে সে। তাছাড়া সারা এলাকায় তার নামে অনেকেই চমকে ওঠে। তার নানা কীর্তির খবরও জানে অনেকে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে কারো কিছু বলার সাধ্য নেই। তাই অখিল বিনা বাধায় নানা অন্যায় কাজ করে। এটা তার অধিকার বলেই ভাবে সে। অখিলের চ্যালা মণ্টাও ব্যাপারটা দেখছে।

অখিল বলে,

—মেয়েটা কে রে? বেশ ইয়ে ইয়ে আর গানটাও বেশ গাইছে।

মণ্টা বলে,

—কে জানে, থাকে কোথাও। তা গুরুর নজরে পড়েছে মনে হচ্ছে

—তা মেয়েটা মন্দ নয় রে।

—গুরুর নজরে যখন পড়েছে তখন ওটা তোমার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে গেছে ধরে নাও।

—কোনও গোলমাল হবে না তো?

—ও নিয়ে তুমি কিছু ভেব না বস। ওসব ম্যানেজ হয়ে যাবে। একটু অপেক্ষা করো—ওর গান-ফান শেষ হোক। তারপর ঘরে ফিরবে মেয়েটা—আর আমরাও ফলো লোব।

—বলিছিস?

—তুমি বেফিকর থাকো ওস্তাদ। আজ রাতেই ওকে তোমার বেহালার বাগানে নিয়ে যাবো।

—যা করার সাবধানে করতে হবে।

অনুষ্ঠান ভালোই হয় শিখার। শিখারও এখানে গান গেয়ে ভাল লেগেছে। কর্মকর্তারাই ওকে একটা খাম দেয়। অর্থাৎ প্রণামীও কিছু দিয়েছে। তখন রাত হয়েছে। ওরাই বলে,

—কেউ সঙ্গে যাক। পৌঁছে দিয়ে আসবে ট্যাক্সিতে।

—তার দরকার হবে না। এই তো ঠনঠনিয়া। ঠিক ভিতরে ভিতরে রিক্সা নিয়ে চলে যাবো। বরং একটা রিক্সা ডেকে দিন।

ওরাই একটা রিক্সা ডেকে দেয়।

শিখা ফিরছে। তখন পথ ঘাট বেশ ফাঁকা হয়ে গেছে। শিখা চলেছে রিক্সায়। এদিকে পথে আলোও কম। হঠাৎ নির্জন পথে একটা গাড়ি এসে শিখার সামনে পথ আটকে দাঁড়ায় শিখা দেখে গাড়ি থেকে অখিল নামে। আর তার সামনে মণ্টা, পটলা, গুপীও রয়েছে। ওরা রিক্সাটাকে থামিয়ে শিখাকে নামায়। একজন শিখার সামনে একটা ছোরা বের করে বলে, মুখবন্ধ করে চুপচাপ গাড়িতে ওঠো। একটা কথা বললে ছোরা

গলায় এস্পার ওস্পার করে দোব। শিখাও ভীত। একজন ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে চলেছে ওই গাড়ির দিকে। শিখা তবু নিজেকে বাঁচার জন্য চেষ্টা করে। একটা অস্ফুট আর্তনাদও বের হয়ে আসে মুখ থেকে। বাঁচাও—বাঁচাও—

ওদের দলবল শিখার গলাটা টিপে ওর শ্বাসরোধ করে মুখ বন্ধ করে দেয়। শিখাকে গাড়িতে তুলতে যায় হঠাৎ ওই পটলা প্রচণ্ড একটা লাথিতে ওদিকে নর্দমার জল কাদার মধ্যে ছিটকে পড়ে। অর্তকিতে এই প্রচন্ড আঘাতের জন্য সে তৈরি ছিল না।

কিছু করার আগেই ওই ছায়ামূর্তি মণ্টার পেটে সজোরে একটা লাথি মারতে মণ্টার হাত থেকে ছোরাটা ছিটকে পড়ে আর মণ্টা ছিটকে পড়ে পথের ধারে ডাস্ট বিনটার মধ্যে, পথের আলোয় দেখা যায় ওই নবাগতকে, শিখাও চমকে ওঠে।

—দাদা।

বিজিতও ফিরছিল এইপথে, সে দূর থেকে এদের এই কান্ড দেখে ছুটে আসে। ও তখনও দেখেনি কাকে তারা গাড়িতে তোলার চেষ্টা করছে। এবার দেখছে বিজিত শিখাকে আর বিজিতের মাথায় রক্ত ঠেলে ওঠে।

অখিল একটু দূর থেকে ব্যাপারটা দেখছিল। বিজিত যে এইভাবে এসময় এসে পড়বে। তার শিকার এইভাবে ছিনিয়ে নেবে, মেয়েটাকে বাঁচাবে তা ভাবেনি। ওদিকে নর্দমায় কাদা মেখে ভূত হয়ে উঠেছে পটলা। মণ্টাও ডাস্টবিনে একেবারে দুমড়ে মুষড়ে পড়েছিল। কোমরে বেজায় চোট লেগেছে। ওদিকে অখিলও বেগতিক দেখে এবার গাড়িতে উঠে পড়ে। বিজিত গাড়ির দিকে তেড়ে আসে। অখিল বুঝতে পারে ধরা পড়লে বিপদ, তাই সে-ও ওই আহত অনুচরদের ফেলে রেখেই পালায়। আর মণ্টা পটলাও ব্যাপারটা দেখে তারাও একটা অন্ধকার গলিতে ঢুকে পড়ে কোনও মতে পালাবার চেষ্টা করে। বিজিত ওদের ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে দেখে গর্জে ওঠে

—ফের যদি কোনদিন এপাড়ায় দেখি শেষ করে দেব তোদের। শিখা কাঁদছে এই নিদারুণ অপমানে। বিজিত অখিলকে ধরতে না পারলেও একটা আধলা ইঁট তুলে ওর গাড়ির দিকে ছুঁড়েছে। ইঁটটা জানলার কাঁচে লেগে ওর জানলার কাঁচটা চুরমার হয়ে যায়। তার টুকরোও লেগেছে অখিলের গলায়। বিজিত শিখার দিকে এগিয়ে আসে। কাঁদছে শিখা।

—আমি ভাবতেই পারিনি ওরা এভাবে অপমান করবে।

—এতরাতে এভাবে একা ফেরা ঠিক হয়নি। চল আর কোনও ভয় নেই, ওদের পালের সর্দারটাকে ধরতে পারলে আজই শেষ করতাম। ব্যাটা শয়তানের দল।

রাত হয়েছে। সুজিতও এর মধ্যে বাড়ি ফিরেছে। এখনও বিজিতের দেখা নেই। অবশ্য অর্ক-অনিমেষদের ওখানে আড্ডা দিয়ে মাঝে মাঝে দেরী করে ফেরে বিজিত। ওর জন্য তত ভাবনা নেই। ভাবনা হয় শিখার জন্য। সেই সন্ধ্যার মুখে বের হয়েছে এখনও ফেরেনি। ভবেশবাবুকে সাবিত্রী বলে,

—ছেলেমেয়েদের শাসনও করে না। এইভাবে একটা মেয়ে এতরাত অবধি বাড়ির

বাইরে থাকবে।

ভবেশবাবু বলেন,

তাদের নিজেরটা ওরা নিজেরাই রোজগার করে। উল্টে সংসারেই তারা কিছু দেয় —আমি তাদের তো কিছু দিইনি, অসহায়—বাবার তাই শাসন করার অধিকারই নেই।

—তাই বলে যা-তা করবে?

—ওরা কেউই যা-তা করেনা। কোনও ভাবে আটকে গেছে। ঠিক ফিরবে।

সুজিত বলে,

—তবু বাড়িতে একটা ডিসিপ্লিন তো মানতে হবে।

ভবেশবাবু বলেন,

—তুমি কি সেটা মানো?

সুজিত কি বলতে যাবে। বিজিত বিধ্বস্ত শিখাকে নিয়ে ঢুকছে। কান্নায় তার মুখ -চোখ ফুলে গেছে। ওর দেহ মনের উপর দিয়ে যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে। সাবিত্রী অবাক হয়।

—ওমা, একি রে শিখা। অনুষ্ঠানে গেলি কি হল সেখানে?

—শিখা জবাব দিতে পারে না। শুধু কান্নায় ভেঙে পড়ে মাকে জড়িয়ে, ভবেশ-বাবুও অবাক।

—কি ব্যাপার বিজিত?

বিজিত সমস্ত ঘটনাটা বলতে সাবিত্রী চমকে ওঠে।

—কার দলের নাম করলি? ওতো এ অঞ্চলের নামকরা মস্তান। নেতার ছেলে। তার দলবলকে ওইভাবে মারলি। ইট মেরে তার গাড়ির কাঁচ ভেঙেছিস, ওরে কি সর্বনাশ করে এলি?

—আমার সামনে জোর করে আমার বোনকে ওরা তুলে নিয়ে যাবে আর আমি চুপ করে দেখবো, তা তো হয় না মা। তাই ওদের মেরেছি দরকার হলে আবার মারবো, শেষই করে দোব-ওই নেতার বাচ্চাকে।

—তুই ঠিক করেছিস বিজিত। অন্যায়ের প্রতিবাদ করাই মানুষের কাজ। মেয়েদের ওপর অত্যাচার করবে। আর তার প্রতিবাদ হবে না? তুই ঠিক করেছিস—

সাবিত্রী বলে,

—ওই মস্তানগুলো তো শুনি সাংঘাতিক প্রকৃতির, ওরা সব পারে। ওরা কি চুপ করে থাকবে? এর পরে যদি কিছু করে?

সুজিত বলে,

—তুই শুধু শুধু মারপিট করতে গেলি—আরে বাবা —আজকাল এমন একটু -আধটু হয়।

বিজিত বলে,

—তোর মত আমি সব মেনে নিতে পারব না। আমার পাবার কিছুই নেই তাই মাথা তুলে অন্যায়ের প্রতিবাদই করবো।

—তাতো করলি, ওরা, কি ছেড়ে দেবে তোদের?

—নিজের জন্য ভাবিনা মা, ওদের সঙ্গে লড়ার শক্তি আমার আছে,

—কিন্তু শিখা, তাকে তো বের হতে হবে। ওকে যদি কিছু করে? কি সর্বনাশ করে এলি বিজিত? এখন শিখার কি হবে?

ভবেশবাবুও বলেন,

—তাইতো একথাও তো ভাবতে হবে।

—সুজিত বলে,

—আমিও ঠিক তাই বলছিলাম, দাদা তুই একটা প্রবলেমই তৈরি করলি।

বিজিত বলে,

—এটার সমাধানের ভারও আমিই নেব রে। তোমরা আমার উপর ভরসা করতে পারো।

সুজিত বলে,

—কি করবি তুই?

বিজিত ভাবছে কথাটা, শিখার চোখে জল, আজ সে-ও ভীত ত্রস্ত। বিজিত বলে—তুই ভাবিস না রে শিখা—একটা পথ হবেই। তোর কোনও ভয় নেই।

সুজিত বলে,

—মা। বীরত্বের কাহিনি শুনলে এদিকে রাত হয়ে গেছে, চল্ খেয়ে নিই। কাল সকালে আবার প্র্যাকটিসে যেতে হবে। সামনের লীগের বড় খেলা।

বিজিত ও ভাবছে কথাটা। এখন তবু সংসারের হাল কিছুটা বদলেছে বিজিত মন দিয়ে চাকরি করছে। প্রথম মাসের মাইনের টাকাটা মায়ের হাতে এনে দিতে সাবিত্রী খুশিতে ফেটে পড়ে। হাজার তিনেক টাকাই তার কাছে অনেক। এতদিন ভবেশবাবু চাকরির মাইনে এনে তুলে দিত ওর হাতে। সেই চাকরিও আজ নাই। পেনসনের উপর ভরসা করে দিন চলে না, আজ টাকাটা পেয়ে সাবিত্রী বলে।

—পাঁচ সিকের পুজো দিয়ে আসি ঠনঠনিয়া মা কালীর মন্দিরে, হ্যারে পরে মাইনে বাড়বে তো, বললি বড় অফিস।

বিজিত বলে,

—দেখা যাক।

—এবার সুজিতের একটা গতি হলে আমিও নিশ্চিন্ত হই। শিখার—বিয়ের কথাটাও এবার ভাবতে হবে।

মানুষের আশা কখনও এক জায়গাতে থেমে থাকে না, সে যেন ডানা মেলে উড়তে চায়।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। শিখা কলেজ থেকে ছাত্রীর বাড়ি তে গান শিখিয়ে ফিরছে। কদিন আগেকার ঘটনাটা, এখনও সে ভোলেনি, সে রাতে শয়তানের দল তাকে আক্রমণ করেছিল। তারপর থেকেই শিখা সন্ধ্যার পরই বাড়ি ফেরে সেদিনও ফিরছে। হঠাৎ ওদিকের পার্কের পাশে হঠাৎ দুটো ছেলেকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চমকে ওঠে।

ছেলে দুটো নিজেরা সিগ্রেট খাচ্ছে আর পথের দিকে চেয়ে আছে। ওরা যেন প্রতীক্ষা করে আছে। ওরা শিখাকে দেখতে পায় না। তবে শিখা ওদের দেখেই চিনতে পারে। ওরাই তাকে সে রাতে আক্রমণ করেছিল। এই অঞ্চলে। তারা সেদিন সুবিধা করতে পারেনি। তাই বোধহয় আবার এসেছে সেই কাজটা শেষ করতে।

শিখা আর এগোয় না। পাশের সরু গলিতেই ঢুকে পড়ে। ওই গলিটা দিয়ে অন্যপথে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফেরে শিখা। সাবিত্রী বলে।

—কি ব্যাপার রে শিখা?

শিখার চোখে-মুখে ভয়ের ছাপ, সে বলে।

—দাদা সে রাতের ছেলে দুটোকে দেখলাম পার্কের ওখানে দাঁড়িয়ে আছে কে জানে আবার কিছু করবে কিনা।

সাবিত্রীও এমনি ভয়ই করেছিল। বলে সে

—ওমা। ওরে বিজিত বলিনি ওরা সাংঘাতিক ছেলে, যদি আবার কিছু করে শিখার।

বিজিত ও কথাটা শুনে বের হয়ে যায়। আজ ওদের আরও কড়া ডোজ দেব।

—কোথায় চলল বিজিত

—আসছি, বিজিত বেরিয়ে যায়।

সাবিত্রীও ভীত, সে বলে।

—এ কি সর্বনাশ হল রে।

এরমধ্যে সুজিত এসে পড়ে, মা বলে,

—ওরে সুজিত তোর দাদা পার্কে কাদের সঙ্গে গোলমাল করতে গেল তুই-যা বাবা।

সুজিত দাদাকে চেনে, এমন মারপিট দাদা প্রায়ই করে, সুজিত ওসব গোলমালে যেতে চায়না, সে বলে,

—ছাড়তো ওসব কথা। দাদা এসে পড়বে, কোনও গোলমাল হবেনা, বিজিতও ফিরে আসে, সে বলে,

—না রে। তেমন কাউকে দেখলাম না, তবে ছেলেদের বলেছি নজর রাখতে। ওরা এলে আর ফিরে যাবে না।

সাবিত্রীও এবার বিপদের কথাটা ভাবছে। তখনকার মতো ব্যাপারটা চাপা পড়লেও সাবিত্রীর মনে ঝড় তুলেছে। রাতে ওরা খেতে, বসেছে। ভবেশবাবুও রয়েছেন। সাবিত্রী বলে,

—শিখার বিয়ে দেবার চেষ্টাই করো বাপু, ও বিজিত ওই একটা মেয়ে, ওর যদি একটা ভালোমন্দ হয়ে যায়। ওর বিয়ের একটা দেখাশোনা কর।

ভবেশ বাবু বলেন,

—সে তো ভালো কথা। কন্যাদায় মহাদায়, আমি তো আজ অসহায় বিজিত সুজিত তোরা কিছু করতে পারিস না বাবা? টাকা-কড়িরও দরকার। সুজিত কোন জবাবই দেয়না। জবাব দেবার যেন কোন প্রয়োজনই বোধ করেনা, এই সংসারে সে কেউ নয়।

শিখা নিজের ঘরে কাঁদছে, আজ একান্ত বিষণ্ণ অসহায় সে। বিজিত ওর মুখটা তুলে ধরে। দুচোখে জলের ধারা, বিজিত বলে,

—কাঁদছিস কেন রে পাগলী, আর কোনও ভয় নেই, আমি তো আছি দেখবি সব প্রবলেম সল্‌ভ হয়ে যাবে।

শিখা বলে,

—তুই বলছিস দাদা?

—হ্যাঁরে, যা খেয়ে নে। মা আজ আলুবড়ার তরকারিটা যা করেছে সুপার, ওটা তো তোর খুব ফেবারিট।

অলরেডি চুরি করে ম্যানেজ করিস নি তো। হাসছে শিখা। আজ সে-ও যেন বিজিতের কথায় সাহস ফিরে পেয়েছে।

বিজিত বেশ কিছুদিন অনিমেষের বাড়িতে আসতে পারেনি। অনিমেষও ওদের ব্যাবসার কাজে বিলেত-আমেরিকা গেছল। সেখানের ওদের কোম্পানির এখন প্রচুর মালপত্র যাচ্ছে। সেই সব মার্কেট সার্ভে করতে গেছল।

ফিরে এসে ফোনও করছে অনিমেষ। আজ তাই শনিবার অফিসের হাফছুটির পর বিজিত গেছে অনিমেষের বাড়িতে। অনিমেষ কেও বলে বিজিত। অনিমেষও জানে অখিলের ওই সব মস্তানির কথা। এখন ওর বাবার দৌলতে অখিলও নানা রকমের অন্ধকারের ব্যাবসাপত্র করে বেশ কিছু টাকাও রোজগার করে আর তাই তার দলবলও গড়ে উঠেছে তার বাবার রাজনৈতিক মদতে। অনিমেষ বলে,

—শিখার ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্তই নিতে হবে। নিবেদিতা ফিরলে আমি তোকে নিয়ে বের হবো। একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। তুই ভাবিস না। অনিমেষ ভিতরে চলে যায়। একাই ঘরে রয়েছে বিজিত। আজই সে সত্যিই বিপন্ন, নিজের কথা ভাবার সময় তার নেই, ঢুকছে নিবেদিতা। অন্য সময় বিজিত এ বাড়িতে এলে নিবেদিতা নিজেই উদ্যোগী হয়ে কিছু খাবার নিয়ে আসতো। সুযোগ পেলে নিবেদিতাও কিচেনে দু-একটা আইটেমও বানাতো ওদের জন্য। নিজে এসেও বিজিতদের আড্ডায় বসে পড়তো, অকারণে খুশিতে হাসির তুফান তুলতো।

কিন্তু আজ নিবেদিতা ওকে দেখে ওযেন দেখেনা, ধনীর দুলালী নিবেদিতা চেয়েছিল বিজিত তার জন্য কিছু করে। নিবেদিতাও তাই চেয়েছিল বিজিত তার বাবার ওই ট্রেনিং নেবার কথাটা মেনে নেবে। কিন্তু বিজিত তা নেয়নি। নিবেদিতাই বেশি চটে উঠেছিল। আর নিবেদিতাও জেনেছিল বিজিতের মত একটা ছন্নছাড়া স্বভাবের ছেলে তাঁর নির্ভর করা যায় না তার সঙ্গে কোনও সম্পর্কই গড়ে উঠতে পারে না। বিজিতও দেখছে নিবেদিতাকে, ওর মুখে আগেকার হাসির সেই ঝলক নেই। নীরব কাঠিন্য ফুটে উঠেছে। বিজিতের দিকে নীরব চাহনি মেলে তাকে দেখে কিছু না বলেই ভিতরে চলে গেল।

অনিমেষ ঢুকছিল, সে-ও নিবেদিতার এই ব্যবস্থা দেখে। বিজিতও বুঝেছে যে

নিবেদিতা আজ ইচ্ছা করেই তাকে উপেক্ষা করে গেল। ওসব কথা ভাবার সময়ও বিজিতের নেই। সে ভাবছে শিখার কথা। তাকে একটা ভয়ঙ্কর বিপদের হাত থেকে বাঁচাতে হবে।

অনিমেষের ডাকে চাইল বিজিত। অনিমেষ বলে,

—চল, দেখি শিখার কোনও ব্যবস্থা হয় কিনা।

সকালে সাবিত্রী চায়ের আসরে ভবেশবাবুকে বলেন,—

—শিখাকে কদিন বেরোতে নিষেধ করেছি। যা দিনকাল পড়েছে।

ভবেশবাবু বলেন,

—মেয়েটা ঘরে বন্দি থাকবে ওই শয়তানদের উৎপাতে। তার ওতো লেখাপড়া কাজকর্ম আছে। ও সুজিত তোর তো অনেক চেনাজানা রয়েছে। কিছু একটা কর।

সুজিত চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বলে,

—আমি আর কি করবো। দাদা হয়তো ওদের সঙ্গে ঝামেলা বাধালো।

শিখা জানায়,

—দাদা সেদিন ওসব না করলে আমার যে কি হতো? দাদা তো কোনও অন্যায় করেনি।

সুজিত বলে,

—দাদাকে বল ওই যা করার করুক। আমি কি করবো। এখন আমার সময় নেই। সকালে প্র্যাকটিস, পরীক্ষার পর তো আমার সময়ই নেই। এবার যদি ভালো খেলতে পারি। বড় টিমে চান্স পাব।

ভবেশবাবু বলেন,

—বিজিত তো চেষ্টা করছেই তোমাকেও বললাম, তুমি যদি বিবেচনা করে কিছু করার চেষ্টা করো। নাহলে করো না, ওটা তোমার ব্যাপার।

সুজিত উঠে পড়ে। তাকে এখন প্র্যাকটিসে যেতে হবে। এই সিজনে দু-একটা পথ তাকে পেতেই হবে। অন্যের সমস্যা ভাবার সময় তার নেই। সামনে তাদের টিমের খেলা রয়েছে। সেই বিখ্যাত বেঙ্গল টিমের সঙ্গে। এই খেলাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য সুজিতের টিমের পক্ষে ওই টিমকে হারানো খুবই কষ্টকর, তবে ইস্টবেঙ্গল টিমকে হারাতে পারলে তাদের টিমের নাম ডাক বাড়বে, এই খেলাটা জেতার খুবই দরকার তাদের লীগ চ্যাম্পিয়ন হবার পক্ষে এই খেলাতে জিততেই হবে।

আর সুজিত চায় বেঙ্গল টিমকে রুখে দিতে। দু-একটা গোল দিতে পারলে এই খেলায় তার নামও বাড়বে, অন্য বড় বড় টিমের কর্মকতাদের নজরে পড়বে। এই সুযোগ তার মতো সুযোগ সন্ধানী প্লেয়ার হাতছাড়া করতে পারেনা, তাই সুজিতও মন দিয়ে প্র্যাকটিস করছে।

এদিকে ইস্টবেঙ্গলে টিমের সেক্রেটারি বিপুলবাবুও এসব অঙ্ক কষে টিমকে তৈরি করেছে, এবার ও লীগ তাদের পেতেই হবে, রোজ সকালে বিপুলবাবু আসেন নরেশ

বাবুর বাড়িতে। প্রথম দিকের খেলায় তারা ততটা গুরুত্ব দেয়নি, তাই দু-একটা পয়েন্ট লস করেছে। এবার তাই অনেক সতর্ক। নরেনবাবুর ছোট ভাই দেবেনবাবুর মোহন বাগানও চায় বেঙ্গলটিম এই খেলায় হারুক। তাহলে মোহনবাগান এগিয়ে থাকবে। আর তারাই তখন চ্যাম্পিয়ন হবার দিকে এগিয়ে যাবে।

তাই নিয়ে রোজ সকালে নরেশবাবুর বসার ঘরে খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়। একদিকে নরেশবাবু, নিবেদিতা আর বিপুলবাবু আর অন্যদিকে দেবেনবাবু আর অনিমেষ। দেবেন বলে,

—আরে বেঙ্গল টিম তো জন্মালো সেদিন, আর মোহনবাগান ইংরেজদের সাথে লড়ে শিল্ড কেড়ে নিয়েছে। তোমাদের তো ভিড়িয়ে দেব।

নিবেদিতা বলে,

—কাকু কোনকালে ঘি খেয়েছ, আজ হাত শুঁকলে কি তার গন্ধ পাবে? পাবে না, দেখবে তোমার মুখের সামনে থেকে লীগে তো নেবোই শীল্ডও।

নরেশবাবু বলে,

—কথাটা শুনে রাখ দেবু।

বিপুল বলে,

—ইয়েস, কথাটা শুনে রাখ ছোড়দা, তোমার টিমের কর্মকর্তাদের গিয়ে বলো।

দেবেন বলে,

—সামনে ওই এলে বেলে টিমের সঙ্গে খেলাটা জেতো। তারা ওদের একটা স্ট্রাইকারও তোমাদের টিমকে তছনছ করে দেবে। ক'গোল খাও তাই দ্যাখো। তারপর লীগ জেতার স্বপ্ন দেখবে,

নিবেদিতা বলে,

—কাকা সেদিন তোমার টিমকে দেখবে ইস্টবেঙ্গল গোলের মালা পরিয়ে দেবে।

দেবেন বলে,

—কে কাকে মালা পরায় সেটা দেখা যাবে সেদিন। আর কথা বলিস না।

অর্ক এখন একটা কলেজে অধ্যাপনার চাকরি করছে। ছাত্র হিসাবে সে খুবই ভালো, বুদ্ধিমান, পড়াশোনাও করে মন দিয়ে। এখন কলেজে পড়ানোর পাশাপাশি গবেষণার কাজও শুরু করেছে। তার জন্য পড়াশোনও করতে হচ্ছে, অর্ক তার জগত নিয়েই আছে মধ্য কলকাতার ওদিকে একটা ফ্ল্যাটও নিয়েছে, অর্ক ও অন্যান্য বন্ধুদের সাথে যোগাযোগও রেখেছে। তবে আগে যেমন কলেজে প্রতিদিন আড্ডা হতো, এখন সেই অবকাশ কারোও নেই।

বিজিতও চাকরি করছে কোন অফিসে। অনিমেষ ওদের ব্যবসার কাজে এরমধ্যে দু-একবার ইউরোপ-আমেরিকা ঘুরে এসেছে। অন্য সময় তাকে অফিসের কাজও দেখতে হয়।

তবু রবিবার ছুটির দিন ওরা অর্কের ফ্ল্যাটে এসে হাজির হয়। আড্ডাও চলে

যথারীতি। আজ অর্ক বাড়িতেই রয়েছে। রবিবারটা সে ঘুমিয়ে কাটাবে। এমন সময় বিজিত অনিমেষকে আসতে দেখে খুশিই হয়।

—আয় বোস।

—তোর সময় নষ্ট করলাম নাতো। পড়াশোনা করছিলি, একটা বিশেষ ব্যাপারে আসতে হলো রে, খুব সমস্যায় পড়েছি,

—সমস্যা। তোর! অর্ক-ও অবাক হয়। বিজিত কোনদিনই তার নিজের সমস্যার কথা কাউকে জানায়নি। আজ সেটা জানাতে দেখে অর্ক বলে,

—তুই তো এভাবে ভেঙে পড়িস না রে, কি হল বিজিত?

এবার অনিমেষই শিখার সেই সমূহ বিপদের কথাটা জানায় অর্ককে। অর্কও সব কথা শুনে ভাবছে অর্ক এখন একটা কলেজের অধ্যাপক তার নিজের বিচার বুদ্ধি আছে। সে-ও জানে আজকের সমাজে বেশ কিছু এমনি ধরনের মস্তানের কথা—তারা কোনও নেতার ছত্রছায়ায় থেকে সমাজের সাধারণ মানুষ এমনকি মেয়েদের উপরও সবরকম চরম অত্যাচার করে আর প্রশাসন ওদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই নিতে চায়না— পারেনা, ফলে নারী নিগ্রহের ঘটনাও বাড়ছে। শিখাও সেই নিগ্রহের শিকারে পরিণত হয়েছে আরও দুর্ভোগ তাকে পোয়াতে হবে, যদি কোনও ব্যবস্থা না নেওয়া হয়।

বিজিত অনিমেষও তাই এসেছে অর্কের কাছে একটা অনুরোধ নিয়ে। তারাও জানে অর্কও শিখাকে চেনে জানে। মেয়ে হিসাবে শিখাও খারাপ কিছু নয়। বরং সবদিক থেকেই সে অর্কের যোগ্য পাত্রীই।

অনিমেষকে যেতে হবে ইংল্যান্ড আমেরিকায় তাদের কোম্পানির কাজে। অনিমেষও চায় এদেশেই-নয় ওদেশে ওদের ব্যবসার প্রসার ঘটাতে সে-ও দেখাতে চায় যে ব্যাবসার কাজে তারাও বিদেশীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে। ওকে তাই ওদেশে গিয়ে পায়ের তলে মাটি পেতে হবে,বিদেশে যাবার আগে অনিমেষও চায় বিজিতের এই পারিবারিক সমস্যার সমাধান করতে।

বিজিতকে অনিমেষ তার বন্ধু বলে মেনে নিয়েছে। দেখছে বিজিতের তেজস্বী-প্রতিবাদী চরিত্রকে। তার পরিবারের জন্য নিঃস্বার্থ ত্যাগ। অনিমেষও দুঃখ পেয়েছে তার বোন নিবেদিতার ব্যবহারে, সাধারণ ধনী পরিবারের ছেলে মেয়েদের মানসিকতার খবর সে রাখে, এটা ভোগবাদী সমাজের চরম স্বার্থপরতা। আত্মকেন্দ্রিক। এরা নিজের স্বার্থ ছাড়া এক পা চলে না। আর সেই স্বার্থের জন্য সব আদর্শ মূল্যবোধকেও অনায়াসেই তুচ্ছ করতে পারে। নিবেদিতা বিজিতকে প্রত্যাখান করেছে। কারণ বিজিত স্বার্থপর নয়। স্বার্থের জন্য নিজেকে বিকিয়ে দিতে পারেনি। অনিমেষের সেদিন গর্বে বুক ফুলে উঠেছে যেদিন বিজিত নরেশবাবুর দেওয়া সাহায্যকে প্রত্যাখান করেছে। অনিমেষ দেখছে বিজিত আজ তার বোনের জন্য বিপন্ন।

অনিমেষ তাই এসেছে অর্কের কাছে। সে বলে,

—অর্ক, তুইতো এখন পায়ের তলায় শক্তমাটি পেয়েছিস নিজের ফ্ল্যাট ও হয়েছে

ভালো চাকরি করছিস, পরে ডক্টরেট পাবি। তোর চাকরিতে উন্নতিও হবে, আজ শিখাকে তুই এই বিপদ থেকে উদ্ধার করে তোর ঘরে আন। তোরা সুখী হবি।

বিজিত বলে,

—তোকে জোর করব না অর্ক, তবে তুইও চিনিস শিখাকে, ওর জন্য যদি কিছু করতে পারিস।

অর্ক ও ব্যাপারটা ভেবেছে। সে বিজিতকে তার জীবনাদর্শকে শ্রদ্ধা করে। শিখার সম্বন্ধে ও তার মনে একটা স্বপ্ন ছিল, তাই অর্ক বলে।

—ঠিক আছে অনি, আমিও ভেবে দেখলাম শিখার এই বিপদে ওর পাশে থাকবো। ওকে আমার স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে আমার ঘরে আনবো।

—তুহ সত্যি শিখাকে বাঁচালি অর্ক।

—এটা আমার কর্তব্য। আর কর্তব্য করাটা যে মানুষের ধর্ম সেটাও তোদের কাছেই শেখা।

অনিমেষ বলে,

—সত্যিই তাহলে লেখাপড়া শিখে, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তুই অমানুষ হয়ে যাসনি অন্যদের মতো, তাহলে আমি বিদেশে যাবার আগেই তোদের বিয়েটা দেখে যেতে চাই। অনেক দিন বরযাত্রী যাইনি এবার সেজেগুজে বরযাত্রী যাবো রে বিজিত। উদ্যোগ আয়োজন করে সামনের শুভদিনই শুভ কাজটা সেরে ফেলতে হবে।

বিজিত ভাবতে পারেনা যে এত সহজে এতবড় সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। বিজিত বাড়ি ফিরছে। ভবেশবাবুও এবার ভাবনাতে পড়েছেন। এতদিন এ পাড়াতে বাস করেছেন স্কুলের শিক্ষকতা করেছেন কারো সাতে-পাঁচে থাকনেনি। মাথা উঁচু করেই ছিলেন। ছেলেরাও এপাড়ার অনেকের পরিচিত এবং প্রিয়। ভবেশবাবু গরিব তবু সম্মানীয় ব্যক্তিই ছিলেন এতদিন, সেদিনের সমাজ ব্যবস্থায় একটা মূল্যবোধ ছিল, পাড়ার পথ দিয়ে গেলে সকলে শ্রদ্ধায় মাথা নত করত।

কিন্তু কয়েকবছরেই কোনও একে অদৃশ্য হাত ওদের কেমন বদলে দিয়েছে। ভবেশবাবুর মনে হয়েছে এ স্বাধীনতা বা জনগণের চেতনার উন্মেষ নয়। এক মূল্য বোধহীন—আদর্শহীন স্বার্থপরতার উন্মেষ। এর ফল আজকে যুবসমাজের বয়স্কদের প্রতি শ্রদ্ধা নেই—অনুকম্পা করে তাদের বাতিলের দলে ফেলে দিয়েছে।

আবার তারা মেয়েদেরও সামান্যতম সম্মানটুকু দিতে নারাজ। একশ্রেণীর তরুণকে কারা সমাজের বুকে লুঠপাঠ তোলাবাজি করার অধিকারই দিয়েছে।

তাই ভবেশের ভয় হয় যদি শিখার আবার কোন সর্বনাশ ঘটে আর সেই সর্বনাশকে প্রতিরোধ করার শক্তিও তার নেই। ভবেশবাবু তাই ভাবনায় পড়েছেন।

সাবিত্রী বলে,

—শিখা কদিন সন্ধ্যায় আর বের হবেনা। আর এমনিতে দরকার না থাকলে বের হবি না।

শিখা বলে,

—এমনি করে ওদের ভয়ে ঘরে বন্দি হয়ে থাকতে হবে?

—তাইতো দেখছি মা। স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকারটুকু আমাদের নেই। এর চেয়ে তো ব্রিটিশের আমলে পরাধীন থেকেও আইন শৃঙ্খলার সাহায্য পেয়েছি।

ঢুকছে বিজিত, সে বলে,

—বাবা, শিখার বিয়ের কথাই পাকা করে এলাম।

এবার চমকে ওঠেন ভবেশবাবু, যা তিনি এতদিন শুধু মনে মনে ভেবেছেন—তা আজ বিজিত কাজে পরিণত করে এসেছে। তার জীবনের শেষ স্বপ্ন ছিল মেয়েটাকে সুখী করা। তাকে যোগ্য ঘরে বিয়ে দেবেন কিন্তু তা স্বপ্নই রয়ে গেছে।

সাবিত্রী বলে,

—সে কি রে? পাত্র কোথায় পেলি? কি করে সে? কেমন ছেলে? শিখার কানেও গেছে কথাটা। সে-ও উৎকর্ণ হয়ে শোনে।

বিজিত বলে,

—পাত্র ভালোই, তোমাদের চেনাজানা। কলেজের প্রফেসর—অর্ক।

শিখা কথাটা শুনে মনে মনে খুশীই হয়। আজ তার সব আঁধার কেটে গেছে। নতুন আশার আলো দেখতে পায় সে।

ভবেশবাবু বলে,

—ওরে বিজিত! তুই যেন মন্ত্র জানিস রে! সব বিপদ আপদকে সহজেই দূর করে দিতে পারিস, কিন্তু তোর অবস্থা ওই কচের মত সে গুরু শুক্রাচার্যের কাছে মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্র শিখেছিল, কিন্তু সেই মন্ত্র সে অন্যকে শিখিয়ে জীবনদান করতে পারতো—কিন্তু নিজে প্রয়োগ করতে কোনদিনই পারেনি। তুই আমাদের সুখী করতে পারলি, নিজেকে সুখী করতে পারলি না।

সাবিত্রী বলে,

—নিশ্চিন্ত হলাম বাবা কিন্তু বিয়ে বলে কথা। তার খরচও তো আছে, তারপর ও কি নেবে?

বিজিত বলে,

—ওসবের জন্য তোমাকে ভাবতে হবেনা মা। অর্ক নেবে না কিছুই— শিখাকেই নিয়ে যাবে। বাকি টাকার ব্যবস্থাও হয়ে যাবে। অফিস থেকে কিছু লোন করবো।

ভবেশবাবু বলেন,

—আমিও শিখার জন্য কিছু রেখেছি।

—সুজিতকেও বলি। ওতো এখন ভালোই রোজগার করে শুনি। যদি কিছু দেয়।

সুজিত এখন ফুটবলপ্রেমী এক দাদার ওখানেই ওঠাবসা করে। টিমে নামী প্লেয়ার সুজিত। কিছু টাকাও পায় দাদার ক্লাব থেকেও। এবার ডিভিশনের সেই টিমও সুজিতের মতো স্ট্রাইকারের জন্য বেশ কয়েকটা টিমকে লীগের খেলায় হারিয়ে সুনাম কুড়িয়েছে। আর সুজিতের নাম ছবি ছাপা হয়েছে খবরের কাগজে। এ বছরের উঠতি প্লেয়ারদের

মধ্যে সুজিতের ভবিষ্যৎ যে সম্ভাবনাময় তাও লিখেছে কাগজওয়ালারা।

ইস্টবেঙ্গল টিমের সাথে সুজিতদের টিমের খেলা পড়েছে এবার। ওই টিম ভারতের অন্যতম নামী টিম। তাদের ক্লাবের পরিচিতি আছে সারা ভারতবর্ষে, দিল্লি মুম্বাইতে নানা ট্রফিতে খেলতে যায়। এবার ভারতের বাইরেও গেছে। আর সেখানেও নাম করে এসেছে। সারা ভারতের টিমে খেলে ওদের ছয়সাতজন প্লেয়ার এবার আশা করছে বেঙ্গল টিম এশিয়ান কাপ খেলবে আর বিজয়ীও হয়ে এশিয়ান কাপ ভারতে আসবে।

ওদের টিমের কর্ম কর্তাদের অন্যতম নরেশবাবু। তার মেয়ে নিবেদিতাও টিমের অন্ধ সমর্থক। বেঙ্গল টিমের বর্তমান সেক্রেটারি বিপুলবাবুও নামী ব্যবসায়ী। কিন্তু ব্যবসার কাজকর্ম দেখার চেয়ে সে বেশি সময় দেয় ক্লাবের পিছনে। আর তার চাপে পড়েই নরেশবাবুও বর্তমান বেঙ্গল ক্লাবের সহ-সভাপতির পদে রয়েছেন।

নরেশবাবুর বসার ঘরে এখন বেঙ্গল ক্লাবের কর্তাদের জরুরি মিটিং বসে, অবশ্য নরেশবাবুর ভাই দেবেন বলে,

—এবার পচা শামুকে না পা কাটে তোমাদের। লীগ চ্যাম্পিয়ন হবার স্বপ্ন দেখছো সামনে ওই নতুন টিমের খেলার কথাটা ভাবো। ওরা যদি তোমাদের রুখে দেয় দু-পয়েন্ট লস্ করে—ওদিকে উঠে আসবে মহিন্দ্রা মহিন্দ্রা—আর চার্চিল ব্রাদার্স।

বিপুল বাবু ভাবছে কথাটা। এই নতুন দলে একটা নতুন স্ট্রাইকার উঠছে এ যাবৎ লীগের সব খেলাতেই সে গোল করে এখন হেভিওয়েট গোলদাতার পজিসন নিয়েছে। ভয় ওই ছেলেটাকে।

নরেশ বাবু বলে,

—এ তোদের মোহনবাগান টিম নয় দেবু। বেঙ্গল টিম যা করে বিদ্যুৎ গতিতে করে।

নিবেদিতা বলে,

—আমরা এ্যাটাক শুরু করলে ওদের টিমকে বিপর্যস্ত করে দেবো। মোহনবাগান তো হেরে কোণঠাসা হয়ে গেছে, আমরা হারতে জানিনা।

—কারেক্ট।

বিপুলবাবু মাঠে অন্য টিমের খেলাও দেখেন। তার নজর আছে উঠতি নতুন প্লেয়ারদের দিকে। তিনি ফুটবলের জগতে বেশ কিছু নতুন প্রতিভাকে এনেছেন। আর একটা ছেলের খেলা দেখে তিনি বুঝতে পারেন কার কেমন সম্ভাবনা। তাই ওই ছেলেটার কথা তার মনে পড়ে। দারুণ স্পিড আর তেমন জমজমাট, টাইমস্পিড, রাইট জাজমেন্ট, ড্রিলিং করে বিপক্ষের প্লেয়ারদের ছিটকে ফেলে ঠিক গোলে বল মারবেই। ছেলেটা বিপক্ষের অন্যতম স্ট্রাইকার।

—দেবু ঠিক বলছে নরেশ দা। ওই টিমটার দাপটও কম নয়। ওদের একটা স্ট্রাইকার দারুন ফর্মে আছে ওটা যদি কিছু করে ফেলে,

নিবেদিতা বলে,

—কারো করার কিছু নেই কাকাবাবু, আমরা জিতবোই শীল্ডও পাবো।

খেলার দিন নরেশবাবু, নিবেদিতাও মাঠে গেছে। অনিমেষের খেলার দিকে বেশি আগ্রহ নেই। ও এখন ব্যবসার কাজে বেশি ব্যস্ত। আর সন্ধ্যার পরে যেতে হয় অর্কের ওখানে। বিজিতদের বাড়িতে। অর্ক আর শিখার বিয়ের যোগাড়যন্ত করতে। ওরাও ব্যস্ত। তাছাড়া ওই বিজিতের সঙ্গে নিবেদিতার এড়িয়ে যাওয়া সম্পর্কটাকে সমর্থন করতে পারেনা, অনিমেষ। তাই বাবা আর বোনকে যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলে সে। বিপুলবাবু ক্লাবের অন্য কর্মকর্তারাও নরেশ নিবেদিতার আশপাশেই রয়েছে। আজকের খেলার ফলাফলের উপর বেঙ্গল টিমের ভাগ্য নির্ধারণ হবে। তাই এই গুরুত্বপূর্ণ খেলার কভার করতে এসেছে বহু সাংঘাতিক ক্যামেরামান। মাঠে তিলধারণের জায়গা নেই। সুজিতের টিম মাঠে নেমেছে সুজিত জানে আজকের খেলার গুরুত্ব। আজ যদি গোল করতে পারে খবরের কাগজে টিভিতে তার নাম বের হবে। আর বেঙ্গল টিমকে গোল দেবার জন্য সহজেই সে পরিচিত হতে পারে। আর রুখে দিতে পারে বেঙ্গল টিম কে। তাই সুজিত আরও প্রাণপণে খেলছে। বেঙ্গলটিম বনেদী টিম তারা প্রথমে ওই ছোট টিমকে ততটা গুরুত্ব দেয়নি। ভেবেছিল অনায়াসেই তারা জিতে যাবে, কিন্তু সুজিতের টিমও আজ মরীয়া হয়ে খেলছে। তারাও আজ নিজেদের কৃতিত্ব জাহির করতে চায়।

ওরা আজ মরীয়া হয়ে উঠেছে। যদিও বেঙ্গলের দিক থেকে দু-চারবার এদের ডিফেন্সকে হানা দিয়েছে। তবু গোল করতে পারেনি। প্রথমার্ধের খেলা প্রায় গোলশূন্য হয়ে শেষ হবার পর দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হয়েছে। এবার সুজিতরাও আক্রমণ শুরু করে। ইস্টবেঙ্গল প্রায় নাস্তানাবুদ হয়ে পড়েছে।

নরেশবাবু উত্তেজনায় বলেন,

—একি করছে বিপুল! তোমার টিম একটা গোল ও করতে পারল না। ওদের সাইডে বল নিয়েই ঢুকতে পারছে না।

নিবেদিতা ও এবার চুপসে গেছে। সে বলে,

—ওই স্ট্রাইকারকে রুখতে পারছে না।

—সুজিতকে রোখা মুস্কিল হয়ে উঠেছে।

বিপুলের কথায় নরেশবাবুও স্বীকার করেন।

—ছেলেটা দারুণ খেলে হে —নারে নিবেদিতা!

নিবেদিতা দেখছে সুজিতকে। ছেলেটার খেলার মধ্যে নিজস্ব একটা স্টাইল আছে। ওর জাজমেন্ট ও নিখুঁত—সুবিধামত জায়গাটা চিনে নিতে ওর দেরি হয় না। ও তাই সহজেই বলও পায়। আর পায়ে বল পেলে ও বদলে যায়। বিপক্ষের ডিফেন্সকে পুতুলের মত নাচিয়ে নিজে মুভমেন্ট করে বেরিয়ে যায়। তখন ওর গতিবেগ ও তীব্রতর হয়ে ওঠে ওর পায়ের লক্ষ্যও অভ্রান্ত। বলটা পেয়ে এর মধ্যে লেফট ব্যাক ও অন্য আর একজনকে কাটিয়ে গোলে মেরেছে, জোর বরাত বলটা ক্রসবারে লেগে ফিরে আসতে বেঙ্গলের ব্যাক সেটাকে ক্লিয়ার করে। নয়ত অবধারিত ছিল গোল।

এতক্ষণ শ্বাসরুদ্ধ করে বসেছিল নিবেদিতা, এবার বলে,

—বাবা তোমাদের ডিফেন্সকে তো তছনছ করে দিচ্ছে একাওই সুজিত যা খেলছে আজ ও তোমাদের সর্বনাশ না করে।

বলতে না বলতে সুজিতের পায়ে বল, সুজিত আর ভুল করেনা। বাঁ পায়ের তীব্র সটে বলটা বেঙ্গলের নেটে জড়িয়ে দেয়। সারা মাঠ নিমেষের মধে স্তব্ধ হয়ে যায়। এটা যে সত্যি ঘটেছে তা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। তারপর এই কঠিন সত্যটাকে বুঝতে পেরে জনতা চিৎকার করে ওঠে। ইস্টবেঙ্গল টিমের সমর্থকরাও স্তব্ধ হয়ে গেছে ওই ছেলেটা যে এভাবে একা বেঙ্গলটিমের দুর্ভেদ্য ডিফেন্স কে তছনছ করে গোল করবে তা এরা ভাবতেও পারেনি।

বিপুলবাবুরা গোল খেয়ে তাদের প্লেয়ারদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে থামবেনা। একের বদলে তিনটে গোল চাই, কিন্তু বেঙ্গল টিমকে এবার প্রতিপক্ষও যেন বন্দি করে দিয়েছে। ওদের আর বল নিয়ে এগোতে দিচ্ছে না। উল্টে তাদের দিকেই বল চেপে রেখেছে। সুজিত তার টিমের ফরোয়ার্ড লাইনকে দাবার ছকের মতো সাজিয়ে নিয়ে পর পর আক্রমণ করে চলছে। তাদের ডিফেন্স লাইনও মরীয়া হয়ে উঠেছে খেলা প্রায় শেষ হতে চলেছে। ইস্টবেঙ্গলকে গোল শোধ করতেই হবে। নরেশবাবুরাও তাই চান। কিন্তু শেষ মুহূর্তে আবার বল পায় সুজিত। হাফভলি থেকে বলটাকে আসতে দেখে পজিসন নিয়ে নিপুণভঙ্গীতে একটা বাইসাইকেলে কিক করে। এদিকে গোলকিপার ভাবতেই পারেনি যে এই ভাবে বলটাকে মারবে। বলটা তীব্রবেগে এসে গোলে ঢোকে। সারামাঠ চিৎকার করে ওঠে। বেঙ্গল টিম শেষ চেষ্টা করেও পারেনা। খেলা শেষ হয়। দুগোলে তাদের জয়রথ থেমে যায়।

সুজিতকে ঘিরে রয়েছে খবরের কাগজের লোকজন— মিডিয়ার ক্যামেরা ওর ক্লাবের কর্মকর্তারা। সে আজ এই মাঠে নতুন এক ইতিহাস রচনা করেছে। বেঙ্গল টিমের তাঁবুতে তখন শুনশান ভাব। আজ তাদের টিমকে হারিয়েছে ওই একটা ছেলে সুজিত। বিপুল দেখে ছেলেটা এই সিজনের টপ প্লেয়ার। ওব সম্ভাবনাও আছে। তাদের টিমে যদি ওকে আনতে পারে তাহলে বেঙ্গল টিম সবদিক থেকে নাম্বার ওয়ান হয়ে উঠবে। নিবেদিতারও ছেলেটির খেলা দারুন লেগেছে। নরেশবাবু ভেঙে পড়েছেন। অভিমানে বলেন,

—এই ভাবে গোল দিল ছেলেটা, একাই তছনছ করেদিল আমাদের।

বিপুল ফুটবল খেলার ভিতরের জগতের নানা কৌশলের খবর রাখে, কি করে টিমকে শক্তিশালী করতে হয় তাও জানে সে। বিপুল বলে,

—নরেশদা, ওই সুজিতকে আমাদের টিমে আনতে হবে।

—পারবেন কাকাবাবু?

—ও কি ওর দল ছেড়ে আসবে? ওকে আনতে পারলে তো খুবই ভালো হয়।

বিপুল বলে,

—নরেশদা চাঁদির জুতো ঠিকঠাক মারতে পারলে এই দুনিয়ায় সব কাজই ঠিকঠাক

হয়ে যায়। সুজিত-এর খোঁজ-খবর আমি নিয়েছি একটু ভালো টোপ মানে মোটা টাকা আর একটা ভালো চাকরির ব্যবস্থা যদি করা যায় ও ঠিক টোপ গিলবেই। চলে আসবে আমাদের টিমে।

নিবেদিতা বলে,

—তাই দেখুন কাকাবাবু ওকে আমাদের টিমে আনতেই হবে। নরেশবাবুও তাই চান। আজকের পরাজয় তার মনে চিড় ধরিয়েছে। টাকার জন্য ভেবো না। আর লেখাপড়া যদি জানে ওকে আমার কারখানার লেবার অফিসার করে দোব। তুমি চেষ্টা শুরু করো।

—আমার চেষ্টা বৃথা হবে না নরেশদা। ছেলেটাকে ঠিক ভাঙিয়ে আনাবোই।

সুজিত আজ টিমের জন্য প্রাণপণ খেলে একাই দুটো গোল করেছে। সুজিত আশা করেছিল তার টিম তাকে গোলের জন্য আলাদা টাকাও দেবে। কিন্তু টিমের কর্মকর্তারা জেতার আনন্দে বিভোর। টাকার কথা আর তারা বলে না। একজন এখন আড়ালে বেশ কয়েকটান মেরে ফিট হয়ে উঠেছে। টাকার কথা শুনে সে বলে সুজিতকে,

—আরে কত নাম ফাটলো তোর। তোকে কোথায় তুলে দিলাম আর তুই টাকার জন্য ঘ্যান ঘ্যান করছিস, যা তো। সুজিত বের হয়ে আসে, তাকে ট্যাক্সি ভাড়া দিতেও ভুলে গেছে কর্মকর্তারা। সুজিত মনে মনে চটে উঠেছে। আজ ওর টিম তার যোগ্যতার জন্য স্বীকৃতিও ঠিকমতো দেয়নি। সুজিতের রাগটা রয়েছে।

বাড়িতে তখন ভবেশবাবু বিজিত সাবিত্রী বসে শিখার বিয়ের ব্যাপারে আলোচনা করছে। টাকারও দরকার। বিজিত অবশ্য আজ বিকেলে মাঠে গিয়েছিল। সে-ও দেখেছে খেলার মাঠে সুজিত যেন অন্য কেউ, বাড়িতে যে ছেলেটা সামান্য চাওয়া- পাওয়ার হিসাবে মত্ত থাকে। নিজের সামান্য ব্যাপারে পান থেকে চুণ খসলে চিৎকার করে। সংসারের সব দায়িত্ব সে এড়িয়ে যায়।

কিন্তু খেলার মাঠে সেই একাগ্রচিত্তে। কঠিন পরিস্থিতির সামনে লড়াই করে গোলের দিকে এগিয়ে যায়। বিপক্ষের সমস্ত বাধা উপেক্ষা করে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। বিজিত খুশি হয়েছে আজ। ভবেশবাবু বলেন,

—ওতো নিজের জগৎ নিয়েই আছে। হয়তো কোনদিন ও তার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে। জীবনে তোর কি কোন লক্ষ্য নেই বিজিত তুই সামান্য চাকরি নিয়েই থাকবি, আর এই ছন্নছাড়া সংসারের জন্য নিজের ভবিষ্যতকেও শেষ করবি?

বিজিত বলে,

—সব মানুষের কিছু কর্তব্য থাকে বাবা—নিজের ভবিষ্যত-এর পাশাপাশি সেই কর্তব্যগুলোকেও পালন করতে হয়। আর চাওয়ার কথা বলছ জীবনে চাওয়ার তো শেষ নেই। আমার চাওয়াটাও তাই আলাদা।

—কি যে চাস তুই নিজেই জানিস না।

সাবিত্রী বলে,

—তোমাদের ওই সব হেঁয়ালি মার্কা কথা ঠিক বুঝিনা বাপু। এখন বিয়ের খরচ

খরচার হিসাবপত্র করো। তারপর কেনাকাটও করতে হবে। সুজিতকে ঢুকতে দেখে সাবিত্রী বলে।

—সুজিত, আজতো তোদের টিম নাকি ফাইন্যালে উঠেছে, তা টাকা পয়সা—

সুজিতের মেজাজটা এমনিতে ভালো ছিল না। টাকা পয়সাও পায়নি। সে বলে, —তোমাদের ওই এক কথা। জীবনে টাকা ছাড়া কি কিছুই বোঝনা। মাকে বেশ মেজাজ দেখিয়ে চলে গেল সুজিত ঘরের ভিতরে।

ভবেশবাবু বলেন,

—কেন ওকে টাকার কথা বলতে যাও? কোনদিন কিছু পেয়েছে ওর কাছে! পাবে না। তবে শুধু শুধু কথা শুনতে যাও কেন!

বিজিতই বলে,

—এসব নিয়ে তুমি ভেবনা মা। যেভাবে হোক একাজ হয়ে যাবে।

পরদিন সুজিত পাড়ার ক্লাবে গেছে। সেখানে তার খুব নাম-ডাক। বেশ কিছু ভক্তও আছে। তারাই গুরুকে চা পানে আপ্যায়িত করছে। হঠাৎ গাড়িটা এসে থামে। বিপুলবাবু এরমধ্যে খোজ-খবর নিয়ে সুজিতের পাত্তা ঠিক মতো বের করতে না পারলেও কিছুটা আভাস পেয়েই এখানে এসেছে, বিপুলবাবুর নামও জানে সুজিত, বেঙ্গল ক্লাবের কর্মকর্তাদের একজন। আজ সুজিত তাদেরই একজনকে এখানে তার সন্ধানে আসতে দেখে অবাক হয়।

বিপুলবাবুও সুজিতকে পেয়ে খুশি হয়। বলে,

—তোমার সঙ্গে জরুরি কথা ছিল সুজিত। বিপুলবাবু চারদিকে ভক্তদের জটলা দেখে বলে,

—এসব এখানে বলা যাবেনা, তুমি বরং আমার সঙ্গে চলো, কথাবার্তা বলে তোমাকে আবার এখানে পৌঁছে দেব। চলো গাড়িতে।

বিপুল জানে কিভাবে প্লেয়ারদের হাতে আনতে হয়। একদল ভাঙিয়ে অন্যদলে আনতে হয়। অনেক সময় সে কোনও বিশেষ প্লেয়ারকে কয়েকদিনের জন্য তুলে নিয়ে গিয়ে দূরের কোনও শহরের হোটেলে আটকে রেখেছে। সুজিতকে বিপুলবাবু সোজা নিয়ে এসেছে নরেশবাবুর বাড়িতে। বিপুলবাবুও দেখতে চায় সুজিতকে যে তাদের ক্লাবের পিছনে কারা আছে। তাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার পরিচয়ের কথাটাও জানতে চায়।

সুজিতও দেখেছে এই সুন্দর সাজানো বাড়িটাকে। শহরের মধ্যে এতখানি জায়গা নিয়ে বাড়িটা। ওদিকে বাগান, ঘাট বাঁধানো পুকুর এ বাড়ির মালিকের বৈভবের পরিচয়ও মেলে এর থেকে। ড্রইংরুমে বিদেশি নরম কার্পেট পাতা। ওদিকে সোফা দামী আসবাবপত্র। ঘরে বাতানুকূল মেশিনও চলছে ফলে এখানে বাতাসেও রয়েছে হিমেল স্পর্শ।

—বসো আমি খবর দিচ্ছি স্যারকে।

সুজিত সোফায় বসে চারিদিক নিরীক্ষণ করছে।

—কোথায় এলাম বিপুলবাবু।

—নরেশবাবুর নাম শুনেছ? বিরাট শিল্পপতি, দু-তিনটে কারখানার মালিক দেশ বিদেশে ওর নানা ব্যবসা।

সুজিত নরেশবাবুর ওসব ব্যবসায় খবর রাখে না। তবে ওর নাম শুনেছে। বেঙ্গল ক্লাবের সর্বময় কর্তা তিনি। খেলার জগতে তার বিরাট নাম ডাক। তাই বলে,

—বেঙ্গল ক্লাবের প্রেসিডেন্ট।

—হ্যাঁ।

—উনি কি দেখা করবেন আমার সঙ্গে?

নিবেদিতা ঘরে ঢোকে। বড়লোকের মেয়ে। রূপবতী আর চোখে মুখে তার ব্যক্তিত্বের আভাস ও রয়েছে। পিছনে বেয়ারা ছোট ট্রলিতে করে প্লেট টিপট এসব নিয়ে আসছে। সুজিত অবাক হয়। মেয়েটা নিজেই সংকুচিত সুজিতকে নমস্কার করে বলে।

—আপনার খেলা আমি দেখেছি। সেদিন বেঙ্গল কে যেভাবে দুটো গোল করলেন— দারুণ।

বিপুলকে দেখে নিবেদিতা বলে,

—কাকাবাবু আপনারা তো বলেন আমাদের ডিফেন্স নাকি ইন্ডিয়ার নাম্বার ওয়ান ডিফেন্স উনি কিন্তু একাই সেদিন আমাদের চাইনিজ ওয়ালে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছিলেন।

সুজিত শুনছে ওর কথা। ওই সুন্দরী মেয়েটার মুখে তার সম্বন্ধে এমন প্রশংসা শুনে সুজিতের বুক যেন গর্বে ফুলে ওঠে। বিপুল বলে —সুজিত এ নিবেদিতা। নরেশবাবুর মেয়ে আমাদের টিমের ব্লাইন্ড সার্পোটার কিন্তু এখন দেখছি তোমার সার্পোটার হে।

—কাকাবাবু ভালো খেললে তাকে সমর্থন নিশ্চয়ই করবো। নিন সুজিতবাবু ব্রেকফাস্ট করে নিন।

সুজিত দেখে ট্রেতে প্লেটে রয়েছে ডবলডিমের ওমলেট, সুগন্ধী মাখন জ্যাম, টোস্ট, কিছু ফলমূল আর সন্দেশ।

সুজিতও জানে খাবার জিনিষ সামনে এলে তার সদ্বব্যবহার করতে হয়। তাছাড়া সুন্দরী তরুণীর দেওয়া এইসব সুখাদ্য না খেলে ওকেই অপমান করা হবে। তাই খেতে থাকে। নরেশবাবু এসে পড়ে।

বিপুল বলে,

—এই সুজিত, যার কথা আপনাকে বলেছিলাম।

সুজিত বুঝেছে নরেশবাবুর মতো লোক তাকে নিজে থেকে ডেকেছে। হয়তো এবার তার ভাগ্য বদলাতে পারে। এমন একজন বিরাট লোকের সুনজরে তাকে থাকতেই হবে। সুজিত উঠে গিয়ে প্রণাম করে নরেশবাবুকে। নরেশবাবু ওর বিনয় দেখে খুশি হয়। আজকালকার ছেলেরা মানী লোকেদের প্রণাম করতেই ভুলে গেছে। নিবেদিতাও খুশি হয়।

—আমায় ডেকেছেন স্যার।

নরেশবাবু বলেন,

—হ্যা। তোমার খেলা দেখলাম, তোমার মধ্যে জেদ আছে তোমার খেলায় একটা এ্যাটাকিং স্পিরিট আছে তোমার জাজমেন্ট ও খুব পারফেক্ট। ওই সব ছোট দলে পড়ে আছে কেন?

—তেমন সুযোগ তো কেউ দেয়নি। নিজের চেষ্টাতেই ওই অবধি উঠতে হয়েছে।

—যদি আমি সেই সুযোগ দিই —আসবে আমার টিমে?

সুজিত হাতে চাঁদ পেয়েছে। বলে ওঠে—

—এতো আমার সৌভাগ্য স্যার। আমিও চাই আরও বড় প্লেয়ার হতে। আমার স্বপ্ন ইন্ডিয়া টিমে খেলা। আর শুধু ভারতে নয় আন্তর্জাতিক ম্যাচেও খেলা আমার স্বপ্ন। বেঙ্গল টিমে যদি চান্স পাই আমি প্রাণপণে জেতাবার চেষ্টাই করবো।

—স্যার যখন বলছেন, তখন তোমার চান্স হয়েই গেছে সুজিত, তবে আমাদের টিমে খেলতে গেলে আরও বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে ডেসপারেট হতে হবে।

—আমার দিক থেকে সেই চেষ্টার অভাব হবে না স্যার।

—গুড! আমি চাই কাজের লোক। ফুটবল যখন খেলবে তখন ওই ফুটবলই হবে ধ্যান জ্ঞান। আমিও চাই আমাদের টিমকে এশিয়ান কাপে খেলতে পাঠাতে। এশিয়ান কাপ আমাদের দেশে আনতেই হবে। তাই নতুন করে টিম করছি। তুমি এলে টিম আরও শক্তিশালী হবে। আই ওয়ান্ট এ গুড স্ট্রাইকার। আর সেই স্ট্রাইকার হবে তুমি।

সুজিত ভাবছে কথাটা। দিনভোর তাকে প্র্যাকটিস করতে হবে। জিমে যেতে হবে —তার জন্য খরচ আছে। ভালো খাবার চাই। তাদের সংসারে সেসব ঠিকঠাক মেলেনা, তবু তাকে লড়াই করতেই হবে। নরেশবাবু তার মনের ওই সব ভাবনাকে দূর করার জন্য বলেন।

—তোমায় দলে আনার জন্য দলও তোমার পিছনে কিছু খরচা করবে। ওসব বিপুলই করে দেবে।

ওসব যা করার তাতো করব হে। সামনে রোভার্স কাপ। ওটা এনে দাও। টিমের জন্য তুমি কিছু করো তোমার ভবিষ্যত-এর কথা তোমায় আর ভাবতে হবে না। স্যারই যা করার করে দেবেন। আর ইন্ডিয়া চ্যাম্পিয়ন হলে তো কথাই নেই।

নিবেদিতাও শুনছে ওদের কথা। সে-ও চায় সুজিত তাদের টিমে আসুক।

—সুজিত জানায়,

—তাহলে আমি ওই টিম থেকে ছাড়পত্র নিয়ে নিচ্ছি।

—আজই ওসব নিয়ে বিকেলে টেন্টে আসবে। আজ শুভদিন। বিকেলে ছটা নাগাদ আমাদের ক্লাবে সই করবে। স্যার —নিবেদিতা আর আমিও থাকবো। বোর্ডের অন্যান্য মেম্বাররাও থাকবেন।

—তাই হবে স্যার। সুজিতও কথা দেয়।

নরেশবাবু সাহেবী ধরনের মানুষ। তার সময় নিষ্ঠা দেখার মতো। তাই প্রতিটি কাজই তিনি যথাসময়ে করতে চান। বলেন,

—তাহলে ওই কথাই রইল। বিকেল ছটার মধ্যে চলে এসো—আমায় আবার ফ্যাক্টরিতে যেতে হবে। চলি—

নরেশবাবু বের হয়ে গেলেন। সুজিতও উঠে দাঁড়ায়। বিপুল বলে।

—সুজিত। ক্লাবে এসে একটু যদি ভালো খেলতে পারো। তোমার পাকা চাকরিও হয়ে যাবে হে। ভাগ্য বদলে যাবে। সুজিত যেন আজ নতুন করে স্বপ্ন দেখছে। যাবার আগে নিবেদিতাকে বলে,

—চলি। পরে দেখা হবে।

সুজিত এতদিন পর আজ সত্যিকার আশার আলো দেখেছে। সুজিতও স্বপ্ন দেখে নিবেদিতার ওই অভ্যর্থনা। তার কথাগুলো সুজিতের মনে খুশির সুর তোলে।

একজনের জীবনের লক্ষ্য—তার চাওয়া, পাওয়া অন্য কারোরও সাথে মেলে না। মানুষের নিজের মনের আশা স্বপ্ন মানুষ হিসাবে বদলায়। তাই সমাজের বুকে দেখা যায় লোভী স্বার্থপর মানুষ আর দেখা যায় নিঃস্বার্থ কিছু মানুষকে তারা যত না পায়—তার চেয়ে দিতে চায় আরও বেশি। আর কিছু মানুষ আছে যারা ওই দেনা-পাওনার হিসাবে ক্লান্ত। কারণ দুটো হিসাবের কোন প্রান্তই তারা মেলাতে না পেরে ওইসব হিসাবের কথা ছেড়েই দিয়েছেন।

বিজিত তবু থামেনি। কঠিন বাস্তব তাকে প্রকাশ্যে আঘাত করেছে। বিজিত এখন মন দিয়ে চাকরি করছে। বাবার পেনসন আর বিজিতের মাইনে দিয়ে কোনমতে সংসারটা চলছে। শিখাও নিজের খরচা চালাচ্ছিল কিন্তু সেদিন ওইসব ঘটনা ঘটে যাবার পর থেকে শিখাও যেন কেমন চুপসে গেছে। একটা অজানা ভয়ে হাসিখুশি মেয়েটাও যেন গুটিয়ে গেছে। বিজিত বলে,

—এত ঘাবড়ে গেলি কেন রে?

শিখা তবু যেন ভরসা পায়না। আজকাল পথে-ঘাটে মেয়েদের নিরাপত্তার অভাবটাও দেখছে সে। বেশ কিছু ছেলে যেন পথে ঘাটে ওৎ পেতে থাকে। মেয়েদের দেখলে তারা পশুর মতো ব্যবহার শুরু করে। ওই ছন্নছাড়া ছেলের দল এখন বেশ কিছু নেতা আর নানা রাজনৈতিক দলের পাণ্ডাদের পৃষ্ঠপোষকতায় কেমন যেন আতঙ্কময় সাহসী আর বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। ওদের এই অসভ্যতার প্রতিবাদ করতে গিয়ে ওদের হাতে নিগৃহীত হয়েছে বহু ভালো ছেলে। কিন্তু পুলিশ কোনও ক্ষেত্রেই সেই আসামীদের ধরতে পারেনি তারা তাই আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। শিখা বলে,

—ওই ছেলেগুলো সাংঘাতিক রে—

—তুই ভাবিস না শিখা, একটা পথ হবেই।

শিখাও বিজিতের কথায় খুশি হয়েছে। তার দাদা তাদের সংসারের উদ্ধারকর্তা এই কথাটা আজ শিখা সবচেয়ে বেশি উপলব্ধি করে। সব বিপদ থেকে এই মানুষগুলোকে সে বারবার উদ্ধার করেছে। বিজিত এবার টাকার জন্য ভাবছে। বিয়ের

খরচ তো নেই নেই করেও বেশ কিছু আছে, অবশ্য অনিমেষকে বললে সে সব ব্যবস্থা করে দেবে। কিন্তু বিজিত তা করতে পারবে না। তাই অফিসেই সে ম্যানেজারকে সে কথাটা বলে, অফিসের কাজকর্ম বিকেলের দিকে কম থাকে। তার আগে কাউন্টারের কাজ থাকে। লোকজন টাকা জমা দেয়। অনেকেই এখন তাদের পাওনা টাকা নিতে আসছে। কোম্পানি মাসে মাসে তাদের বেশ চড়া সুদই দেয়। তাই বহুলোকই প্রচুর টাকা জমা রেখে সুদের টাকা নিতে আসে। এসব ঝামেলা চুকতে বিকেল নামে। ওদিকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর-এর ঘরেও মিটিং থাকে। সেদিন ম্যানেজারবাবু মিটিং সেরে বের হবার পর দেখে বিজিত তার চেম্বারে বসে আছে। ম্যানেজারবাবু বিজিতকে চেনে। ছেলেটা খুবই কাজের। অন্যদের মতো কাজে ফাঁকি দিয়ে পার্টি ধরতে বের হয় না। এই অফিসের অনেক কর্মচারীই কাজে মন না দিয়ে এদিক-ওদিক ঘোরে, বেশ কিছু পার্টিকে নানা টোপ দেখিয়ে এখানে মোটা টাকা জমা করাতে বলে। কারণ পার্টিরা টাকা জমা দিলে ওরা তার থেকে একটা মোটা টাকা কমিশন পায়। তাই অনেকেই মাইনে ছাড়াও মোটা টাকা কমিশন পাবার জন্যই ব্যস্ত থাকে।

বিজিত ওসব করে না। সে একাই দু-তিনজনের কাজ করে।

ম্যানেজার বলে,

—কি ব্যাপার বিজিত?

বিজিত কথাটা কিভাবে বলবে তাই ভাবছিল। এবার কোনমতে বলে সে

—স্যার, হঠাৎ আমার বোনের বিয়ের ঠিক হয়ে গেল। জানেন তো সংসারের অবস্থা। বাবাও রিটায়ার করেছেন। ছোট ভাইও কাজকর্ম তেমন করে না,

—তোমার ভাই তো নামী ফুটবলার। আর আজকাল তো শুনেছি খেলাতেও বেশ ভালো টাকা পাওয়া যায়।

বিজিত বলে,

—সবে উঠছে। এখনও তেমন সুযোগ পায়নি। তাই একা আমাকে সব টানতে হয়। ওদিকে বিয়ের খরচ তাই অফিস থেকে যদি হাজার দশেক টাকা লোন পেতাম। মাসে মাসে সেটা শোধ করে দেব স্যার—যদি ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। খুব উপকার হয় স্যার। ম্যানেজার বাবু একটু ভাবেন। ও জানে এখানে ম্যানেজিং ডিরেক্টর, বোর্ডের অন্য ডিরেক্টরও তেমন সুবিধার লোক নয়। লাখ লাখ টাকার ব্যবস্থা করেছে তারা। কিন্তু ম্যানেজার তবু ওই কর্তা দুজনের উপর আদৌ ভরসা করতে পারে না। বিজিতের জন্য সে কিছু করতে পারলে খুশিই হবে। তাই বিজিতকে বলে সে।

—ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে বলে দেখি।

—আপনি বললেই হবে স্যার।

ম্যানেজার মনে মনে হাসে। অফিসের কোনও স্টাফই আদতে জানে না যে ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা অন্য ডিরেক্টরদের কথা ছাড়া কিছুই সে করতে পারে না। তবু ম্যানেজার বলে,

—তুমি লোনের দরখাস্তটা কাল দিয়ো। আমি এম ডি কে বলে দেখি যদি কিছু

করা যায়।

বিজিত বলে,

—তাই দেব স্যার। টাকার খুবই দরকার।

বিজিত চায় বাবার চিন্তা দূর করতে। বাবাও এনিয়ে খুব চিন্তিত। ওদিকে শিখার মুখেও বিজিত দেখছে এখন কিছুটা নিশ্চিন্ততা। বিজিতের কাছে এ যেন অনেক বড় পাওয়া। তার পাওয়ার হিসাবটা তাই আমাদের হিসাবের সাথে মেলে না। সুজিতের হিসাবটা আলাদা। সে আজই ওই-পুরোনো ক্লাব ছেড়ে চলে এসেছে ক্লিয়ারেন্স নিয়ে। ছোট ক্লাব। তাদের ক্লাবে বড় ধরনের কোন কামধেনু নেই যে তাকে যখন তখন দোহালেই দুধ পাওয়া যাবে। নিজেরা কষ্ট করে নিজেদের পকেট থেকে টাকা দিয়ে ক্লাব চালায়। আজকাল সকলেই চতুর আর সাবধানী হয়ে উঠেছে। সকলেই চায় নিজের ভবিষ্যত গুছিয়ে নিতে। তাই বড় ক্লাবে যেতে চায়। সুজিতও তাই ওই ক্লাবকে ছেড়ে চলে এসেছে। সুন্দর সাজানো ক্লাব। ওদিকে ড্রেসিংরুম, এদিকে অফিস ঘর। কিছু গাছগাছালিও রয়েছে। সেখানে টেবিল চেয়ার পাতা।

নিবেদিতাও বাবার সঙ্গে সন্ধ্যায় ক্লাবে আসে মাঝে মাঝে। এই খোলামেলা পরিবেশ আসতে তার ভালো লাগে। বিজিতের সঙ্গে ইদানীং নিবেদিতার কোন যোগাযোগ নেই। নিবেদিতা আশা করেছিল বিজিত তার বাবার সাহায্য নেবে। নিজের ভবিষ্যত-এর চিন্তাটাও করবে। নিবেদিতাও বিজিতকে সেই হিসাব করে ভালোবেসেছিল। বিজিত বাবার সুনজরে থাকবে। কারখানায় বড় পোস্টে চাকরি করবে। ওদের বাংলো গাড়ি থাকবে। তারা দুজনে নিজেদের মতো করে সংসার গড়বে। কিন্তু বিজিত ওসব পাবার জন্য লালায়িত ছিলনা। নিজের সে ভাবে না। নিবেদিতাও তাই তার উপর ভরসা করতে পারেনি। সে সরে এসেছে বিজিতের জীবন থেকে। তার মনে ছিল একটা শূন্যতা।

তাই সুজিতকে দেখে নিবেদিতার শূন্য মনে সাড়া জাগিয়ে ছিল, নিবেদিতাও সুজিতের জন্য যেন প্রতীক্ষা করছিল। নরেশবাবু বিপুলবাবু টেন্ট অফিসে জরুরি মিটিং নিয়ে ব্যস্ত, নিবেদিতা বসে আছে।

বাগানে। ওদিকে মাঠে ছড়ানো কিছু চেয়ারে বেশ কিছু নামি দামি প্লেয়ার অন্য কাজ কর্মে ব্যস্ত। সুজিত সেদিকে এগিয়ে আসে। সে-ও দেখে নামী দামী প্লেয়ারদের। সুজিতকে ওরা ঠিক চেনে না। এখানে সুজিতের চেনাজানাও তেমন নেই। হঠাৎ নিবেদিতাকে ওদিকে দেখে সুজিত যেন কিছুটা ভরসা পায়।

এগিয়ে আসে সুজিত ওর দিকে।

—নমস্কার।

—আপনি এসে গেছেন?

—আপনার বাবা, বিপুলবাবু ওনারা আসেন নি এখনও?

নিবেদিতা বলে,

—আপনি বসুন, ওরা অফিসে মিটিং করছেন। আমি খবর পাঠাচ্ছি।

একজন বেয়ারাকে দিয়ে নিবেদিতা খবরও পাঠায়। নিবেদিতা বলে —কি নেবেন? ঠান্ডা, না চা কফি কিছু।

সুজিত ওর সামনের টেবিলটাতেই বসে। ওর সামনে কোল্ডড্রিংক্স এসে গেছে। এতখানি পথ হেঁটে এসে সুজিতের তেষ্টাও পেয়েছে। সে স্ট্র দিয়ে কোল্ডড্রিংক্স খেতে থাকে। নিবেদিতা বলে।

—তাহলে আমাদের টিমে আসছেন?

সুজিত বলে,

—আপনি আর স্যার যখন এত করে বলছেন তখন আসতেই হচ্ছে পুরোনো টিম ছেড়ে।

ওদিকে বেয়ারা ওদের খবর দেয় ভিতরে নরেশবাবু ওদের ডাকছেন, ওরা উঠে পড়ে।

সুজিতফর্মে সই করে, এখন থেকে সে এই টিমের প্লেয়ার। বিপুল ওর হাতে একটা পঁচিশ হাজার টাকার চেক দিয়ে বলে,

—এটা তোমার সাইনিং মানি এই সিজনের জন্য এক লাখ টাকাই পাবে। যদি সত্যিই ভালো খেলা দেখাতে পারো। সামনের সিজনে তোমার রেট অনেক বেড়ে যাবে। আর ভবিষ্যতও বদলে যাবে।

সুজিত এর আগে অনেক টিমেই খেলেছে। সেসব টিমের কর্তাদের কাছে টাকা চেয়েও পায়নি। যদিও-বা দিয়েছে তা অতি সামান্য—দু-চারশো টাকা আগের টিমে পেতো এই ভাবে এত টাকা সে প্রথম হাতে পেল।

বিপুলবাবু বলেন,

সে অবশ্যই এছাড়া প্র্যাকটিসে আসার জন্য একটা স্কুটারও পাবে আর তেল খরচা, সুজিত-এর বহুদিনের স্বপ্ন একটা স্কুটারের, সে অবশ্যই একটা পুরোনো সাইকেল অবশ্য কিনেছে। গতবছর, কাশ্মিরী শালওয়ালারা শীতের সময় এখানে শাল বেচতে আসে—মালপত্র বইবার জন্য তারা অনেকে একটা সাইকেল কেনে দু-তিন মাস তাতে চড়ে শাল-টাল বিক্রি করে শহরের অলিতে-গলিতে। শীতের শেষে দেশে ফেরার আগে সেই সাইকেল বিক্রি করে দিয়ে যায় কিছু কম দামে। সুজিতের কোনও ভক্ত তেমন একখানা সাইকেলের সন্ধান পেয়ে বলেছিল সুজিতকে। সুজিত তার জমানো টাকা থেকে সেই সাইকেলটা কিনেছিল।

কিন্তু ওই সাইকেল ঠেঙিয়ে শ্যামবাজারের ওদিক থেকে মাঠে আসাও কম কষ্টের নয়। আর নামী প্লেয়ার নামছে এতটা পুরোনো সাইকেল থেকে এটাও বিশ্রী ঠেকতো সুজিতের। এবার তার নিজের একটা স্কুটার হবে। তেল খরচও পাবে। সুজিত খুশিই হয়।

বিপুলবাবু ওকে ক্লাবের অন্য একটা ঘরে এনেছে। সেখানে বেশ কিছু কিট ব্যাগ। দামী কোম্পানির বুট-সিনগার্ড মোজা, এ্যাঙ্কলেট এসব রয়েছে। সুজিতকে বলে বিপুল,

—নিজের পায়ের মাপের বুট—হোস—এ্যাঙ্কলেট-সিন গার্ড সব দেখে শুনে নাও।

সন্ধ্যা নামছে। ময়দানে গাছগাছালির মধ্যে আলো জ্বলে উঠেছে। ওদিকে বিপুলবাবু তখন নতুন স্কুটার আনিয়ে টেস্ট করাচ্ছে। সুজিতও রয়েছে—এরমধ্যে সুজিত তার বন্ধু-বান্ধবদের স্কুটারেও চালানোটা অভ্যাস করে ফেলেছে।

তার ভক্তদের অনেকের সোনা রুপো—কারো লোহা সিমেন্টের কারবার। তাদের কারো কারো গাড়ি, স্কুটার সবই আছে।

ক্লাবে সই করার পর সুজিত বাইরে বেরিয়ে এসেছে। নিবেদিতাকে দেখে এগিয়ে আসে।

—মিস রায় আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দিই।

—না-না। এতে ধন্যবাদের কি আছে সুজিতবাবু। আপনি যা কিছু পেয়েছেন তা নিজের যোগ্যতার জন্য। নিজের খেলার কথা ভাবুন। কাজে নিষ্ঠা থাকলে সাধারণ মানুষও অনেক কিছু পাবার যোগ্যতা অর্জন করে এখানেই এর শেষ নয়।

সুজিত দেখছে নিবেদিতা কে, সে-ও বুঝেছে তার এই পওয়ার মূলে নিবেদিতার ভূমিকাও কম নয়। বিপুলবাবু খবর দেয়। —যাও। তোমার স্কুটার রেডি-তাহলে কাল সকালে প্র্যাকটিসে আসছো তখন দেখা হবে।

সুজিত উঠে পড়ে। নিবেদিতাকে বলে,

—চলি।

ভবেশবাবুর পড়াশোনার অভ্যেসটা এখনও আছে। ওটা তার সেই ছাত্রজীবনের পুরোনো অভ্যাস। শিক্ষকতা করার সময়ও সেটা বজায় রেখেছিলেন। অন্য শিক্ষকদের দেখেছেন তিনি। তারা আর পড়াশোনা করে না, পড়াশোনার পাঠ চুকিয়ে স্কুলের ওই একই সিলেবাস টেপ রেকর্ডারের মতো আওড়ে যায়। বিজিত অর্কের ওখানে গেছে।

অনিমেষও আসবে ওখানে অর্কের বিয়ের ব্যাপারেও উদ্যোগ আয়োজন করতে হচ্ছে এদেরই। শিখা হঠাৎ বাড়ির ভিতর একটা নতুন স্কুটার নিয়ে সুজিতকে ঢুকতে দেখে চাইল। ভবেশবাবু একবার চোখ তুলে দেখে আবার পড়ায় মন দেন। শিখা বলে,

—কার স্কুটার রে? নতুন মনে হচ্ছে।

সুজিত বিজয়ীর মতো সগৌরবে বলে,

—এটা আমারই স্কুটার, এক ডিলার বন্ধুর দোকান থেকে ইনস্টলমেন্টে কিনলাম।

—তুই স্কুটার, কিনলি!

—প্রায় পাঁচ হাজার টাকা দিতে হল ধার দেনা করে। দেখি এবার তো দায়ে পড়ে গেলাম। দেনা তার ওপর স্কুটারের কিস্তী।

সাবিত্রী রান্না ছেড়ে বের হয়ে আসে। দেখছে ঝকঝকে নতুন স্কুটারখানা। সাবিত্রী ওই টাকার অঙ্ক শুনে চমকে ওঠে।

—তুই এতটাকা দিয়ে স্কুটার কিনলি এই সময়। শিখার বিয়ের টাকার জোগাড় করতে তোর বাবা-দাদা হন্যে হয়ে ঘুরছে। ওই টাকাটা পেলে কত কাজে লাগানো

যেতো। আর তুই কিনা সেই টাকা দিয়ে ওই স্কুটার কিনলি? সাইকেল তো ছিল। কি দরকার ছিল এত খরচ করার। তুই শুধু নিজের কথাই ভাববি? সংসারের জন্য কি এতটুকু ভাবনাও তোর নেই?

সুজিত চুপচাপই থাকে—আসল খবরটা ও জানলে এবার মা তাকে ছাড়বে না। তাই চুপচাপই থাকে। সাবিত্রী এবার ভবেশবাবুকেই বলে,

—তুমিও চুপচাপই থাকবে? এই ভাবে টাকা খরচ করবে কিছু বলবে না?

—আমি আর কি বলবো। বাপ হয়ে ওদের কোনও আহ্লাদ তো মেটাতে পারিনি। ওরা নিজেরা রোজগার করে যদি খরচা করে নিজেদের জন্য— আমি আর কি বলবো—

কন্যাদায় তো আমার। আমাকেই পার করতে হবে। বিজিত দেবার চেষ্টা করছে এটা ওর ব্যাপার। কেউ যদি সেটা না করে তাকে জোর করে করানোর অধিকার তো আমার নেই।

সাবিত্রী বলে,

—ওইসব নীতিবাক্য শুনে হাড় জ্বলে যায়। তোমরা যা খুশি করো, মনে হয় সংসার ছেড়ে যেদিকে দু-চোখ যায় চলে যাই।

—তা তুমি এ জীবনে পারবে না।

বিজিত ঘরে ঢোকে। সুজিতকে দেখে বলে।

—আবার কিছু বলেছিস নাকি মাকে। মা ফায়ার হয়ে উঠেছে।

তারপর নতুন স্কুটার দেখে খুশি হয় বিজিত।

—দারুণ স্কুটাররে।

শিখা বলে,

—সুজিত ওটা কিনেছে আজ।

—ভেরি গুড।—তোর চয়েস আছে রে সুজিত। এত নাম করেছিস খেলায় একটা স্কুটার তো দরকার।

—তাই বল দাদা মাকে। মা তো দেখে অবধি কথা বলছে।

—মা যা বলে বলতে দে—তুই যা করেছিস করে যা। দেখবি খেলার জগতে একদিন তুই হবি এ ফেমাস স্ট্রাইকার থামবিনা। ফুটবলের গোল শুধু নয় জীবনের খেলাতেও গোলে পৌঁছতে হবে।

সাবিত্রী ওদের কথা শুনে হতাশই হয়। ভেবেছিল বিজিতও সুজিতকে টাকা অপচয় করার জন্য কিছু বলবে। তা নয় ওকেই সমর্থন করছে। সাবিত্রী বলে,

—ঢের হয়েছে। রাততো এগারোটা, এবার দয়া করে খেয়ে-দেয়ে এই দাসী-বাদীকে উদ্ধার করো।

বিজিতেরও খেয়াল হয়, বলে সে,

—ভাই চল, হাতমুখ ধুয়ে খেতে বসবি চল।

আবার ওদের ভাঙা সংসারের শান্তিটা সহজভাবেই ফিরে আসে।

সুজিত এতদিন পর যেন সঠিক পথই পেয়েছে এই বেঙ্গল টিমে এসে। সে-ও এবার মনপ্রাণ দিয়ে প্র্যাকটিস করছে নিশ্চিন্তভাবে। সংসারের কোনও দায়ই সে নেয়নি। সে জানে তাকে নিজের ভবিষ্যত গড়ে তুলতে হবে। এরমধ্যে বেঙ্গল টিমের হয়ে তিন-চারটে খেলাতে সুজিত দরুণ খেলেছে। সে মাঠে থাকলে পুরোটিমটাই অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে। নরেশবাবুও খুশি, বিপুলকে তিনি বলেন,

—কে হে বিপুল—দ্যাখো কেমন প্লেয়ার এনেছি টিমে, সারা টিমের চেহারাটা বদলে দিয়েছে।

—তা সত্যি স্যার, আপনার জহুরির চোখ একনজরেই সেদিন সুজিতকে চিনেছিলেন।

নিবেদিতাও খুশি। সে এখন সুজিতের খেলা থাকলে মাঠে আসে। সুজিত এখন নরেশবাবুর বাড়িতে প্রায়ই যায়। ও এলে নরেশবাবুও খুশি হন।

ছেলেটার সম্বন্ধে নরেশবাবুও সিরিয়াসলি ভাবছেন। নিবেদিতা যেন সুজিতের পথ চেয়ে থাকে। এবার সুজিতের দেওয়া গোলে ক্লাব লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। সুজিতের এখন টিমের মধ্যে একটা পাকা আসন তৈরি হয়েছে। নিবেদিতা ওকে বলে।

—সুজিত বাবাকে খুশি রাখতে পারলে তোমার ভালোই হবে।

সুজিত এখন নিবেদিতার অনেক কাছে এসে পড়েছে। ওর আকর্ষণেই সুজিত এ বাড়িতে আসে। নিবেদিতা মাঠে থাকলে সুজিতও সেদিন নতুন উদ্যমে খেলে। প্রতিপক্ষকে বিপর্যস্ত করে তোলে। অনিমেষও দেখেছে সুজিতকে এখানে আসতে। অনিমেষের অবশ্য খেলার ব্যাপারে কোনও আগ্রহ নেই।

সে এখন বাবার ব্যাবসা বাণিজ্য দেখছে আর দেখছে তাদের তৈরি মাল বিদেশেও যাচ্ছে প্রচুর পরিমাণে। সেই মালের গুণমান অনিমেষ আরও উন্নত করেছে। আর বেশি মাত্রায় প্রডাকসন করার জন্য খরচও কম পড়ছে সেই কম খরচে তৈরি মাল বিদেশে ভালো দামেই বিক্রি করেছে বেশ কিছু ফার্ম। এবার অনিমেষও ভাবছে সে বিদেশেই তার নিজের ফার্ম করে নিজেরাই যদি বিদেশে মার্কেটিং করে অনেক বেশি মুনাফা করতে পারবে আব সেখানে ভালো ব্যাবসা হলে—ওখানেও একটা কারখানাও করতে পারবে। এরমধ্যে দু-একবার অনিমেষ গুদামও ঘুরে এসেছে। আর তারপর এসব কথা ভেবেছে, নরেশবাবুও ছেলের কথায় বলেন,

—তা যদি করতে পারিস দারুণ হবে।

—আমিও ওই কথাই ভাবছি বাবা। তাই আমাকে কিছুদিন স্টেটস-এ গিয়ে থাকতে হবে। এ সমস্ত অর্গানাইজ করার জন্য।

—তা যা। বিদেশে নিজেদের অফিস কারখানা হলে এদেশেও আমাদের মালের চাহিদা বাড়বে।

নরেশবাবুর বসার ঘরে সুজিতকে দেখেছে অনিমেষ। তবে অনিমেষ সুজিত সম্বন্ধে খুব একটা আশাবাদী নয়। বিজিতের বাড়িতে সে প্রায়ই যায়। এখন অর্কের বিয়ের ব্যাপারেও যেতে হচ্ছে। অনিমেষ জানে বিজিতদের সংসারের অবস্থা। সুজিত যে এখন টিম থেকে ভালো টাকা আরও অনেক কিছু পায় তা জানে অনিমেষ। আর

এও জানে সুজিত বাড়িতে কিছুই দেয়না। এমনকি এতটাকা পায় তা ও বলেনি। বিজিতই যা রোজগার করে সবই দেয় সংসারে।

অনিমেষ অবাক নিবেদিতার ব্যবহারে, এতদিন ধরে অনিমেষ জানতো যে নিবেদিতা বিজিতের দিকেই ঝুঁকেছে। অবশ্য অনিমেষ খুশি হয়েছিল। বিজিত তার বাবার টাকার কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিতে পারেনি। সুজিত অনায়াসে সেটা পেরেছে তাই ওই মেরদণ্ডীবিহীন স্বার্থপর ছেলেটাকেই আঁকড়ে নিবেদিতা বাঁচতে চাইছে। অনিমেষ দেখে মাত্র, বড় বাড়ির বহু বিচিত্র ব্যাপারগুলোকে অনিমেষ ঠিক সহ্য করতে পারে না। তাই চুপ করেই থাকে।

সুজিত-এর লোভী মন এখন ধীরে ধীরে অনেক কিছু পাবার স্বপ্নই দেখে। সুজিত বলে নরেশবাবুকে খুশি রাখতে পারলে তার কারখানায় চাকরিও পাবে। আর নিবেদিতাকে খুশি রাখতেই হবে। নিবেদিতা তার জীবনে এলে সুজিতের ভাগ্য বদলে যাবে। তাই সুজিত ও সাবধানে পা ফেলে ধনীর ওই খেয়ালী মেয়েটার দিকে এগিয়ে যেতে চায়। বিজিতের কথা মনে পড়ে সুজিতের। খেলার মাঠে গোল করাটাই তার একমাত্র লক্ষ্য নয়। জীবনের খেলাতেও সেই গোলের লক্ষ্যে তাকে পৌঁছতেই হবে।

শিখার বিয়ের দিন এগিয়ে আসছে। ভবেশবাবুও তার শেষ সঞ্চয় থেকে কিছু টাকা তুলেছেন। বিজিত অবশ্য এখনও লোনের টাকা পায়নি। হয়তো এর মধ্যে পেয়েও যাবে। তাই ভবেশবাবু বলেন,

—আমিই ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলেছি—তোর লোনের টাকা পেলে তখন ব্যাঙ্কে জমা করে দোব। এখন কাজ তো চলুক।

—দেখি অফিসে আজও বলবো, তোমার শেষ সঞ্চয়টুকুও তুলে নেবে!

—তোর টাকা তো আসবে। শুভ কাজ হয়ে যাক এনিয়ে তুই ভাবিস না। বিজিতকে তবু ভাবনায় পড়তে হয়। সাবিত্রী বলে,

—সুজিতকে বল, শুনেছ ও ভালো টাকা পাচ্ছে।

—ও তো সংসারের অবস্থা দেখছে —বিজিত কি করছে তা দেখছে, এত দেখেও যদি ওর কর্তব্যবোধ না জাগে, তাকে বলেও আর কিছু হবে না। যে জেগে ঘুমোয় তাকে জাগানো যায় না।

শিখা আড়ালে বিজিতকে বলে,

—তোদের সংসারে আমি যেন বোঝা হয়ে উঠেছি দাদা।

—কি বলছিস শিখা, দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে।

ব্রজবাবুর ওই ফাইনান্স কোম্পানিতে এখন অখিলও এসে যোগ দিয়েছে। ওরা দুজনে মিলে এতদিন ধরে কোম্পানিকে গড়ে তুলেছে। বহু জায়গায় বহুব্রাঞ্চও করেছে জেলায় জেলায়। এখন দেশের লোকের হাতে বেশ কিছু টাকাও আসছে। তারা সেই টাকা খাটিয়ে বেশি সুদ পেতে চায়। আর অখিল ব্রজবাবুর কোম্পানি তাদের সতের পার্সেন্ট সুদও দেয়, ফলে কলকাতা-মফঃস্বল শহরে বহু-ধনী-মধ্যবিত্ত মানুষ তাদের জমানো পুঁজির হাজার হাজার টাকা, লাখ-লাখ টাকাও জমা দেয়।

অখিল-ব্রজ কোম্পানি তাদের দু-দশজনকে সেই চড়া হারে সুদও দিয়েছে দু-তিন মাস। ওরা পার্টিদের বিশ্বাস অর্জন করার জন্য জমা টাকার প্রাপ্য সুদ পোস্ট ডেটেড চেক দিয়ে আগাম দিয়ে দিয়েছে। পরে আরও অনেক লোক লাখলাখ টাকা জমা দিয়েছে ওদের কাছে।

এবার অখিল-ব্রজ বেশ কয়েকশ কোটি টাকা হাতে পেয়ে অন্য পথ ধরেছে, ওরা জানে কি ভাবে এসব টাকা আত্মসাৎ করতে হবে। সেইসব কর্মই এবার শুরু করেছে তারা। অফিসের সাধারণ কর্মীরা এসবের কিছুই জানেনা। ম্যানেজার ও টের পায়না মালিকদের গোপন কারবার।

সেদিন বিজিত অফিসে গেছে অফিসের কাজ কর্ম চলছে। বিজিত বলে, ম্যানেজার বাবুকে।

—স্যার আমার লোনের দরখাস্তটা যদি সাহেবদের দিয়ে মঞ্জুর করিয়ে দেন,

—আমি দেখছি।

চেম্বারে তখন অখিল রয়েছে। ব্রজবাবু কোনও এক বড় পার্টির ওখানে গেছে। ম্যানেজার অখিলকে দরখাস্তটা দিয়ে বলে,

—বিজিতের দরখাস্তটা স্যার, ও দশহাজার টাকা চাইছে। অবশ্য কিস্তিতে দিয়ে দেবে, মানে হাজার টাকা করে কাটাবে।

অখিল অবশ্য অফিসের স্টাফদের বিশেষ চেনে না। সে এই অফিসে আসে মাত্র, তবু ওই নামটা শুনে চমকে ওঠে অখিল।

—স্যার ওর বোনের বিয়ে সামনের সপ্তাহে। ওর টাকার দরকার।

—বোনের বিয়ে!

অখিলের মনে পড়ে সে রাতের কথা। ওর বোনকেই অখিল তার লোকজন দিয়ে তুলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পারেনি, বিজিতই এসে পড়ে তার লোকেদের বেদম প্রহার দিয়ে তাড়িয়ে ছিল। অখিল তখন বিপদ বুঝে কেটে পড়েছিল।

তারপর অখিল ওই মেয়েটাকে হাতে পাবার চেষ্টা করেছিল। পারেনি। এবার বিয়ে দিয়ে সরিয়ে দিতে চায় বোনকে। এ যেন অখিলেরই পরাজয়।

অখিল বলে,

—এটা ব্রজবাবুর ব্যাপার। ওকেই বলবেন, আমার কিছু করার নেই।

অখিল তার ঘাড় থেকে নামিয়ে দেয় কেসটাকে, অবশ্য অখিলও জানে তারা টাকা আর কাউকে দেবে না। কারণ তারা এবার ওই কোটি কোটি টাকা গায়ের করে সরে পড়বে, আর সেখানে ব্যাবসা গুটিয়ে নেবে।

দিন বসে নেই, বিয়ের দিন এসে গেছে। বিজিতকে ম্যানেজার বাবু আশ্বাস দিয়েছেন, ব্রজবাবু এলেই তিনি নিজে ব্যাপারটা স্যারকে বলে স্যাংশন করিয়ে রাখবেন, বরং কাল দুটো নাগাদ যেতেও বলে। ম্যানেজার এর কথায় বিজিত বলে,

—ঠিক আছে স্যার। তাই আসবো।

বিয়ের আয়োজন চলছে বাড়িতে। সাবিত্রীও ব্যস্ত। ভবেশবাবুও বিয়ের কাজে ব্যস্ত।

সুজিত এরমধ্যে ওর বন্ধুবান্ধবদেরও নিমন্ত্রণ সেরে ফেলেছে। অনিমেষ ডেকরেটরের লোকেদের এনে বাড়ির সামনে জায়গাটাতে প্যান্ডেল বাঁধার কাজ শেষ করছে। ওদিকে ক্যাটারের লোকজনও রান্না শুরু করেছে, বিজিত বলে,

—বাবা আমি একবার অফিস থেকে ঘুরে আসি।

—এত কাজ, আবার অফিসে যাবি?

বিজিতকে টাকাটা পেতেই হবে তাই সে বলে।

—জরুরি কাজ আছে। যেতে হবে বাবা। চারটের মধ্যেই ফিরবো, সুজিত তুই আর বের হস্‌না। এদিকের কাজকর্ম দেখা-শোনা কর। আমি আসছি।

—দেরী করিসনা বাবা, কি যে কাজ তোদের, আজও যেতে হবে অফিসে।

বিজিত অনেক আশা নিয়েই অফিসে এসেছে, কিন্তু এসে দেখে বাইরে অফিসের সামনে তখন শ'খানেক লোকজন, দু-দশজন মহিলাও এসেছে। তাদের অনেকের হাতে সেইসব চেক ফেরত এসেছে ক্যাশ হয়নি। ওরা কয়েক মাসের সুদও পায়নি—আগের পলিসি ম্যাচিওর করেছে সেসব পলিসির টাকাও পায়নি। সেসব লোক চিৎকার করছে।

—জোচ্চোর কোম্পানিতে আর টাকা রাখব না। ফেরত দাও আমাদের টাকা।

—কোথায় গেল সেই শালা ম্যানেজিং ডিরেক্টর, বের হয়ে আয়।

বাইরে জনতার ভিড় বাড়ছে। আরও অনেক পার্টি ও এতদিন ধরে ঘুরে টাকা না পেয়ে এবার অধৈর্য্য হয়ে এসে অফিস ঘেরাও করেছে। বিজিতও এবার বুঝেছে, যে কোম্পানিতে সে এতদিন কাজ করেছে—তাদের আসল ব্যাপারটা শত শত লোকের এতটাকা জমা নিয়েছে। তখন দেখেছে বিজিত বস্তা বস্তা টাকা ওরা সংগ্রহ করেছে।

আরও মনে পড়ে, এবার ওই ম্যানেজিং ডিরেক্টর ব্রজবাবু সেই সব বস্তাবন্দী লাখলাখ টাকার মাত্র কিছুটা ব্যাঙ্কে রেখে—বাকি টাকা সরিয়ে ফেলতো, তখন ঠিক বোঝেনি বিজিত। এখন আজ এইসব পার্টিদের মুখে তাদের লাখ লাখ টাকার বঞ্চনার কাহিনি শুনে বিজিতের মত একজন সৎ আদর্শবান যুবকও চটে ওঠে। আজ তারও লজ্জা হয় ভাবতে সে-ও না জেনে এই কোম্পানির লোক ঠকানোর কাজে সামিল হয়ে গেছে। বিজিত ওদিকের গেট দিয়ে ভিতরে চলে যায়। অবশ্য ওই গেটেও তখন কোম্পানির দারোয়ানরাও ওইসব পার্টিদের ভিতরে যেতে দেয়নি। তাদের পথ আগলেছে। বিজিত এখানে স্টাফ, দারোয়ানরা তাকে চেনে, জানে, তাই তাকে ঢুকতে বাধা দেয়নি। বিজিত অফিসে এসে ঢোকে।

অফিসের কর্মচারীরাও তখন কেমন ঘাবড়ে গেছে। ওদিকে ম্যানেজারও ব্যস্ত হয়ে এদিক ওদিক ঘোরা ঘুরি করে, বলে।

—আপনারা যে যার ঘরে কাজে বসুন। ওসব গোলমাল কিছুই নয় আমরা একে একে ওদের ডেকে ওদের কেস সেটেল করে দিচ্ছি।

কর্মচারীও যে যার সিটে বসতে যাবে, ওদিকে বাইরে তখন আরও বঞ্চিত পার্টিরা এসে জমায়েত হচ্ছে। কিছু উৎসাহী পাবলিকও জুটে গেছে। এই সুযোগে জুটেছে

বেশ কিছু মস্তান পার্টি-ও। তারা চায় এই সুযোগে কিছু লুঠপাট চালাতে পারবে। তারাই পজিসন নিয়েছে, কে এর মধ্যে সজোরে একটা আধলা ইটও মেরেছে দোতলার রঙীন কাঁচে। আর সেটা কাঁচে লাগতে সশব্দে ঝনঝন করে জানলার কাঁচটা ভেঙে পড়ে।

সারা হলে উত্তেজনা, বাইরে জনতাও তখন তারও মারমুখী হয়ে ইট পাটকেল ছুঁড়ছে, ভিতরে অসহায় কর্মচারীর দলও বন্দী হয়ে আছে। ম্যানেজার ডিরেক্টর ব্রজবাবু ভাবতে পারেনি যে এত শীগগির তাদের সব কুকীর্তির কথা পার্টিরা জেনে যাবে। ব্রজবাবু আর অখিল মিলেই সব টাকা সরিয়ে ফেলেছে। এদিকে লাখ লাখ টাকার চেক কেটেছে ব্যাঙ্কে টাকা নেই। পার্টিদের সঙ্গেও দেখা করেনি ব্রজবাবু।

ওদের এতদিনের সব কুকীর্তির কথা এমনভাবে ফাঁস হয়ে যাবে হঠাৎ এটা ভাবেনি ব্রজ—অখিল এসব খবর বের হয়ে পড়বে জানতো আগেই। সে তাই বের হয়নি। ব্রজবাবু সঠিক খবর জানতো না। তাই অফিসে এসেছে। আর এখানের ওদের টাকা মারার আসল হিসাবের খাতাপত্রও সরাতে পারেনি।

ব্রজও বিপদে পড়েছে, তবু জানে সে কি করে এসব সামলাতে হয়। স্থানীয় থানাকে তারা মাসিক ভালো প্রণামীই দেয়। তাই ব্রজ থানাতেই ফোন করে।

—কিছু গুণ্ডা মস্তানের দল টাকা লুঠ করার জন্য আমাদের অফিস এ্যাটাক করেছে বড়বাবু। এখুনি ফোর্স নিয়ে এসে ওদের হাটিয়ে দেন। নাহলে কোম্পানির লাখ লাখ টাকা ওরা লুটে নেবে।

—ভয় নেই ব্রজবাবু। আমি এখুনি ফোর্স নিয়ে যাচ্ছি।

ব্রজ ফোন রাখতে তার চেম্বারের সুইংডোর খুলে ঢুকছে বিজিত। সেও বেশ উত্তেজিত। ব্রজবাবু চেনে বিজিতকে। জানে তার লোনের দরখাস্তটার কথা। এসময় স্টাফদের মনেও ক্ষোভ আছে, তাদেরও হাতে আনতে হবে। তাই ব্রজবাবু বলে,

—এসো এসো বিজিত। তোমার লোনটা আমি স্যাংশন করে ফেলেছি। এই নাও টাকা।

একটা দশ হাজার টাকার বাণ্ডিল বের করে দেয়। বাইরে তখন কয়েকশ বঞ্চিত মানুষের গর্জন ওঠে।

—আমাদের লাখ লাখ টাকা ঠকাবে? মুখের গ্রাস কেড়ে নেব। আমাদের ঘামঝরানো টাকা ফেরত চাই।.........

বিজিতের কানে এসে পৌঁছায় সমবেত জনতার ওই চিৎকার, ওর মনে হয় ব্রজবাবু বিজিতের মুখ বন্ধ করতে চায় টাকা দিয়ে।

ব্রজবাবু বলে,

—নাও টাকা। আরে অন্য কোম্পানি আমাদের কোম্পানির বদনাম করার জন্য এসব গোলমাল করছে। নাও টাকা।

বিজিত বলে,

—ওই হাজার মানুষকে ঠকিয়ে আমরা লাখ লাখ টাকা মারতে পারি। আপনাদের

বিবেকে এতটুকু বাধে না। কিন্তু ওটাকা নিতে আমার বাধবে ব্রজবাবু। আমাকে ভুল বোঝাতে পারবেন না।

—মানে। কি বলছ এসব কথা, আমাদের কোম্পানির আর্থিক বুনিয়াদ সলিড জানো।

—তবে হাজার হাজার মানুষের পাওনা টাকা দেননি। কেন ওদের এত চেক বাউন্স করেছে। কোথায় গেল সেইসব লাখ লাখ টাকা? জবাব দিন—

বাইরে তখন গর্জন আরো বাড়ছে। জনতা দুপুর থেকে সন্ধ্যা অবধি অপেক্ষা করেও ব্যাটাদের কাউকে পায়নি—অফিসেও ঢুকতে দেয়নি। ওরাও এবার মরীয়া হয়ে আক্রমণ চালাচ্ছে—এদিকে পুলিশের সাইরেন বাজিয়ে পুলিশকে আসতে দেখে ব্রজবাবুও এবার সাহস ফিরে পায়। বিজিতের কথায় গর্জে ওঠে ব্রজবাবু। ওর ডাকে দু-তিনজন সেন্ট্রিও ঢোকে। ব্রজবাবু বলে বিজিতকে,

—আমার কৈফিয়ত নেবে তুমি।

—এতবড় অন্যায় জোচ্চুরি করে পার পেয়ে যাবেন? ওদের টাকা ফেরত দিতেই হবে।

ব্রজবাবু বলে সেন্ট্রিদের,

—ওটাকে মেরে পুলিসের হাতে তুলে দে—বলবি ক্যাস লুঠ করতে এসেছিল।

সেন্ট্রি কজন বিজিতের দিকে এগিয়ে এসে ওকে ধরতে যায়। একজন বিজিতকে একটা ঘুসিই মারতে আসে।

বিজিতও তৈরি ছিল। লোকটার হাত ধরে এবার একটান দিয়ে ওকে ঘুরপাক খাইয়ে সজোরে ব্রজের দিকেই তাকে ঠেলে দিতে লোকটা সবেগে ব্রজের ঘাড়ের উপর উল্টে পড়েছে। টেবিলের কোনায় লেগে কপাল ফেটে রক্ত ঝরেছে। বিজিত আর দুজন হতচকিত সেন্ট্রিকে দুটো রদ্দা মারতে তারা ছিটকে গিয়ে পড়ে কাচের পার্টিশনওয়ালে।

বিজিত টেবিলে রাখা ব্রজের সেই দুনম্বরী হিসাবের খাতাদুটো নিয়ে ওদিকে রাখা একটা খালি ব্যাগে পুরে বলে,

—ব্রজবাবু আপনার গোপন হিসাবের খাতাপত্র যথাস্থানেই পৌঁছে দেব। এবার তারাই বের করবে কতটাকা মেরেছেন আপনারা। পাবলিকের সর্বনাশ করার ফল হাতে-নাতে পাবেন এবার।

বিজিত খাতা দুটো নিয়ে বেরিয়ে আসে। ব্রজবাবু ডাকে কিন্তু বিজিত কোন সাড়া দেয় না। ওদের সেইসব গোপন হিসাবের খাতা নিয়ে বেরিয়ে যায় পিছনের দরজা দিয়ে। তখন সন্ধ্যা নেমেছে। বাইরে জনতা তখনও হতাশ হয়ে আর্তনাদ করছে। তাদের যথাসর্বস্ব লুঠ হয়েছে।

ব্রজবাবুও এবার সমূহ বিপদের আশঙ্কা করে। ছেলেটাকে থামাতেই হবে। ওসব কাগজপত্র পুলিশ কর্তাদের হতে পড়লে বিপদ হবে। ব্রজবাবু তাই এবার অখিলকেই ফোন করে। অখিল তার ডেরাতেই ছিল। সে-ও খবরটা জেনে এবার চমকে ওঠে।

ওই বিজিত এবার তাদের গোপন কুকীর্তির সব ইতিহাস নিয়ে বের হয়েছে। ব্রজবাবু বলে,

—ওসব কাগজপত্র ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে। ওকেও ছাড়া ঠিক হবে না। ও ঠিক বাড়িতে যাবে। পথে ওকে আটকাও অখিল—

—ওই বিজিতটা পদে পদে আমার শত্রুতাই করেছে। বোনটাকে আমার হাত থেকে সরিয়ে দিল। আজ আমাদের খাতপত্র নিয়ে গেছে। তুবি ভেব না ব্রজবাবু। ওসব নিয়ে ওকে আর ঘরে ফিরতে হবে না। ওর ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি।

তখন সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্রি নেমেছে। বিজিতের মনে পড়ে এবার শিখার বিয়ের অনুষ্ঠান চলেছে বাড়িতে। এতক্ষণ অফিসে এইসব গোলমাল সে নিজের কথা ভুলেই গেছল। এবার বুঝেছে আগে তাকে বাড়ি যেতে হবে। বাবা আর সুজিত ওদিকে কি করছে কে জানে? অনিমেষ, অর্করা এতক্ষণে এসে গেছে হয়তো। বাড়িতে ফেরেনি সে। তাই বিজিতের মনে হয় বাড়ি ফিরে আজকের অনুষ্ঠান পর্ব চুকিয়ে কাল সকালেই লাল বাজারে গিয়ে পুলিশের কর্তাদের হাতে ওইসব খাতাপত্র তুলে দিয়ে নালিশ জানিয়ে আসবে।

এখন বাড়ি ফেরার দরকার। বিজিত তাই বাড়ির দিকে চলেছে। শহরের বাইরে নতুন গড়ে ওঠা সল্টলেকের দিকে ব্রজবাবুরা তাদের এই জোচ্চুরির অফিস তৈরি করেছিল। এদিকে বাস, গাড়িও কম। সকলেই প্রায় নিজের গাড়িতে যাতায়াত করে। পথঘাটও জনশূন্য। লোকজনও কম। বিজিত একাই হেঁটে চলেছে। গাছগাছালি কিছু রয়েছে। পথঘাট নির্জন। হঠাৎ ওদিকের ঝোপঝাড় ভেদ করে একটা গাড়ি এসে দাঁড়ায়। গাড়িটা তাকে একটু দূর থেকেই অনুসরণ করে আসছিল। এবার বিজিতও হঠাৎ গাড়িটাকে তার কাছে থামতে দেখে একটু সতর্ক হয়।

অখিল ব্রজের ফোন পেয়েই তার লোকজনদের নিয়ে বের হয়ে পড়ে। তারই এক চ্যালা মটরবাইক নিয়ে অফিসের কাছেই এগিয়ে গিয়ে দেখে বিজিতকে এদিকে আসতে। সে-ও তার মোবাইল ফোন থেকে খবর পায়।

—ব্যাটা ওই পথেই গেছে বাস ধরতে।

অখিলও তৈরি ছিল। তারাও সঠিক সময় এসে পড়ে। বিজিত দেখছে অখিলের ব্যক্তিদের। ওদের মুখ সে চেনে—যে রাতে শিখাকে ওরা আক্রমণ করেছিল তখনই দেখেছিল ওদের। বিজিতও এবার তৈরি হয়েছে। তার দেহমনে যেন কি এক অদৃশ্য শক্তি ভর করে আছে।

পথের আলোও এখানে কম। ছেলেগুলো বিজিতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের প্রধান লক্ষ্য ওই খাতাগুলো। এইসব প্রমাণ তাদের ছিনিয়ে নিতে হবে আর তারপর বিজিতকে তারা আজ উচিত শিক্ষাই দেবে। তাদের দলপতি অখিলও গাড়িতেই রয়েছে। চ্যালারাই একাজ করতে পারবে। অখিলের হাতে রিভলবার। ওতে ঝামেলা নাই—ট্রিগার টিপলেই খতম।

বিজিত একাই লড়ছে ওদের সঙ্গে। অখিলের চ্যালারা ভাবতে পারেনি যে বিজিত

এইভাবে তাদেরই পাল্টা মার দেবে। ওরা প্রাণপণে চেষ্টা চালাচ্ছে খাতাগুলো ছিনিয়ে নেবার জন্য। কিন্তু বিজিতও একাই ওদের দু-তিনজনকে এরমধ্যে ধরাশায়ী করেছে।

হঠাৎ এসে পড়ে পুলিশের একটা পেট্রল ভ্যান। ওরা এই এলাকায় মাঝে মাঝে টহল দেয়। ওদের হেডলাইটের আলোয় দেখছে ওরা পথের মধ্যে একজনকে ঘিরে তিন-চারজন কি একটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করছে। থানার বড়বাবু নিজেই রয়েছেন ওই ভ্যানে—তাই তার নির্দেশেই গাড়িটা এসে থামে। আর পুলিশ ওদের ঘিরে ফেলে। বিজিতও পুলিশকে দেখে ভরসা পায়। বড়বাবুকে বলে,

—দেখুন স্যার। আমার হাত থেকে আমার জিনিসপত্র সব কেড়ে নিয়ে আমাকে মারতে এসেছিল ওরা।

অখিল এতক্ষণ গাড়ি নিয়ে অন্তরালে ছিল। এবার স্বয়ং তাদের পেটোয়া বড়বাবুকে এখানে দেখে অখিলই এসে হাজির হয়। বড়বাবু অখিলের মতো নামী-দামী লোককে চেনে। মাসকাবারে ব্যবস্থাও আছে ওদের সঙ্গে। বড়বাবু বলে,

—আরে অখিলবাবু! আপনি?

—ওই ছেলেটা আমাদের অফিসের বহু নামী-দামী রেকর্ড পত্র নিয়ে পালাচ্ছে বড়বাবু। আমার লোকজন ওসব ফিরিয়ে দিতে বলেছে ওকে। দেখুন তারজন্য কেমন মেরেছে ওদের। ওই ছেলেটাই চোর—আমাদের অফিসের ক্যাস লুঠ করে। খাতাপত্র নিয়ে পালাচ্ছে। ওকে এ্যারেস্ট করুন স্যার।

—এসব সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা স্যার। আমি ওদের ক্যাশ কেন লুঠ করবো স্যার! ওরাই পাবলিকের কোটি কোটি টাকা লুঠ করেছে। আর তার প্রমাণও আছে আমার কাছে। আমি এসব চুরি করিনি স্যার। পুলিশের হাতে এসমস্ত তুলে দেবার জন্যই এসব নিয়ে যাচ্ছি।

অখিল আর বড়বাবুর মধ্যে চোখের ইশারা হয়ে যায়। বড়বাবুও জানে অখিল, ব্রজবাবুদের অফিসের আজকের গোলমালের কথা। বড়বাবু নিজে ফোর্স নিয়ে গিয়ে বীর বিক্রমে সেই বঞ্চিত মানুষদের লাঠি চার্জ করে হটিয়ে দিয়ে ব্রজবাবুদের মুক্ত করেছে। আর এবার আর একজনকে ব্রজবাবুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে দেখে বড়বাবুও চটে ওঠে। অখিল বলে, —ওসব রেকর্ড চুরি করে পালাচ্ছিল। ও ক্যাশ লুঠও করেছে। ও চোর—! বিজিত তবু কঠিন ভাষায় প্রতিবাদ করে।

—কে চোর সেটা এবার আদালতেই প্রমাণ হবে।

বড়বাবু বলে,

—ঠিক আছে। চলুন থানায়। সেখানে রিপোর্ট করে ওসব কাগজপত্র জমা দেবেন। এর নিরপেক্ষ তদন্ত হবে আর বিচারও হবে। এখন চলুন থানায়।

বিজিতকে নিয়ে পুলিশ ভ্যানে ওঠে। বিজিত ন্যায়বিচারের আশায় থানায় চলেছে। অখিলও নিজের গাড়ি নিয়ে পিছনে পিছনে আসে। এরমধ্যে মোবাইল ফোনে ব্রজকে খবরটা দিয়ে বলে,

—তুমিও থানায় এসো। ওই বিজিতটা খুব বেড়েছে। ওটাকে এবার এমন শিক্ষা

দিতে হবে যে জীবনে আর আমাদের পিছনে লাগতে সাহস করবে না।

থানায় এসেছে বিজিত। পুলিশ অফিসার বলে,

—আসুন। পরে আপনার স্টেটমেন্ট রেকর্ড করা হবে।

বিজিত বলে,

—আমার বোনের বিয়ে স্যার। দয়া করে তাড়াতাড়ি আমার স্টেটমেন্ট এসব কাগজপত্র জমা নিয়ে আমায় যেতে দিন।

—নিচ্ছি—নিচ্ছি—বসুন।

বড়বাবু ভিতরে চলে যায়। অবশ্য তার আগেই ব্রজবাবু এসে পড়েছে বড়বাবুর ঘরে। অখিলও, ব্রজবাবু বলে,

—ব্যাটা দুখানা খাতা নিয়ে কেটে পড়ছিল।

—ভয় নেই খাতাপত্র পাবেন ব্রজবাবু। তবে একটু খরচ হবে—

—ওসবের জন্য ভাববেন না। আপনি আমাদের এত দেখেন আর আপনাকে দেখবো না? তবে খাতাপত্রগুলো যেন বাইরে না যায়। ওগুলো ফেরত নিয়েই যাবো। আর ছেলেটাকেও একটু শিক্ষা দিন।

—ওসব হবে। ওই বিজিতের নামে ক্যাশ তছরূপ করেছে বলে একটা ডাইরি করে দিন। কেসটাকে সাজাতে হবে তো!

—অখিল তাই করে দেয়। ও লাখ খানেক টাকা তছরূপ করেছে—ফলস সার্টিফিকেট ইস্যু করেছে কোম্পানির নামে। অনেকের কাছ থেকে এই জাল সার্টিফিকেট দেখিয়ে টাকাও নিয়েছে। ছোটবাবুকে গিয়ে বলো উনিই সব পয়েন্ট গুছিয়ে লিখে দেবেন। এরমধ্যে গরম কফিও এসে গেছে। বড়বাবু মেজবাবুকে বলে,

—আপনি ওই ছেলেটার কাছে একটা সাদা কাগজে ও যা লিখে দেয় নিয়ে নিন। আর ওর ওই খাতা দুটো আর ওর সেই কাগজখানা ডাইরি বুকে নাম না লিখে আমার কাছে দিয়ে যান। আর হ্যাঁ—স্টেটমেন্ট খাতাপত্র দিয়েও চলে যেতে চাইবে। ওকে আটকে রাখবেন। মেজবাবু চলে যেতে বড়বাবু এবার ব্রজবাবু অখিলকে বলে,

—কিছু বুঝলেন?

—ঠিক বুঝতে পারলাম না স্যার।

—এবার বুঝবেন ব্রজবাবু। আপনাদের জন্য সত্য কি করতে পারি সেটাই দেখবেন।

রাত নামছে। ভবেশবাবুর বাড়িটা আজ আলোয় সাজানো। সানাই-এর সুর ওঠে। ওদিকে প্যান্ডেলে সব আয়োজন রয়েছে। বিজিত এখনও ফেরেনি। ভবেশবাবু বলেন,

—এত দেরি হচ্ছে বিজিতের। কি যে করি।

সাবিত্রী শিখাও চিন্তিত। সুজিত তার নিজের অতিথিদের নিয়ে ব্যস্ত। খেলার মাঠের বন্ধু-ভক্তরাও এসেছে। এসেছে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে নিবেদিতা সুজিতই তাকে এনেছে।

ভবেশবাবুও বিব্রত। ওদিকে অর্কও এসেছে বরের বেশে। বরযাত্রীরাও বসেছে ওদিকে প্যান্ডেলে। ওখানে বিয়ের ছাদনাতলা করা হয়েছে। অনিমেষ ভবেশবাবুকে বলেন,

—আপনি এত টেনশন করছেন কেন? বিজিত নিশ্চয় কোনও জরুরি কাজে আটকে গেছে। এসে পড়বে। আমি তো আছি, অর্কও রয়েছে তাছাড়া আমার বন্ধু-বান্ধবরাও রয়েছি। ওরাই সব ম্যানেজ করে দেবে।

—কিন্তু বিয়ের লগ্ন এসে গেল। এখনও তো ফিরল না। শিখা ভাবছে।

—আপনি বিয়েতে বসুন। অনুষ্ঠান শুরু করুন আমি সব দিক সামলে নেব।

ওরা বিয়ের অনুষ্ঠান শুরু করে। সুজিত তখন তার মাননীয়া অতিথি নিবেদিতাকে নিয়ে ব্যস্ত। ওদিকের প্যান্ডেলে ক্যাটারারের লোকজন অতিথি সৎকারে ব্যস্ত। এদিকে ছাদনাতলায় বিয়ের অনুষ্ঠান চলছে। মেয়েদের ভিড়, উলুধ্বনি—শাঁখের শব্দ ওঠে। পুরোহিত, মন্ত্রপাঠ করছে। হোমের আগুন জ্বলে ওঠে। অর্ক শিখার সপ্তপদী চলেছে—খুশির সুর ওঠে। হঠাৎ পুলিশের গাড়িটাকে আসতে দেখে প্রথম সুজিতই-নিবেদিতাও তার পাশে রয়েছে। ওই মন্দিরের ঝলমলে আলোয় দেখা যায় পুলিশ বিজিতকে সঙ্গে নিয়ে নামছে, সঙ্গে পুলিশ প্রহরা।

ভবেশবাবুও চমকে ওঠেন,

—একি! আপনারা—

সুজিত নিবেদিতা এগিয়ে আসে। পুলিশ অফিসারও বলে,

—এই বিজিতবাবুর অফিসের বস থানায় নালিশ করেছে বিজিতবাবু ওদের লাখ খানেক টাকা-ক্যাস তছরূপ করেছে। ওদের কোম্পানির নামে বহুজাল ক্যাস সার্টিফিকেট ইস্যু করে টাকা মেরেছে।

বিজিত বলে,

—এসব মিথ্যা কথা।

ভবেশবাবু বলেন,

—বিজিত একাজ করতেই পারে না।

পুলিশ অফিসার ওদের কথায় কান না দিয়ে অন্য পুলিশদের বলে, —এর ঘর, সুটকেশ, আলমারি সব সার্চ করে দেখ। ওসব কাগজ পত্র টাকা কিছু মেলে কিনা।

অনিমেষও এসে পড়ে, বিজিত বলে,

—অনি-অর্ক-বাবা তোমরা বিশ্বাস করো আমি ওই কোম্পানির দুনম্বরি কাগজপত্র ধরে ফেলেছিলাম তাই ওসব থানায় কেড়ে নিয়ে উলটে মিথ্যা ডাইরি করে আমাকেই চোর সাজাচ্ছে। ওই মালিক ব্রজবাবু আর অখিলের দল।

সুজিত শুনছে ওর কথা। নিবেদিতাও। সে আগে থেকেই বিজিতের উপর খুশি ছিল না। আজ সুজিতের অনেক অনুরোধে সে এসেছিল এখানে। এখানে এসে এইসব বিশ্রি কাণ্ড দেখে নিবেদিতাও চটে ওঠে। আজ তার রাগটাও যেন বদলে যায়। ওদিকে পুলিশবাহিনী সার্চ করেও কিছু পায় না। তবু তারাও ছাড়ে না বিজিতকে। অর্ক-শিখাও

রয়েছে। ভবেশবাবুর চোখে জল। এই সব তিনি বিশ্বাসই করতে পারছেন না। কান্নায় ভেঙে পড়ে সাবিত্রী। অনিমেষ বলে,

—মাসিমা, মেসোমশাই বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ করুন, এনিয়ে ভাববেন না। আমি জানি বিজিত নির্দোষ। ওকে মিথ্যা ষড়যন্ত্রে জড়ানো হয়েছে। আমি পুলিশ অফিসার, কমিশনার—দরকার হলে মন্ত্রীর কাছেও যাবে বিজিতকে কালই ছাড়িয়ে আনবো।

পুলিশ বিজিতকে নিয়ে চলে গেল। শিখার চোখে জল নামে। তবু বিয়ের অনুষ্ঠানও হলো। সানাই-এর সুর থেমে গেছে। এই আনন্দের দিনে ভবেশবাবুর সংসারে একটা বিপর্যয় নেমে আসে। বিজিত অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে অন্যায়কারীদের হাতেই অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে গেল আজকের এই আনন্দের দিনে।

সুজিত ব্যাপারটাকে এত সহজে উড়িয়ে দিতে পারে না। তার মনে হয় বিয়ের খরচা যোগাতে হয়তো দাদা কিছু করেছে। নিজের পুঁজি বাড়াতে বিজিত এসমস্ত করেছ। পরদিন সকালে সুজিত এসেছে নিবেদিতার বাড়ি। নরেশবাবু সকালের আসরে এখন সুজিতও আসে। কয়েকটা খেলার টিমকে সুজিত জিতিয়েছে—এবার রোভার্স কাপও জিতেছে। তাই সুজিতের উপর নরেশবাবুও খুশি।

সকালে অফিসের আগে নরেশবাবু বসার ঘরে কিছুক্ষণ বসে অফিসে চলে যান। নিবেদিতাও আসে। আজ নিবেদিতা ভাবছে বিজিতের কথা। সে বলে,

—বিজিত যে এত নীচে নামবে ভাবতে পারিনি। একদিন সে বাবার সাহায্য প্রত্যাখান করেছিল। সেই আদর্শবাদ এখন গেল কোথায়? সুজিত জানে নিবেদিতার সুরেই সুর মেলাতে হবে। সে বলে,

—তাই দেখছি। আচ্ছা অনিমেষদাকে দেখছি না।

নিবেদিতা বলে,

—দাদা তো সকালেই বের হয়েছে বন্ধুর জন্য। রাবিস—

—অনিমেষদা, অর্কদারা তো দাদাকে দেবতা মনে করে। গেছে বোধহয় দেবতাকে পুলিশের হাত থেকে ছাড়াতে।

অনিমেষ বিশ্বাস করে এসবই ওই অখিলদের আর ব্রজবাবুর মত একনম্বর অসাধু লোকেদের ষড়যন্ত্র। এর মধ্যে অবশ্য কাগজে কালকের গোলমাল, পুলিশের অন্যায়ভাবে নিরীহ আমানতকারীদের উপর লাঠি চালানোর খবরও ছবি বের হয়েছে। কাগজের লোকরাও বিশদভাবে এর মধ্যে জানাচ্ছে কত কোটি আত্মসাৎ করেছে ওই চক্র। অনিমেষও গেছে পুলিশ কমিশনার-এরকাছে। ভদ্রলোক অনিমেষের পরিচিত—এক ক্লাবেই পরিচিত—এক ক্লাবেই যাতায়াত করেন। কমিশনার সাহেবও এর মধ্যে কাগজগুলো দেখেছেন।

কমিশনার সাহেব অনিমেষকে চেনেন। তার কাছে ওই বিজিতের ঘটনাটা শুনে তিনিও অবাক হন। বলেন,

—এইসব ঘটেছে?

নিজেই বের হয় অনিমেষকে নিয়ে। ওই থানার উদ্দেশ্যে। বড়বাবু কাল রাত অবধি ব্রজবাবুদের জন্য বিজিতকে নিয়ে সার্চ করে ফিরেছেন অনেক রাতে। তখন ব্রজবাবুরাও চলে গেছে।

বড়বাবু নিজের ঘরের টেবিলেই ওই খাতাপত্র আর বিজিতের সেই স্টেটমেন্ট রেকর্ড না করেই রেখেছেন। সকালে ব্রজবাবুরা এলে তখন পাওনা-গন্ডা বুঝে নিয়ে ওদের মাল ফেরত দেবেন। তার আগেই স্বয়ং পুলিশ কমিশনারকে থানায় এসে তার ঘরে হাজির হতে দেখে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে বড়বাবু। ওইসব দুনম্বরী হিসাবের খাতা যায় বিজিতের লেখা কালকের সেই স্টেটমেন্টও পুলিশ সাহেবের হাতে এসে গেছে।

বড়বাবুর আর করার কিছুই নেই। কমিশনার সাহেবও বুঝেছেন পুলিশের অপকীর্তির কথা। তিনি বলেন,

—এই খাতাপত্র, কালকে বিজিতবাবুর স্টেটমেন্ট রেকর্ড না করে উল্‌টে তাকেই দোষী সাজিয়ে অনুষ্ঠানের রাতে তার বাড়িতে গিয়ে একটা নির্দোষ ছেলে ও তার পরিবারের এতবড় অপমান করতে বাধলো না।

এরমধ্যে ব্রজবাবুও এসে পড়েছে। আর সামনে পুলিশের বড়কর্তাকে হাতে নাতে সব ধরে ফেলতে দেখে পালাতে যাবে। এবার বড়বাবু হঠাৎ কর্তব্যপরায়ণ হয়ে ওঠে। বলে,

—দাঁড়ান। স্যার এই ব্রজবাবু, আর এরাই কাল মিথ্যা ডাইরি করে গেছেন। এদের অফিসে ও কাল গোলমাল হচ্ছে এটাই বলেছিলেন, ওরা নাকি অফিস ভাঙচুর করতে গেছল তাই আমরাও ওদের কথায় এই ভুল করেছিলাম স্যার—

পুলিশ কমিশনার বলেন,

—এসব পরে হবে। দোষীদের কাউকে ছাড়া হবে না। তার আগে নির্দোষ বিজিতবাবুকে ছেড়ে দিন।

—দিচ্ছি স্যার। ওরা এভাবে মিথ্যা চুরির বদনাম জানালেন—আমিও ভুল করে ফেললাম স্যার। এজন্য আমি দুঃখিত স্যার। আমায় ক্ষমা করবেন, আমি বিজিতবাবুকে ছেড়ে দিচ্ছি স্যার।

—শুনুন তবে আসল অপরাধীদের ছাড়বেন না। ওদের ব্যবস্থা আপনাকে করতে হবে।

বিয়ের পর্ব চুকে গেছে। পরদিন সকালে শিখা অর্কের বাড়িতে যাবে। বিজিত ফেরেনি। শিখা আজ তার ঘরের ঠিকানা পেয়েছে। ওরা চলে যাবে এখনও বিজিত ফেরেনি। ভবেশবাবু বলেন,

—ও সুজিত তোর তো অনেক চেনাজানা। বিজিতকে ছাড়িয়ে আনার ব্যবস্থা কর।

সুজিত জানে এ বাড়িতে বিজিতই সকলের প্রিয়। সে নাকি এ সংসারের উদ্ধার কর্তা। সবদিকে থেকে সংসারকে সে বারবার বাঁচিয়েছে। সেখানে সুজিতের কোনও ভূমিকাই নেই। সুজিত বলে,

—বাবা। পুলিশ যখন ওকে এ্যারেস্ট করেছে নিশ্চয় কোনও প্রমাণ পেয়েছে তারা।

—না। বিজিত কোনও অন্যায় কাজ করতে পারে না। সে নির্দোষ।

সুজিত চুপ করে থাকে। ওদিকে নতুন বর কনের যাবার সময় এগিয়ে আসছে। শিখার চোখে জল। সে বলে,

—যাবার সময়ও কি দাদার সঙ্গে দেখা হবে না?

সাবিত্রী বলে,

—সবই আমার অদৃষ্ট। একি সর্বনাশ হল রে। বিজিত এসব কাজ করতে পারে না।

অনিমেষ-এর গাড়ির শব্দ শুনে চাইল ওরা। অনিমেষ ঢুকছে বিজিতকে নিয়ে। সুজিত অবাক হয়। অনিমেষ বলে,

—বিজিতকে ওই অখিলের দল মিথ্যা ষড়যন্ত্র করে হাজতে পুরেছিল। এখন তারা হাজতে।

বিজিত বাবাকে প্রণাম করে। ভবেশবাবু ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে,

—জানতাম তুই নির্দোষ ঠাকুর মুখ রেখেছেন।

বিজিত বলে,

—এসব সম্ভব হয়েছে অনিমেষের জন্যই বাবা।

সাবিত্রী বলে,

—হাত-মুখ ধুয়ে নে। বাবা অনিমেষ তুমিও বোসো। আমি চা জলখাবার আনি। সকাল থেকে তো পেটে কিছু পড়েনি। অর্কও এসে বসে ওদের আসরে।

শিখাও খুশি, সে বলে,

—আমার জন্যই তোর এ দুর্ভোগ দাদা।

—তোদের সুখ শান্তির জন্য আমার কাছে সব দুঃখ কষ্টই তুচ্ছ হয়ে ওঠেরে। আর অন্যায়ের প্রতিবাদ আমি করবোই—তার জন্য সব কিছুই সইব।

সাবিত্রী বলে,

—এখন ওসব কথা ছাড়তো। শিখাদের যাবার সময় হয়ে এলো। শিখা আজ মা-বাবার ঘর ছেড়ে চলেছে নিজের ঘরে। আজ তার জীবনের সুখের দিন তবু এতদিনের আপনজনদের ছেড়ে যেতে শিখার চোখে জল নামে।

সুজিত তার খেলা নিয়ে ব্যস্ত। এখন সে সারা বাংলার একজন নামী প্লেয়ার। দিল্লি-মুম্বাই-গৌহাটি সব জায়গায় খেলতে যাচ্ছে। ওদের টিম এখন ইন্ডিয়ার এক নম্বর টিম। এবার নরেশবাবুরা এশিয়ান গেমস-এ টিম পাঠাবেন। ওই টিম জাপান-কোরিয়া-ব্যাঙ্ককে খেলতে যাবে। তারও প্রস্তুতি চলছে। নিবেদিতাও চায় সুজিত আরও বড় প্লেয়ার হোক। সে-ও সুজিতের অনুপ্রেরণা। সুজিতও স্বপ্ন দেখে মনে মনে নিবেদিতাকে ঘিরে। নিবেদিতাদের বাড়িতেও প্রায়ই আসে।

নরেশবাবু, বিপুলবাবুদের সঙ্গে মিটিং-এর পর ওরা অফিসে চলে যান। সুজিত

নিবেদিতার গল্প তখনও শেষ হয় না। নিবেদিতাই সুজিতের সঙ্গে প্রেস—টিভি মিডিয়ার লোকেদের পরিচয় করার জন্য পার্টিও দেয়। নিবেদিতা চায় সুজিতের নামও প্রচার হোক। সুজিত অবশ্য খেলায় ফাঁকি দেয় না। কলেজের পড়াটাও করতে হচ্ছে নিবেদিতার চাপেই। নিবেদিতা বলে —পড়াটারও দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ডিগ্রি থাকা দরকার। তাই গ্র্যাজুয়েশন তোমাকে করতেই হবে, গ্র্যাজুয়েশন না হলে ভবিষ্যতে কোনও ঠাঁই পাবে না কোথাও।

সুজিতও ভেবেছে কথাটা। খেলাতো চিরকাল থাকবে না। অবশ্য খেলার ক'বছরে যদি ঠিকমতো রোজগার করতে পারে আর একটা ভালো চাকরি জুটিয়ে নিতে পারে তাহলে বাকি জীবনটা কোনমতে চলে যাবে। তাই সে-ও পড়াশোনাটা করছে, আর জোর বরাত তাই এক চান্সেই বি.এ. পাশও করেছে। নিবেদিতাও খুশি।

সুজিত এশিয়ান গেমসের জন্য তৈরি হচ্ছে, এরমধ্যে দুটো খেলাতে তাদের টিম ইন্দোনেশিয়াতে গিয়ে জিতে এসেছে। সামনের খেলা হবে কোরিয়াতে। অর্কের বিয়ের পর অনিমেষও বিদেশ গেছে। মাসখানেক তাকে থাকতে হবে লন্ডন, নিউইয়র্ক, শিকাগোতে ব্যবসার কাজে। অর্ক এখন শিখাকে নিয়ে তার নতুন সংসার পেতেছে। উত্তর কলকাতা থেকে দক্ষিণ কলকাতার একটা ছিমছাম জায়গায় ফ্ল্যাটও নিয়েছে।

শিখা কলেজে ভর্তি হয়েছে। এখানে এসে শিখাও মুক্তির স্বাদ পেয়েছে। বিজিত আসে মাঝে মাঝে। শিখা অর্কও খুশি হয়। বলে, —কদিন এখানে থাক না দাদা।

অর্কও বলে।

—তাই থাকো বিজিত, অনিমেষও নেই। ওখানে আড্ডা আর জমে না।

—বাবার শরীর ভালো নেই, আর সুজিতও এখন খুবই ব্যস্ত দেশ-বিদেশে ঘুরছে, শিখা নেই বাড়ি তাই ফাঁকা। আমি মা-বাবাকে ফেলে থাকে কি করে। তারপর কাজকর্মেরও সন্ধান করতে হচ্ছে।

শিখা জানে তার দাদার অবস্থা। সেই কোম্পানিও এখন উঠে গেছে বহুলোকের টাকা মেরে। বিজিত তেমন কিছু কাজও পায়নি সামান্য দু-চারটের টিউশনি করে।

শিখা বলে,

—দাদা মাঝে মাঝে কি মনে হয় জানি, তোদের ভগবানের, ন্যায়বিচার টিচার বলে কিছুই নেই। থাকলে তোর মতো ছেলে এইভাবে পদে পদে বঞ্চিত হতো না।

বিজিত বলে,

—অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করতে পারিনিরে। এই আমার দোষ, পারলে, অনেক কিছুই পেতাম, সেই পাওয়টাকে আমি ঘৃণা করি। এই সমাজে যারা অন্যায়কে মেনে নিয়ে নিজেকে বিকিয়ে দিতে পারে তারা ভালোই থাকে অবশ্য এটা তাদের মত। আমি তা পারিনি আর পারবোও না। তার জন্য অনেক কিছু হারাতে হবে তা জানি।

ভবেশবাবুর শরীর এবারও ভেঙে পড়ছে। কদিন থেকে জ্বর তবু কাউকে তিনি কিছু বলেন না, বিজিতও চাকরির সন্ধানে ব্যস্ত। এখন এখানে ওখানে ঘুরছে যদি কোন কাজকর্ম পাওয়া যায়। ওদিকে সংসারের অবস্থাও শোচনীয় হয়ে উঠেছে। জমানো

টাকা শিখার বিয়ের পর তলনিতে এসে ঠেকেছে। ভরসাও পেনসনের কিছু টাকা, তাতে মাস চলেনা, বিজিত এরমধ্যে কলেজ স্ট্রিট পাড়ার কোনও প্রকাশকের ওখানে ইংরেজি বাংলা প্রুফ দেখে কিছু রোজগার করে আর দু-তিনটে টিউশনি করে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র অন্ন সংস্থানের জন্য পথে পথে ঘুরছে। তবু হাল ছাড়েনি বিজিত। এমনি দিনে ভবেশবাবুর অসুখটা বেড়ে যায়। বুক কফ জমেছে। নিঃশ্বাস নিতে তার কষ্ট হয়। বিজিত তাদের পরিচিত ডাঃ ঘোষের বাড়িতে এসেছে, ডাঃ ঘোষ এদের পূর্ব পরিচিত।

ডাঃ ঘোষ ভবেশবাবুকে পরীক্ষা করে বলে,

—এতো বেশ গুরুতর ব্যাপার বাধিয়েছেন মাস্টার মশাই, আগে সাবধান হলে এসব হতো না, এখন তো দেখছি ভোগাবে।

তারপর তিনি একগাদা ওষুধ আর বুকের এক্সরে আরও দু-একটা পরীক্ষার কথা বলেন। সাবিত্রীও ভাবনায় পড়ে।

—এ যে অনেক টাকার ব্যাপার। এদিকে সংসারের এই অবস্থা। সুজিতও নেই। বিদেশে কোথায় খেলতে গেছে।

—তোমার ছোটকুমার থাকলেও কিছু হতো না। সে তো সংসারের কেউ নয় আর আমার অসুখ নিয়ে ভাবতে হবে না। ডাক্তাররা আজকাল রোগীকে দেখামাত্র ওসব ফর্দ দিয়ে থাকে। ওসব কিছুই করতে হবে না দু-এক দিনের মধ্যে দেখবি সেরে উঠবো।

কিন্তু সেরে ওঠার কোনও লক্ষণই দেখা যায় না। বরং বাড়তে থাকে অসুখটা। রাতভোর জেগে থাকেন। ডাঃ ঘোষ বলেন,

—ওই টেস্টগুলো করাও বিজিত। নাহলে ঠিকমতো ওষুধও দেওয়া যাবে না। রোগ বেড়েই যাবে। এই বয়সে অসুস্থ হয়ে পড়লে আর করে কিছুই থাকবে না।

টেস্টগুলো করাতেও খরচা হবে প্রায় শ'তিন-চার টাকা, টাকার ও জোগাড় নেই। প্রকাশকের দোকানেও এত টাকা চাওয়া যাবে না। বাবার চিকিৎসা করতেই হবে। বিজিত হন্যে হয়ে টাকার জন্য ঘুরছে। অনিমেষ ফিরেছে কিনা জানেনা। ওই অনিমেষই ভরসা।

তাই আর কোনও পথ না পেয়ে বিজিত অনিমেষের বাড়িতে এসেছে। ওর বসার ঘরটাও ফাঁকা। এ বাড়িতে এর আগেও বিজিত এসেছে দারোয়ানও তাকে চেনে, সেই বলে,

—ছোটসাহেব তো এখনও বিলেত থেকে ফেরেননি, কাল ফেরার কথা ছিল, তা খবর এসেছে সামনের সপ্তাহে তিনি ফিরবেন।

—তাই নাকি? বের হয়ে আসে অনিমেষ। হঠাৎ এসময় নিবেদিতা গাড়ি নিয়ে ফিরছিল। নিবেদিতা বিজিতকে দেখে চাইল, বিজিতকে সে দেখছে বেশ কিছুদিন পর। এ বাড়িতে বিজিত সেদিন নিবেদিতার বাবার সাহায্য প্রত্যাখান করে ফিরেছিল। নিবেদিতা সেদিন চেয়েছিল বিজিত তার কথামত, তার বাবার কথামত চলুক, কিন্তু তা চলেনি বিজিত। নিবেদিতা সেদিন চটে উঠেছিল। তার মনে সেই রাগটা জমা ছিল।

আজ দেখছে বিজিতকে। এর আগে দেখেছিল তাকে সেই বিয়ের উৎসবে পুলিশের হাতে বন্দি অবস্থায়। তারপর নিবেদিতা আর বিজিতের কোনও খবরই রাখার প্রয়োজনও বোধ করেনি। এখন নিবেদিতার জীবনে এসেছে সুজিত। সে আজ জাপানে খেলছে। ভারতের হয়ে। সেই সুজিত আজ নিবেদিতার মনের আকাশে শুকতারার উজ্জ্বল্য নিয়ে বিরাজমান।

নিবেদিতা দেখছে বিজিতকে, ওর পোশাক-আশাকও খুবই সাধারণ. মুখে যেন একটা কালো ছায়া নেমেছে। তবু চোখ দুটোর দীপ্তি কমেনি। দারিদ্র্যের মাঝেও ওই চাহনিতে একটা প্রতিবাদী কাঠিন্য ফুটে ওঠে। নিবেদিতা বলে,

—পুলিশ ছেড়ে দিল শেষপর্যন্ত।

—দোষী সাজাবার কোনও প্রমাণ তো পায়নি। উলটে তাদেরই বিচার হচ্ছে। দোষী তারাই।

—পাকা ক্রিমিন্যাল যারা তারা প্রমাণও কিছুই রাখেনা।

নিবেদিতা যেন ইচ্ছে করেই ওই কথাগুলো বলে বিজিতকে, কথাগুলো ওর মুখের উপর ছুঁড়ে দিয়ে চলে যায় ভিতরে। ওর চোখে বিজিত এখনও নিরপরাধ। বিজিত অবশ্য মন থেকে নিবেদিতাকে মুছে ফেলেছে। ধনীর দুলালিকে প্রেম নিবেদন করার চেয়ে পায়ের তলে শক্ত মাটি পাওয়া তার কাছে জরুরি। তার চেয়েও জরুরি বাবার চিকিৎসা করানো। কিছু টাকা যেমন করে হোক, কিছু টাকার জোগাড় করতেই হবে।

বিজিত বাড়ি ফিরছে মেডিক্যাল কলেজের ফুটপাথ ধরে। কর্মব্যস্ত শহর এখানে যেযার চিন্তাতেই মগ্ন। অন্যের কথা ভাবার সময় কারো নেই। হঠাৎ দেখে মেডিক্যাল কলেজের গেটের ওদিকে একটা গাড়ি দাড়িয়ে আছে। একজন প্যান্ট সার্ট পরা মফস্বল শহর থেকে কোনও ধনী ব্যবসায়ী তার একমাত্র ছেলেকে এখানে এনেছে চিকিৎসার জন্য। তার জরুরি কোনও অপারেশন করাতে হবে। তাই রক্তের দরকার কিন্তু ভদ্রলোক তার ছেলের গ্রুপের রক্ত পাচ্ছেন না। সেই গ্রুপের রক্ত আপাততঃ ব্লাড ব্যাঙ্কে নেই। এখানে সেখানে রক্তের সন্ধানে ঘুরছে। কোথাও সে গ্রুপের রক্ত পাওয়া যাচ্ছে না।

পেসেন্টের অবস্থাও ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। ভদ্রলোক ও তার সঙ্গীরাও হতাশ। একজন বলে,

—কি হবে দাদা, ও পজিটিভ গ্রুপের রক্ততো কোথাও পেলাম না।

—তবে কি ছেলেটাকে বাঁচাতে পারবো না।

বিজিতও ওদের কথা শুনেছে। দেখছে অসহায় বাবাকে, এত টাকা তার। তবু সে নিদারুণ অসহায় আজ। তার চোখে জল নেমে আসে। বিজিত এর আগে তাদের পাড়ায়— অন্যপাড়ায় রক্তদান শিবিরে মাঝে মাঝে রক্ত দিয়েছে। সে জানে তারও ওই রেয়ার গ্রুপের রক্ত। বিজিত নিজেই এগিয়ে যায় ভদ্রলোকের দিকে। সে বলে,

—আপনাদের ওই গ্রুপের রক্তের দরকার?

ভদ্রলোক বলেন,

—হ্যা ভাই। নাহলে আমার একমাত্র ছেলেকে বাঁচাতে পারব না; জরুরি অপারেশন করতে হবে। ব্লাড না পেলে কিছুই করা যাবে না।

—আমার ওই একই গ্রুপের রক্ত। আমার রক্তে যদি আপনার ছেলের প্রাণ বাঁচে—আমি রক্ত দেব।

ভদ্রলোক প্রথমে কথাটা বিশ্বাস-ই করেন না। রাস্তায় কেউ যেচে এসে একজন অপরিচিতের জন্য রক্ত দেবে এটা সে কল্পনাও করেনি। তার মনে হয় যেন ঈশ্বরই ওর তরুণের বেশে তার সামনে এসেছে তাকে এই চরম বিপদের মুহূর্তে সাহায্য করতে।

ভদ্রলোক বলে,

—তুমি আমার ছেলের জন্য রক্ত দেবে ভাই?

বিজিত বলে,

—চলুন ব্লাড গ্রুপ ঠিক মেলে কিনা একবার দেখে নিতে হবে। মিলে গেলে রক্ত দেব।

—বাঁচান ভাই, কি বলে যে তোমাকে ধন্যবাদ দোব জানিনা।

ব্লাড ব্যাঙ্কের অফিসে এসেছে বিজিত। এখানেই বিজিতের পাড়ার সেই ডাক্তার ঘোষও রয়েছেন। তিনিও বিজিতকে দেখেন। ব্লাডগ্রুপও সঠিক, ডাক্তার ঘোষও রয়েছেন। তিনিও বিজিতকে দেখেন। ব্লাডগ্রুপও সঠিক মিলে যেতে বিজিত ও রক্ত দেয় এবার। ভদ্রলোকও এবার নিশ্চিন্ত হন। তার ছেলের অপারেশন এবার নির্বিঘ্নে-ই হতে পারবে। ভদ্রলোক এবার বিজিতের পকেটে মোটা খাম দিয়ে দিতে বিজিত বলে,

—এসব কি?

—দ্যাখো ভাই তোমার ঋণ আমি জীবনেও শোধ করতে পারব না। তবু এটা রাখলে আমি খুশি হবো। তুমি ভাই না বলো না। এটা রাখো—

ভদ্রলোক জোর করেই বিজিতের পকেটে খামটা পুরে দেয়। ওদিকের করিডর দিয়ে ডাঃ ঘোষ যাচ্ছিলেন। তিনিও দেখেন ব্যাপারটা, এখানে এসব ব্যাপার প্রায়ই ঘটে, তাই ডাঃ ঘোষ এনিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন না।

বিজিত বেরিয়ে আসে। বাইরে এসে এবার খামটা বের করে দেখে। তাতে আড়াই হাজার টাকা রয়েছে। এই টাকা তার খুবই দরকার, এবার বিজিতও তার বাবার সব টেস্টগুলো করাতে পারবে, ওষুধপত্রগুলো কিনতে পারবে, ওই দিনই বিজিত তার বাবাকে নিয়ে একটা ক্লিনিকে যায়। ভবেশবাবুর ওইসব টেস্টগুলো ও করায়। ফেরার পথে ভবেশবাবু বলেন,

—এতে অনেক টাকার ব্যাপার রে? এতটাকা কোথায় পেলি বিজিত?

—এক প্রকাশকের কাছে পেলাম। এতদিন তাদের কাজ করে এ টাকা পেয়েছি, এনিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না।

পরদিন বিজিত ডাঃ ঘোষকে বাড়িতে এনেছে। সব টেস্ট রিপোর্টও এসে গেছে, ডাঃ ঘোষ সব দেখে শুনে বলেন,

—যাক, তেমন জটিল প্রবলেম এখন আর নেই। ওই সব ওষুধ-ই চলুক। কদিন রেস্ট নিলে উনি সুস্থ হয়ে উঠবেন।

ডাক্তার কে এগিয়ে দিতে আসে বিজিত, সে পকেট থেকে ডাক্তারের ভিজিটের

টাকাটা বের করে দিতে যায়। ডাক্তার ঘোষ বলেন,

—ওটা তুমি রাখো বিজিত।

—কেন ডাক্তারবাবু?

—কি ভাবে তুমি ওই টাকা পেয়েছ তা আমি জানি বিজিত। নিজের রক্তের বিনিময়ে সংগ্রহ করা ও টাকা আমি নিতে পারব না। ডাক্তারি পাশ করার সময় শপথ নিতে হয় যে আর্ত মানুষের সেবা করবো। সেই শপথের মর্যাদা অন্তত এক্ষেত্রে রাখতে দাও। তোমার রক্তবেচা টাকা নিয়ে অপরাধী সাজতে পারব না।

বিজিত বুঝেছে ডাঃ ঘোষ কালকের ব্যাপারটা দেখেছেন, তাই বিজিত তাকে অনুরোধ করে।

—ডাক্তার বাবু। মা-বাবা যেন একথা জানতে না পারে।

—যে আত্মত্যাগের কথা সকলের জানা উচিত—সেটা আজ তোমার কাছে লজ্জার। এ তোমার লজ্জা নয়। বিজিত এ লজ্জা সারা সমাজের সারা দেশের মানুষের। চলি বাবা কেমন থাকেন জানাবে।

চলে যায় ডাঃ ঘোষ, বিজিত কি ভাবতে থাকে, তাকে জীবিকার একটা পথ এবার করতেই হবে।

কিছুদিন ধরে ভেবে ভেবে পথটা বের করেছে বিজিত—পথেঘাটে শ্যামবাজারের এলাকায় সে দেখেছে একটা নতুন শ্রেণীকে। তারা অনেকেই লেখাপড়া শিখেছে। কোথাও চাকরি পায়নি, অথচ বাঁচার জন্য রসদের প্রয়োজন, তারা অন্য কোনও পথ না পেয়ে পথেই নেমেছে। হকারি করছে নানা কিছুর। লেখাপড়া শিখে তারা সমাজে বাঁচার কোনও পথ না পেয়ে পথের পশারি হয়ে দিন কাটাচ্ছে।

ওদের দুচারজনের সঙ্গে বিজিত কথাও বলেছে। ক্রমশ দেখেছে ওরাও এই কাজ করে সংঘবদ্ধ ভাবেই। তাদের মধ্যে অনেক সৎ কর্মঠ ছেলেও রয়েছে। তারা বাধ্য হরে রোদে পুড়ে জলে ভিজে এই পেশায় রয়েছে। পুলিশের তাড়াও খায়। তবু এই কাজ করে। ওরা বলেঁ, চুরি ডাকাতি-জোচ্চুরি তো করিনা দাদা। খাটি খাই এতে লজ্জা! কিসের সমাজ আমাদের কথা ভাবেনি, তবু মাথা উঁচু করেই আছি।

ওদের একটা অফিস ঘরও আছে। সেখানেই ওদের দু-চারজন বসে। ওরাই কে কোন জায়গায় বসবে কি বিক্রি করবে ঠিকঠাক করে দেয়। বিজিত এর মধ্যে ওদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠেছে। বিজিত ভাবছে এবার সে হকারি শুরু করবে। মনস্থির করে ফেলে বাবার ওষুধ কেনার পর হাতে বেশ কিছু টাকাও রয়েছে।

হরিদাসবাবু ওই বাজারের বড় দোকানদার। তার দুটো দোকান— একটায় ধুতি শাড়ি সুটিং-সার্টিং অন্যসব বিক্রি হয়। সুন্দর শো-কেস দামী কাউন্টার। অন্য একটা দোকানে বিক্রি হয় রেডিমেড পোশাক, রকমারি দামের রকমারি কোয়ালিটির পোশাক, হরিদাস বাবুর দোকানের গুদামটা বেশ বড়। রকমারি পোশাক-এর ঢাল।

হরিদাসবাবুও প্রথম জীবনে এই মার্কেটের সামনে হকারি করতো। সামান্য রেডিমেড পোশাক নিয়েই তার ব্যবসা শুরু হয়েছিল। পরে ফুটপাতে দোকান তারপর মূল বাজারের বিলডিং-এ দুখানা দোকান করেছে। অবস্থা বদলালেও তবু হরিপদ বাবু বদলায়নি।

সে এখনও ওই হকারদের অনেক কে ধারে মাল দেয়। হকাররা সেই মাল বিক্রি করে তার দাম মিটিয়ে দিয়ে নিজেদের লাভ করে। সেই হরিদাসবাবু বলেন বিজিতকে—

লেখাপড়াতো অনেক শিখেছো, কিন্তু ব্যবসার কাজটাই আলাদা। ওটা শিখতে হয়। বাঙালি ব্যবসার কাজটা শিখল না। আরে ভাই হকারি করুম তাতে লজ্জার কি আছে? বড় বড় কোম্পানি এহন বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পাশ ছাত্রগো রাখছে। ওরা প্যান্ট-সুট পইরা কি কাম করে? হকারিই হয় একটু রকমফের মাত্র।

বিজিতও ভাবছে একই কথা। হরিদাস বাবু বলেন,

—ওরা গাড়ি চইড়া ফেরি করে, আমরা পথে পথে হাঁইটা ফেরি করে।

কামতো একই, কি কও।

—তা সত্যি।

—বাঙালি দলে দলে বিজনেসে আউট। আরে ঠাকুর কইছেন লাজলজ্জা ভয় তিন থাকতে নয়। ইসব লাজলজ্জা ছাইড়া পথেই নাইমা পড়। দেখবে একখান পথ ঠিক বাহির হইব।

হরেন এখানের হকার সমিতির একজন মাতব্বর, কলেজের পড়া শেষ করে সে এই কাজে নেমেছে এখন ফুটপাতে দোকান করেছে। হরেন বলে,

—কেউ কাম কাজ দেবে না, একমুঠো ভাত দেবে না। তবে তাদের কাছে লজ্জার কি আছে। তুমি এসে পড়ো বিজিত প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হবে, দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা তো আছি।

বিজিত ও এবার চিন্তা করছে, একটা সিদ্ধান্ত তাকে নিতে হবে।

বেঙ্গল টিম এবার এশিয়ান কাপের সেমিফাইনালে উঠেছে। সুজিত কোরিয়াতে খেলায় বিজয়ী হয়ে ফিরেছে। ফাইনাল খেলা হবে ব্যাংককে। ভারতের ইতিহাসে বেঙ্গল ক্লাব এবার নতুন এক অধ্যায় রচনা করছে। অনিমেষ মাস দেড়েক পর বিদেশ থেকে ফিরেছে। সে এরমধ্যে আমেরিকার বিভিন্ন শহরে ঘুরে তাদের কোম্পানির মালের মার্কেট রিপোর্ট নিয়ে দেখেছে, ওখানে নিজেদের অফিস এবং মার্কেটিং-এর ব্যবস্থা করতে পারলে প্রচুর মালও বিক্রি হবে। কারণ সে দেশে লেবার-এর খরচ অনেক বেশি। তার তুলনায় এদেশে লেবারের দাম অনেক কম। কাঁচামালও সস্তা।

তাই ওদেশের বাজারে অন্য দেশের চেয়ে অনেক কম দামে তারা মাল বিক্রি করতে পারে। সেই সুযোগ নেবে তারা। নরেশবাবু কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর অনিমেষের পরিকল্পনা দেখে বুঝেছে সে সঠিক প্ল্যানই করেছে। তারাও এবার নতুন করে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছে। দরকার হলে কারখানার আরও এক্সটেনশন করতে হবে। সেইসব প্রোগ্রাম চলছে।

নরেশবাবু ব্যবসার দিক থেকে অনেকটাই নিশ্চিন্ত, অনিমেষই এখন ধীরে ধীরে ব্যবসার হাল ধরেছে। তাই নরেশবাবু এবার খেলার জগতে তার টিমকে দিয়ে নতুন ইতিহাস গড়তে চান। ক্লাবে জরুরি মিটিং বসেছে।

কোরিয়া থেকে টিম সম্প্রতি সেমিফাইনালও জিতে ফিরেছে। এবার তাদের ফাইন্যাল খেলা। এনিয়ে জোর জল্পনা-কল্পনা চলছে। নরেশবাবুও আশাবাদী, বিপুল এখন বিপুল বিক্রমে প্রচারে নেমেছে। এয়ারপোর্টে সুজিতরা নামছে। বহুভক্ত অনুরাগীরা এসেছে টিমকে সম্বর্ধনা জানাতে। ফুলের মালা-ফুলের তোড়ায় চারিদিক ছয়লাপ।

নরেশবাবু অবশ্য আসতে পারেননি। এসেছে বিপুলবাবু আর নিবেদিতা। সুজিত নামছে টিমের সঙ্গে। এয়ারপোর্টে এখন ভিড় আর ভিড়। নিবেদিতা এগিয়ে আসে সুজিতের দিকে। ওর হাতে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানায়, ভক্তদের হাত থেকে সুজিতকে উদ্ধার করে নিবেদিতা এনে গাড়িতে তোলে।

আজ নিবেদিতাও খুশি হয়েছে। সুজিত বলে,

—সবে ফাইনালে উঠেছি এখনও চ্যাম্পিয়ন হতে পারিনি।

—তাও হবে তুমি। বাড়ি চলো বাবা তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন। এখান থেকে বাড়ি ফিরবে।

সুজিত দেখছে নিবেদিতাকে। আজ তার মনেও খুশির সুর ওঠে। নিবেদিতা স্বপ্ন দেখে আজ। বেশ কিছুদিন পর সুজিত বাড়ি ফিরেছে। পাড়ার লোকেরাও তাকে চেনে। খবরের কাগজেও তার ছবি ছাপা হয়। তার খেলার ছবি ভেসে আসে টিভিতে।

বিজিত বলে,

—বাবা সুজিত এখন খুব নাম করেছে। এবার ওরা এশিয়ান কাপ জিতলে রেকর্ড হবে।

সাবিত্রী বলে,

—তাই নাকি!

শিখাও এসেছে এ বাড়িতে। অর্কও আসে, সুজিত ফিরছে বিদেশ থেকে আর এখন তার নাম-ডাকও হয়েছে। সাবিত্রী বাড়িতে সত্য নারায়ণ পুজোর আয়োজন করেছে। ভবেশবাবু অবশ্য দেখেন সুজিতের চাল চলনও কেমন বদলে গেছে। দামী গাড়িতে করে নিবেদিতা এসে ওকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যায়। পরণে দামী স্যুট বিদেশী ব্যাগ তাতে বিভিন্ন জিনিসপত্র। ভবেশবাবু দেখছেন ইদানীং বিজিত সকালে বের হয় দুপুরে ফেরে আবার দুপুরে খাওয়ার পর বিকেলের আগেই বের হয়ে ফেরে রাত নটায়, ভবেশবাবু বলেন,

—কোথায় যাস বিজিত? সারাদিন পর ঘেমে-নেয়ে ফিরিস।

—একটা কাজ পেয়েছি বাবা। একটা কোম্পানির সেলসম্যানের কাজ, তাই দুবেলা বের হতে হয়।

ইদানীং ভবেশবাবু আর বাজারে যেতে পারেন না। বিজিতেই বাজার করে তবে ভবেশবাবুর কাছে বাজারের টাকাও নেয়না। বাজার খরচা সংসারেও কিছু দেয়, ভবেশবাবুও কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছেন, ওই দুঃখ অভাবের সংসারে সুজিত এসেছে আশার আলো নিয়ে। কথাটা এ বাড়ির আর কেউ ভাবেনা—সাবিত্রী ভাবে। তাই সুজিতের কল্যাণেই আজ সত্যনারায়ণ পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। শিখা এসেছে, অর্কও এসেছে। বিজিত নেই সেই সকালে যথারীতি বেরিয়েছে। নিবেদিতা এসেছে

সাবিত্রী তাকে কোথায় বসাবে জানেনা, ওই নিবেদিতার জন্যই সুজিতের এত উন্নতি।

নিবেদিতা অবশ্য বেশিক্ষণ থাকে না। তার জরুরি কাজ আছে, তাই চলে যায়। সাবিত্রী সুজিতকে বলে,

—ও সুজিত এখন তোর অনেক নাম-ডাক, খেলার জন্য কত টাকা পাস, এবার বাড়ি ঘর কর। বাবা চিরকালই কি ভাড়া বাড়িতে পড়ে থাকতে হবে? গড়িয়াতে তোর বাবা কবে জায়গা কিনে ফেলে রেখেছে, বিজিত তো পারেনি। তুই কর।

সুজিত ভাবছে কথাটা, এখন তার হাতে বেশ কিছু টাকা রয়েছে। কিন্তু সে সংসারের সকলের জন্য সেটাকে খরচা করতে চায়না। তার নিজের কিছু স্বপ্ন রয়েছে। এইবার ফাইনাল-এ জিততে পারলে নরশেবাবু তার জন্য অনেক কিছুই করবে। বাড়িতে আনন্দ উৎসব চলেছে। এসেছে সুজিতের ভক্তরা। এদের এই আনন্দের মেজাজে একমাত্র বিজিত নেই।

অনিমেষ বিদেশ থেকে ফিরেছে। এই কদিন ভীষণ ব্যস্ত ছিল অফিসের কাজে, অর্ক বিজিতদের সাথে কদিন দেখা নেই। তাই অনিমেষ বিজিতদের বাড়িতে এসেছে। দেখে অনিমেষ নিবেদিতার গাড়িটা বের হয়ে গেল। অর্থাৎ নিবেদিতাও এসেছিল এখানে। সুজিত তাকে হাত নেড়ে বিদায় জানাচ্ছে।

অনিমেষ সুজিত আর নিবেদিতাকে দেখে অবাক হয়। বেশ বুঝেছে অনিমেষ ওদের মধ্যে সম্পর্কটাও বেশ নিবিড় হয়েছে। কথাটা ভাবতেও অবাক লাগে অনিমেষের, তবু অনিমেষ বিজিতের সন্ধানে বাড়িতে ঢোকে। ভবেশবাবু ও খুশি হন অনিমেষকে দেখে, অর্কও বলে,

—কবে ফিরলি বাইরে থেকে?

—দুতিন-দিন হল, বিজিতকে দেখছি না?

ভবেশবাবু বলেন,

—সে একটা সেলসম্যানের চাকরি পেয়েছে, তাকে বের হতে হচ্ছে। ফিরবে সেই রাতে।

অনিমেষ বলে,

—তাই নাকি? অর্ক আজ চলি কাল ফোন করো। শোন বিজিতকে নিয়ে আসবি অনেক কথা আছে।

সাবিত্রী বলে,

—এখুনি চলে যাবে অনি?

অনিমেষ বলে,

—পরে আসবো মাসীমা, বিজিতকে বলবেন যেন ফোন করে সে আমাকে। বিকেলের দিকে কলকাতার পথে-ঘাটে ভিড় বেশ বাড়ে। বিজিত তখন পথে পথে, জনতার ভিড়, বিজিত কদিনেই হকারিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এখন বিজিত ও বেশ হেঁকে-ডেকে খদ্দের ধরে, যে লাইনের যা রীতি। এখানের পথের হকারদের হেঁকে-ডেকে খদ্দেরদের জিনিসের গুণাগুন বর্ণনা করতে হয়। কথার ফাঁকে জানাতে হয় যে বাজারে এর চেয়ে কম দামে আর কোথাও এমন জিনিস পাবেন না। তাই খদ্দের

মাল নেবে। আর পথ চলতি মানুষের মধ্যে থেকে প্রকৃত খদ্দের বেছে নিতে হবে।

বিজিত এসব টেকনিক এরমধ্যেই রপ্ত করে নিয়েছে। অন্য হকারদের তুলনায় তার চেহারায় একটা বুদ্ধিদৃপ্ত ভাব আছে—কথাবার্তাও বলতে পারে ভালোই। তাই বিজিতের খদ্দেরদের অভাব হয় না। এই অঞ্চলের অনেক মানুষ ফুটপাতেই কেনাকাটা করে নিয়মিত। তারাও এর মধ্যে বিজিতকে চিনে ফেলেছে। অনেক মহিলা এখন বিজিতের দিদি-বৌদি মাসীমা হয়ে গেছে। তারাই তার নিয়মিত খরিদ্দার। ফলে বিজিতের বিক্রি বাটাও বেড়েছে। অন্য অনেক হকাররা বলে,

—বিজিতদা আরে এখানে ক'মাসেই তুমি তো অনেক বাঁধা খদ্দের পেয়ে গেছো।

—তোরা চেষ্টা কর পাবি। বেশি লাভ করতে গেলে লোকসানই হবে। আমি ওসব করিনা তাই খদ্দের আসে আমার কাছে।

সেবার পাড়ার এক দাদার চ্যালারা হকারদের কাছে হঠাৎ হপ্তায় পাঁচ টাকা তোলার জায়গাতে দশ টাকা রেট তুলে দিতে হকাররা বিপদে পড়ে। এরাও দেবে না আর মস্তানের দলও ছাড়বে না। ফলে হাতাহাতি মারামারিও হয়। হকারদের কাজ বন্ধ। বহু পরিবার উপোস করে কাটাচ্ছে। কারণ এটাই ওদের জীবিকা। এবার বিজিতই কয়েকজন হকারদের নিয়ে সেই নেতার বস্তিতেই গিয়ে হাজির হয়।

সেই নেতাকেও বিজিত যুক্তি-তর্ক দিয়ে বোঝায় যে নিজেদের দুঃখের কথাটা। সেই নেতার কঠিন মনও নরম হয়ে ওঠে। তার বোধহয় জানা ছিলনা যে আজকের যুব সমাজ কোন হতাশার অন্ধকারে হাঁপিয়ে উঠেছে। তার জগৎ আলাদা সেখানে আঁধারের কালিমা নেই। সেই নেতাও হিসাব করে নেয় পথে পথে ঘুরছে কয়েক শ হকার। তাদের পরিবার পরিজনও কম নয়, অর্থ্যাৎ এদের কিছু দাক্ষিণ্য দেখাতে পারলে হাজার কয়েক সলিড ভোট পকেটে এসে যাবে। তাই নেতাও তার মস্তান বাহিনীকে বলে,

—ওদের মোটেই ব্রিরক্ত করো না, ওরা পাঁচ টাকা করে দিচ্ছে হপ্তাহে তাই নেবে।

বিজিতকে দেখে নেতাজির মনে হয়েছে একে কাজে লাগানো যেতে পারে তাই বলেন,

—আমি প্রতি শনিবার এই মার্কেটের অফিসে বসি। তুমি এসে দেখা করো তোমাদের জন্য কিছু করার কথা নিয়ে আলোচনা করা যাবে। হকাররা ছাড়পত্র পেয়ে খুশি। আর এটা যে হয়েছে বিজিতের জন্য তাও বুঝেছে তারা। তাই বিজিত তাদের কাছের মানুষ হয়ে উঠেছে। দরকার হলে থানায় গিয়েও পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে চোস্ত ইংরেজিতে কথা বলে, কোন হল্লায় ধরা পড়লে সেই হকারকেও মালসমেত ছাড়িয়ে আনে।

বিজিত বিকেলে ব্যস্ত। হঠাৎ ওর পাশে এসে গাড়িটা থামে। আজকাল গাড়িওয়ালা হকারদের কাছে জিনিস কেনে। তাই খদ্দের ভেবে চাইল বিজিত। আর গাড়ি থেকে অনিমেষকে নামতে দেখে চাইল সে। বেশ কিছুদিন বিদেশী থাকার ফলে অনিমেষের চেহারায় একটা বিদেশী ভাবও এসেছে।

অনিমেষ দেশে-বিদেশে ঘুরছে। আমেরিকাতে দেখেছে সেখানে মানুষ নানা ভাবে

খেটে অর্থ উপার্জন করে, কোনও কাজই সেখানে ছোট কাজ নয় তাতে আর সামাজিক পরিচয় এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়না। ওদেশে কলেজের কৃতি ছাত্র হোটেলে ডিস ধুয়ে, পেট্রল পাম্পে পেট্রল ভরে রোজগার করে, তাছাড়া অনেক চাকুরিজীবীও ফুটপাথে ঠেলাগাড়িতে দোকান সাজিয়ে, ঘোরে, বিক্রি করে।

তাই বিজিতকে পথের পশারি হাতে দেখে অনিমেষ খুব অবাক হয়না। বিজিত যে ধরনের প্রতিবাদী যুবক তাতে তার পক্ষে মাথা নীচু করে কোনও চোর অসাধু ব্যাবাসায়ীর চুরির ধনের হিসাব করতে বাধবে, বিজিত তার মন থেকে সব লজ্জা-সংস্কার-দুর্বলতাকে ঝেড়ে ফেলে মুছে ফেলেছে। অনিমেষ খুশিই হয়। বিজিতও সহজভাবে এগিয়ে আসে

—কবে ফিরলি আমেরিকা ইংল্যান্ড থেকে।

অনিমেষ বলে,

—পরশু, আজ তোর বাড়িতে গেছলাম, তোর বাবা বললেন তুই নাকি সেলসম্যানের চাকরি করছিস।

হাসে বিজিত।

—এতো তাই রে। তবে আসল কথাটা বাবাকে বলে দুঃখ দিতে চাইনি। অনার্স গ্র্যাজুয়েটের পর এইসব করছি, তবে ভালোই আছিরে মানুষকে দেখছি আর দিন চলে যাচ্ছে।

হকারদের অনেকেই দেখছে ওই সুবেশী অনিমেষকে। তার দামী বিদেশী গাড়িটাও সহজেই ওদের নজর পড়ে। অনিমেষ বলে,

—কাজ কারবার কেমন চলছে?

—ভালোই। সমাজের একটা নতুন রূপকে দেখছি। যাদের দুর থেকে দেখেছি আজ তাদের কাছ থেকে দেখে মনে হয় মানুষ এত লড়াই করেও বাঁচতে চায়। হার মানতে সে নারাজ।

অনি বলে,

—এখন কাজ কর। সন্ধ্যায় বাড়িতে আসবি, অর্কও আসবে। অনেক কথা আছে তোর সাথে। আর শোন—

বিজিত ওর দিকে চাইল, অনিমেষ বলে,

—এই সেলসম্যানগিরি চালিয়ে যা, জীবনের কোনও অভিজ্ঞতাই ফেল যাবে না। কাজে লাগে। চলি—

অনিমেষ চলে যায়। অন্য হকাররা ওকে দেখছে। একজন বলে,

—ওই গাড়িওয়ালা মালটা কে বিজিতদা? তুই তোকারি করছিলো? হকাররাও বিজিতকে নিয়ে আলোচনা করে। তাদের মধ্যে ওকে নিয়ে চাপা প্রশ্ন ওঠে, বিজিত এড়িয়ে যায়। বলে,

—এমনি চেনাজানা, এই পথ দিয়ে যাচ্ছিল তাই দেখা হয়ে গেল।

কথা না বাড়িয়ে বিজিত দুজন কাস্টমারকে নিয়ে পড়ে,

এখন সুজিতের ভাগ্যের দরজাটা যেন খুলে গেছে, কদিন ধরে কাগজে কাগজে

এশিয়ান কাপ-এর ফাইন্যালে খেলার নানা টুকরো খবর বের হচ্ছিল এই প্রথম কোন ভারতীয় দল এশিয়ান কাপের ফাইন্যালে উঠেছে। তাদের স্ট্রাইকার সুজিতের উপর টিমের কোচের কর্মকর্তাদের অনেক আশা ভরসা।

ওদের টিম ফাইন্যাল খেলতে গেছে জাকার্তায়, জাপানের সাথে খেলা। বিজিত সকালে খবরের কাগজ নিয়ে বসেছে, ভবেশ বাবু বলেন,

—কি এত মন দিয়ে পড়ছিস, শুধুতো রাজনীতির কচকচানি, সাবিত্রী রাজনীতি বোঝে না তাই বলে,

—বাজারে সব কিছুরই দাম বাড়ছে। কেরোসিন তেল গ্যাসের দামও বাড়ছে চড়চড় করে। মানুষের কথা কে ভাবে?

বিজিত বলে,

—না বাবা, আজ সুজিতদের ফাইন্যাল খেলা বিদেশে, এবার ওরা জিততে পারলে ভারতের সুনাম বাড়বে।

ভবেশবাবু খেলাধুলার ব্যাপারে তেমন আগ্রহী নন। তাই বলেন,—কে জানে? তুই কাজে বের হবি না?

বিজিত সকালেই বেরিয়ে যায়। আজ কলকাতার পথে-ঘাটেও ওই বেঙ্গল টিমের কথা। হকারদের অনেকেই ফুটবল সম্বন্ধে আগ্রহী। অনেকেই বেঙ্গল টিমের অন্ধ সমর্থক, ওদের মধ্যেও আজ একটা চাপা উত্তেজনা রয়েছে। মদন বেঙ্গল টিমের গোঁড়া সমর্থক তারও কিছু দলবল আছে, এমনিতে ওদের খেলা থাকলে ওরা হকারি বন্ধ রেখে মাঠে যাবেই। আর প্রথম থেকে শেষ অবধি গলা তুলে চিৎকার করে, টিম জিতলে তো কথাই নেই।

মদন বলে,

—বিজিতদা তুমি কোন দলের?

পাশ থেকে একজন বলে,

—আরে ভারতের জাতীয় পাখী ময়ূর আর জাতীয় টিম বেঙ্গল টিম, এবার এশিয়ান কাপ জিতে হিস্ট্রি করবে। সুজিত আছেনা? দেখবি ও একাই দুখানা গোল দেবে।

অপরজন বলে,

—সি...ওর, সুজিতের যা ফর্ম এখন একেবারে টপ ক্লাশ।

বিজিত ওদের কথাগুলো শুনছে, অবশ্য হকারদের কেউই জানেনা বিজিত আর সুজিতের সম্পর্কটা, ওসব কথা বিজিতও বলেনি। তাই সে ওদের কথা শোনে। আর তাই এর জন্য গর্ব বোধ করে।

বেঙ্গল ক্লাবেও কর্মকর্তাদের ভিড় জমেছে, রাতে তাদের খেলার টেলিকাস্ট হবে। সারা শহরের মানুষ টিভির সামনে।

নরেশবাবুও অফিস থেকে ফিরে বাড়িতে টিভির সামনে হাজির নিবেদিতা ও রয়েছে। বিপুলবাবু ও আরও অনেক কর্মকর্তারা এসেছে। আজ তাদের মরণ বাঁচন সমস্যা। খেলা শুরু হয়েছে। জাপান টিম হিসাবে ফেবারিট, ওরাই আক্রমণ করছে বারবার। জাপানের আক্রমণের সামনে বেঙ্গল টিম যেন নিজেদের অসহায় বোধ করে। আর

একটা নিশ্চিন্ত গোল বাঁচাবার জন্য বেঙ্গল টিমের ব্যাক ফাউল করতে রেফারিও পেনাল্টির নির্দেশ দেন।

পেনাল্টিতেই গোল দিল জাপান প্রথমে। নরেশবাবু নিবেদিতরাও চুপসে গেছে। খেলা চলছে। হাফটাইম অবধি জাপান এক গোলে এগিয়ে রইল। এরাও হাল ছেড়ে দিয়েছে। তীরে এসে ওরাই ডুবল বেঙ্গলের। সেকেন্ড হাফের খেলায় এবার বেঙ্গল টিম আক্রমণ শুরু করেছে। জাপানীরাও প্রতিহত করে নিমেষের মধ্যে বল নিয়ে চলে আসছে এদের গোলে সটও করেছে জোর বরাত তাই বলটা ক্রশ বারে লেগে কর্নার হয়ে গেল। এবার সুজিত একটা বল পেতেই আর নিপুণভাবে ওদের ডিফেন্সকে কাটিয়ে বাঁ পায়ে কিক করে। বলটা পাক খেয়ে গোলে ঢুকতেই দশর্করা চিৎকার করে ওঠে 'গোল'।

গোল পেতে বেঙ্গল টিম যেন নতুন উদ্যমে খেলা শুরু করে। তারাও এবার আক্রমণ শানাতে থাকে। জাপানি ডিফেন্সের উপর বারবার ঝাঁপিয়ে পড়ে এরা। কয়েক মিনিটের মধ্যে সুজিতের পায়ে বল, সুজিত এবারও দু-তিনজনকে কাটিয়ে বল সমেত গোলে ঢুকে পড়ে। এবার মাঠ চিৎকারে ভরে ওঠে। টিভির দর্শকদেরও চিৎকার ওঠে। নরেশবাবু যেন বিশ্বাসই করতে পারেন না যে তাদের টিমই দুগোল দিয়েছে জাপানের মতো টিমের বিরুদ্ধে। জাপানিরাও এবার যেন উন্মাদ হয়ে গেছে। কিন্তু বেঙ্গল টিমও সমান তালে লড়ে যায়। ওদের প্রতিটি প্লেয়ারও জান লড়িয়ে খেলছে, আর গোল হয়না। শেষ পর্যন্ত বেঙ্গল টিমই দু-এক গোলে এশিয়ান কাপ বিজয়ী হলো। আর দুটো করেছে সুজিত। সেই আজ ম্যাচের হিরো।

কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় তখন বোম ফাটছে। আনন্দ কলরব মুখর হয়ে ওঠে মহানগরী। ভারত আজ ফুটবলের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় রচনা করে বিশ্বকাপে যাবার খেতাব অর্জন করেছে, বিপুল বলে,

—নরেশদা দেখুন কেমন জুয়েল তুলে এনেছি টিমে। ওকে ধরে রাখুন। ও আমাদের আরও অনেক কিছু পাইয়ে দেবে।

অনিমেষ এ যাত্রায় বিদেশ গিয়ে তাদের কোম্পানির জন্য ভালো ব্যাবসা করে এসেছে। আর বেশ কিছু নতুন সম্ভাবনার পথও তৈরি করে এসেছে। নরেশবাবুও এসব প্ল্যান প্রোগ্রাম নিয়ে অনিমেষের সাথে আলোচনা করে বলেন,

—তুই যদি বিদেশের মার্কেটিং-এর সব দায়িত্ব নিতে পারিস আমার অমত নেই। এও আমাদের একটা গর্ব। আমরাও আন্তর্জার্তিক ক্ষেত্রে নাম করবো, দ্যাখ যদি প্ল্যান মতো কাজ করা যায়।

অনিমেষ বলে,

—আমি আরও ভাবনা-চিন্তা করছি বাবা। ঠিক মতো এগোতে পারলে বিদেশের মাটিতেও আমরা ভাল জায়গা করে নিতে পারবো।

নরেশবাবুও চান ব্যাবসায় আর ফুটবলে বিশ্বজয় করার স্বপ্নকে সফল করতে, ওর এখন সময় নেই। ওদের ক্লাব ট্রফি নিয়ে ফিরেছে। ওদের একটা রিসেপসন দিতে হবে। তারপর আবার জাতীয় লিগ খেলা আছে। সেখানেও তাদের চ্যাম্পিয়ন হতে হবে।

সুজিত বিজয়ী হয়ে ফিরে এসেছে। সেদিন এয়ারপোর্টে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। সুজিতের ভক্তরা—টিমের প্রায় লাখ খানেক অন্ধ-সমর্থক ভিড় করেছিল সেখানে, খবরের কাগজওয়ালা, টিভি ক্যামেরাম্যানরা গেছে দলে দলে। সমর্থকরা জয়ধ্বনি করে, নরেশবাবু বিপুলবাবুরাও গেছেন কর্মকর্তা হিসাবে, টিমকে অভ্যর্থনা জানাতে নিবেদিতাও গেছে সেখানে এ জয় তাকেও অভিভূত করেছে, সে সুজিতকে সেই অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। আজ তাই বিজয়ী সুজিতকে অভ্যর্থনা জানাতে—সে-ও এসেছে এয়ারপোর্টে।

কোনও মতে পুলিশ পাহারায় ভক্ত ও সমর্থকদের হাত এড়িয়ে বেরিয়ে আসে টিমের সভ্যরা, গলায় মালা মুখে বিজয়ীর হাসি। নিবেদিতা ওকে গাড়িতে তোলে। নরেশ বাবু—বিপুলদেরও আসার পথ নেই। জনতা গাড়ি ঘিরে রেখেছে। পুলিশ কোনমতে তাদের গাড়িটা পাশ করে দিতে গাড়িটা বের হয়ে যায়।

গাড়িতে সুজিত আর নিবেদিতা। আজ সুজিত নিবেদিতার হাতটা চেপে ধরে বলে,

—তোমার জন্যই জয়ী হতে পেরেছে নিবেদিতা, বিদেশে থাকতেও বারবার তোমার কথাই মনে পড়তো। আর শক্তি ও সাহস পেতাম। এজয় তোমার।

ওরা আরও কাছাকাছি আসে। আজ সুজিত নিজের সাধনায় সেই অধিকার অর্জন করেছে। নিবেদিতাও বাধা দেয় না, আজ সে ও সুজিতকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখে। নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন।

বিজিতও স্বপ্ন দেখে, তার ভাই সুজিত জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুখী হয়েছে। তাদের বাড়িতেও ভিড় করে আজ সুজিতের অনুরাগীর দল। দু-চারজন সাংবাদিক এসেছে ভবেশবাবুও হতচকিত। সারাজীবন শিক্ষকতা করেছেন অথচ কেউ তাকে চেনে না। বহু ছাত্রের ভবিষ্যৎ গড়েছেন, তাদের অনেকেই আজ বড় ব্যাবসাদার, কেউ বা নামকরা অধ্যাপক, কেউ বা অফিসার—বড় ডাক্তার। সমাজের আজ তারা সুপরিচিত। কিন্তু তাদের কৃতিত্বের মূলে যিনি তাকে কেউ চেনে না। হয়তো সেই সব কৃতিত্ব ছাত্ররাও জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুখী হয়েছে।

অথচ মাঠে ফুটবল খেলায় নাম করেছে সুজিত তার পিছনে এই জনতার ভিড় দেখে ভবেশবাবুও অবাক। সুজিতের কৃতিত্বের মূলে ওই বিজিত ওই তাকে প্রথম ফুটবল খেলায় উৎসাহ দেয়—ওকে নিয়ে নানা জায়গাতে খেলতে যেতো, নিজের খাবারের পয়সা বাঁচিয়ে ওকে বুট কিনে দিয়েছে। সুজিতের খেলার জন্য দলের কর্তাদের কাছে গেছে বারবার, আজ সুজিতও যেন তাকে চেনে না।

অবশ্য বিজিতের মনের মধ্যে একটা নিঃস্বার্থ ব্যক্তিত্ব আছে, সে মানুষের জন্য কিছু করার চেষ্টা করে, সংসারের প্রতিটি মানুষের জন্য সে অনেক কিছুই করে। কিন্তু সে পাবার প্রত্যাশা করে না। কর্তব্য আর ভালোবাসা দিয়েই সব কাজ করে। বিনিময়ে কিছুই সে পেতে চায় না।

তাই কোনও আঘাত কষ্ট বিজিতকে স্পর্শ করতেও পারে না। তার জগৎ শত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও আনন্দময়। তাই বিজিতও খুশি। তার ওই হকার সমিতির ভক্তরাও

এসেছে সুজিতের বাড়িতে তাদের শুভেচ্ছা জানাতে। সেখানে তখন ভিড়। বিজিতই বেরিয়ে এসে ওদের সুজিতের কাছে ওদের নিয়ে যায়। সুজিত ওদের দিকে একবার চাইতে ওরা ও ধন্য হয়ে ফিরে আসে। হকারদের পাণ্ডা মদন বলে—ওকে চেন নাকি হে বিজিত, দেখলাম ওদের বাড়িতেও তোমার যাতায়াত আছে।

বিজিত একটু নিশ্চিন্তই হয়, এই হকারেব দল কেও সে জানাতে চায়না ওদের আসল সম্পর্কটা। তাতে ওদের চোখে সুজিতের দাম কমে যাবে। তাই বলে বিজিত।

—আরো ওদিকেই তো থাকি। ছেলেবেলা থেকে সুজিতকে দেখছি। ওর বাবা ছিলেন আমাদের স্কুলের মাস্টার, তাই যেতাম।

—তোমার এত বড় বড় লোকদের সঙ্গে ওঠা বসা বিজিতদা, দেখি বিদেশী গাড়ি-গুলোও আসে তোমার কাছে। এত চেনাজানা কেন চাকরি না করে এলে এই রোদ জলে পুড়ে হকারি করতে।

বিজিত বলে,

—এ স্বাধীন ব্যাবসা। কত ডিগ্রিওয়ালা ছেলে এখন হকারি করছে তা জানিস! নে কাজ শুরু কর। কে খেলায় জিতলো কাপ পেলো তাই নিয়ে দুদিন কামাই করলি।

মদন বলে,

—কাজতো আছেই। এবার ইন্ডিয়া লীগের খেলা শুরু হয়েছে। আমাদের টিম লীগ চ্যাম্পিয়ন হলে সেদিন হকার কমিটি থেকে যা ভোজ দোব।

—আগে জিতুক, পরে সেসব হবে, গাছে কাঁঠাল—গোঁফে তেল।

বিজিত এখন হকার মহলে একটা প্রিয়নাম। হকার সমিতির একজন কর্মকর্তা, তার ব্যাবসাও ভালই চলছে এরমধ্যে ফুটপাতে দুখানা টেবিল পেতে সে দোকান দিয়েছে। বিজিত দোকানে দুজন ছেলেকে বসিয়ে এখনও নিজেই হকারি করে।

এদিকে সেই জননেতা কেশববাবুও দেখছেন বিজিতকে। ছেলেটা শিক্ষিত মার্জিত। আর হকার মহলে খুবই জনপ্রিয়। তাই এবার কেশববাবুও ভাবছেন বিজিতকে ওদিকের বাজারে একটা দোকান পাইয়ে দিতে পারলে ওকে হাতে আনা যাবে। এই অঞ্চলের হকারের কয়েক হাজার ভোট তাদের বাক্সেই আসবে, তাই কেশববাবুও এদিকে এলে বিজিতের সঙ্গে দেখা করেন। অবশ্য এখনও কথাটা বিজিতকে বলেন নি।

তবে বিজিতও নিজে চেষ্টা করছে যদি সে একটা ঘর ন্যায্য দামে পায়, তবে এই হকারি করতেও তার আর বাধেনা, সে এই জীবনকেও সহজে মেনে নিয়েছে।

সুজিত এবার ভালো টাকাই হাতে পেয়েছে। এখন দেখছে সুজিত অন্য এক নামী টিমের কর্মকর্তারাও তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে আসে বাড়িতে। সুজিত এখনও এই পুরোনো বাড়িতেই আছে, সেইসব কর্মকর্তারা—বলে,

—সুজিতবাবু, আমাদের টিমে আসুন, পনেরো লাখ টাকা দেব বছরে।

সুজিত কথাটা ভাবছে, সেই কর্মকর্তা বলে,

—এ পুরোনো বাড়ি ছেড়ে চলুন শহরের দিকে নতুন ফ্ল্যাটে।

সুজিত কিছু সংস্কার মানে। সে বলে,

—এই বাড়িই আমার কাছে পয়মন্ত, এখান থেকেই উঠেছি, কাছেই ঠনঠনিয়া কালী মন্দির। রোজ প্রণাম করি, এপাড়া ছেড়ে যাবো না।

সেই কর্মকর্তা বলে,

—তাহলে বাড়িওয়ালার সঙ্গে কথা বলুন, এ-বাড়ি আমাকে বিক্রি করে দিক সে। আমরাই এবাড়ি আপনাকে কিনে দোব। তারপর এখানেই দোতলা তুলে দিন, খরচ খরচা সব আমাদের।

সুজিতের কাছে এখন ভালো টাকা আছে, সেও এর মধ্যে বাড়িওয়ালার সঙ্গে কথাও বলেছে। বাড়িওয়ালাও পুরোনো বাড়ির জন্য ভালো দাম পেলে ছেড়ে দেবে, সুজিত বলে,

—কথাটা ভেবে দেখি।

এসব খবর গোপন হলেও গোপন থাকে না। বিপুলবাবুর লোকজন চর অনুচর এখানেও ঘোরা ফেরা করে। তারাও দেখছে অন্য ক্লাবের কর্মকর্তাদের এখানে আসা যাওয়াটা, আর সেই ভক্তরাও বেঙ্গল টিমের সমর্থক। ফলে বিপুলবাবুর কানেও পৌছায় এসব কথা।

ওদিকে ইন্ডিয়ান লীগ শুরু হয়েছে, সামনে বেঙ্গল টিমের খেলা এ সময় যদি সুজিত এটিম ছেড়ে যায় বেশি টাকার জন্য তাহলে বেঙ্গল টিমের বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্নও ছুটে যাবে। তাই খববরটা পেয়েই বিপুলবাবু আরও দু-একজন কর্মকর্তা এসে পড়েন নরেশবাবুর বাড়িতে।

ওদের জরুরি মিটিংও বসে। নরেশবাবু বলেন,

—সেকি সুজিতের বাড়িতে গিয়ে ওরা এইসব কথা বলছে,

বিপুল বলে,

—তাইতো শুনলাম। টাকার লোভও বড় লোভ স্যার। যদি সুজিত টোপ গিলে ফেলে আমাদের সবকিছু চোপাট হয়ে যাবে। তাই ওকে আটকাবার ব্যবস্থাও করতে হবে।

কথাটা নরেশবাবুও ভাবছেন, সুজিতকে হাতছাড়া করা যাবে না। ওর জন্য এশিয়ান কাপ এসেছে, বিপুল বলে,

—সুজিতের তেমন চাকরি তো নেই। খেলার উপরই ভরসা। ছেলেটা তো বি.এ. পাশ করেছে, ওকে যদি একটা ভালো কাজে দেন আপনার কারখানায় তাহলে কিছুটা হাতে থাকবে, খেলার টাকা চাকরির টাকায় কম আয় হবে না।

নরেশবাবু বলেন,

—কথাটা মন্দ বলোনি, চাকরি দিয়ে ওকে হাতে রাখতে হবে, আমি ভেবে দেখছি।

—যা ভাবার একটু তাড়াতাড়ি করুন স্যার। কলকাতার অন্য নামী ক্লাব—শুনছি গোয়ার মুম্বাই-এর দুটো ক্লাবও ওকে নিয়ে টানা টানি শুরু করেছে।

নিবেদিতা এই কথাটা অনেকদিন ধরে ভাবছে। সে এবার ঘর বাঁধার স্বপ্নই দেখে সুজিতকে নিয়ে। সুজিতও সেদিন নিবেদিতাকে নিয়ে কোনও পার্টিতে গেছে। নিবেদিতার মা কল্যাণীও ভেবেছে মেয়ের কথা, মেয়েকে নরেশবাবু লেখাপড়া শেখাবার অনেক

চেষ্টাই করেছেন, ধনীর মেয়ে বাড়িতে টিউটর রেখেছিলেন। কিন্তু মেয়ের পড়ার চাইতে খেলার দিকেই ঝোঁক বেশি। বাবার সঙ্গে মাঠে গিয়ে ফুটবলের প্রেমে পড়ল।

নরেশবাবু ভেবেছিলেন মেয়েকে অন্ততঃ অফিসের কাজে লাগাবেন। কিন্তু সেদিকেও গেলনা নিবেদিতা, ফলে তাকে নিয়ে এ বাড়িতে একটা সমস্যা তৈরি হল। ওর মা কল্যাণী বললে,

—মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা কর। এমনিতে যা খামখেয়ালী মেয়ে। কোনও কিছুতেই ওর স্থির নেই।

নরেশবাবু অবশ্য ওর জন্য কোনও ভালোছেলের খোঁজ করছিলেন, কল্যাণী বলে,

—যা জেদী মেয়ে। ওর জন্য সাবধানে পাত্র খোঁজ করবে। সবদিক খোঁজখবর করে, যা খেয়ালী মেয়ে তোমার।

—তা সত্যি, কিন্তু বিয়ে তো দিতেই হবে,

—কোনও সাধারণ ঘরের ছেলে পাও তো দ্যাখো,

—সাধারণ একটা ছেলের সাথে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে? পাঁচজন কি বলবে তা ভাবছো?

—আরে বাবা তোমার মেয়েকে বিয়ের পর তো সে আর গরিব থাকবেনা। যদি ভালো ছেলে হয়—তাকে কারখানা না হয় অফিসে বসিয়ে দেব। আর খোঁজ-খবর করলে এমন ছেলের অভাব হবে না।

নরেশবাবু এমন ছেলের খোঁজ করছেন। ওদিকে কল্যাণীও ভাবছে। এমন দিনে নিবেদিতাই মাকে কথাটা বলে। সেদিন রাতে ডিনারের পর কল্যাণী বসার ঘরে টিভি দেখছে, বেশ জমাট একটা সিরিয়াল হয় এই সময়। কল্যাণী তাতেই মগ্ন, নিবেদিতাকে কাছে এসে বসতে দেখে চাইল। কল্যাণী বলে,

—তোর বাবা তো তোর বিয়ের কথা ভাবছে, ভালো ছেলের খোঁজ করছে। তুই বাপু আবার জেদ করে সবকিছু ভেস্তে দিসনা।

নিবেদিতাও এবার তার সিদ্ধান্তের কথাটা মাকে জানায়।

—তার জন্য তোমাদের ব্যস্ত হতে হবে না, মা।

কল্যাণী মেয়ের দিকে চেয়ে বলে,

—কেন?

—আমার বিয়ের ব্যাপারে আমি একটা ডিসিশন নিয়ে ফেলেছি।

—তুই আবার কি ডিসিশন নিয়েছিস? এইসব খামখেয়ালীপনা ছাড়। যা বলি শোন—

—বলেছি তো মা। আমি ঠিক করেছি সুজিতকেই বিয়ে করবো, তারও অমত নেই।

কল্যাণী অবাক হয়। খেলাধূলার ব্যাপারে তার কোনও আগ্রহ নেই বরং ওইসব হই-হল্লা সে অপছন্দ করে, বলে,

—সেকি শেষে ওই খেলোয়াড়টাকে বিয়ে করবি?

—হ্যাঁ-মা। বাবাকেও তুমি জানিয়ে দিতে পার। সুজিতকে আমি দেখছি। ছেলে

হিসাবে ও ভালোই। আমার মতটাও জানিয়ে গেলাম।

নিবেদিতা চলে যায়। এবার ভাবনায় পড়ে কল্যাণী, নিবেদিতা যে সুজিতের মত একটা ছেলেকে স্বীকার করে নেবে এটা ভাবতেও পারেনি।

নরেশবাবু এরমধ্যে খবর পেয়েছেন। যে সুজিতের বাড়িতেও অন্য দু-একটা ক্লাবের কর্মকর্তারা যাচ্ছেন, মুম্বাই-গোয়ার টিমও কলকাতায় লোক পাঠিয়েছে। তারাও চেষ্টা করছে সুজিত কে যেকোন মূল্যে পেতে। আর ওরা জানে সুজিতকে পাওয়া মানে ওর সাথে আর ও দু-তিনটে প্লেয়ারকে পাওয়া। ফলে বেঙ্গল টিমের স্বপ্ন হারিয়ে যাবে।

নরেশবাবুও ভাবছেন কিভাবে সুজিতকে আটকে রাখা যায়। ইন্ডিয়া লীগ খেলবে। বিশ্বকাপ প্রস্তুতি ম্যাচে যাবে এই সুযোগ তিনি হাতছাড়া করতে চান না। তাই কল্যাণীর কথা শুনে নরেশবাবু ও যেন একটা পথ পায় এবার। কল্যাণী বলে।

—নিবেদিতা তো সুজিত কে বিয়ে করার কথা ভাবছে। সুজিতেরও অমত নেই তোমার জেদী মেয়ের কথা শুনে আমি ভাবছি শেষে ওই সুজিতের সঙ্গে.....

—নিবেদিতা এই সব বলেছে,

—হ্যাঁ। কিন্তু—

কল্যাণীর কথা থামিয়ে নরেশবাবু বলে,

—আবার কিন্তু কেন? মেয়ে যখন বলছে তখন একটু ভেবে দ্যাখো কথাটা আমিও ভাবি। তারপর যা হয় করা যাবে।

নরেশবাবুও ভেবেছেন কথাটা। আর বিপুলবাবু পরদিন সকালে আসতেই তাকেও কথাটা বলেন নরেশবাবু।

—কি করা যায় বলো তো বিপুল। নিবেদিতা সুজিতকে বিয়ে করতে চায়। তাই ভাবছি—

—এতে আর ভাবার কি আছে স্যার। এতে এক ঢিলে দুইপাখি মারা হবে, নিবেদিতাকে বিয়ে করলে সুজিত আমার জামাই হবে। তখন আর অন্য টিমে ওর যাবার প্রশ্ন উঠবে না। নিবেদিতাই আটকাবে।

—তা সত্যি, কিন্তু সাধারণ একটা ছেলে শুনেছি বাড়ি ঘরের অবস্থাও তেমন নয়।

—আপনার মতো লোকের জামাই হলে তখন ওর আর কোনও ভাবনা থাকবে না। ছেলেটা বি. এ পাশ করেছে। ওকে কারখানায় ইয়ে মানে রাখুন—লেবার ওয়েল ফেয়ার অফিসারই করে দিন। বাংলো-গাড়ি-মোটা মাইনে সব পাবে। আর জান লড়িয়ে খেলবে, আমাদের ক্লাব। সুজিতকে এই বিয়েটা দিয়ে আটকান।

নরেশবাবুও কথাটা ভাবছেন। তিনিও অমত করার কিছুই পান না। নিবেদিতা শুনেছে বাবার কথা। বাবাও তাদের বিয়েতে মত দিয়েছে। মায়েরও অমত নেই। অনিমেষ খবরটা শুনে হতাশ হয়। সেদিন সকালে চায়ের টেবিলে নরেশবাবুই অনিমেষকে কথাটা জানান। কল্যাণীও রয়েছে। অনিমেষ এখন ব্যাবসার কাজে ব্যস্ত। প্রায়ই তাকে বাইরে যেতে হচ্ছে। তাই অনিমেষও সংসারের কোনও ব্যাপারে বিশেষ নাক গলায় না। সে যেন এই সংসারের বাইরের লোক।

কিন্তু নিবেদিতার এই ভালোবাসার খেলাটাকে সহ্য করতে পারেনি। নিবেদিতা যে এত সহজে আবার সুজিতকে এই ভাবে মেনে নিতে পারবে তা ভাবেনি অনিমেষ। মনে হয় নিবেদিতা হয়তো ভুলই করেছে।

অনিমেষ বলে,

—নিবেদিতা বিয়ে করবে সুজিতকে ?

নরেশবাবু বলেন,

—কেন ? সুজিত কি খারাপ ছেলে ? —সে এখন অল ইন্ডিয়া প্লেয়ার। আর এবার ওকে আমাদের কারখানার লেবার ওয়েল ফেয়ার অফিসার করবো।

অনিমেষ বুঝতে পেরেছে তার বাবা এবিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছে। কল্যাণীও বলে।

—ভালো চাকরি, গাড়ি-বাংলো, ভালো মাইনেও পাবে সুজিত, নিবেদিতা যা জেদী মেয়ে। এরকম ছেলে ওর পক্ষে ভালোই। নিবেদিতার কনট্রোলে থাকবে সুজিত।

অনিমেষ ওদের কথা শোনে, বেশ বুঝেছে তার বাবা-মা নিবেদিতার এই প্রস্তাবে রাজী হয়েছে। তাই সেও কথা না বাড়িয়ে বলে,

—তোমরা যখন ঠিক করেছ তখন আমি অমত করবো কেন? যা ভাল বুঝেছ তোমরাই করো। উঠি বাবা—আমার বাইরে কটা ফ্যাক্স করতে হবে।

বিজিতের মতো ছেলেদের সত্যিই আজকের সমাজে কেউ চিনল না। সমস্ত ভাবনাগুলোকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে নিজের কাজে মন দিতে চায় অনিমেষ। তবু বিজিতের কথাটা ভুলতে পারেনা। ওরা কি সব হারিয়ে যাবে? ওরা কি শুধু দিয়েই যাবে? পাবে না কিছুই?

নিবেদিতা সেদিন ক্লাব থেকে সুজিতকে নিয়ে বের হয়েছে গাড়িতে। সুজিতকে নিয়ে তাদের বাগানে আসে। সন্ধ্যার আকাশে তখন চাঁদের আলোর চিহ্ন প্রকাশ পাচ্ছে। বাতাসে বাতাবিলেবু ফুলের সৌরভ অস্থির হয়ে উঠেছে। সুজিত আজ যেন জীবনের এক পরম পাওয়ার সন্ধান পেয়েছে। সামান্য একটা ছেলে, আজ অদৃষ্ট তাকে নাম, খ্যাতি, অর্থ সবই দিয়েছে আর দিয়েছে একটা মেয়ের ভালোবাসা। নিবেদিতা এবার আসবে তার জীবনে। নিবেদিতা বলে,

—বাবা-মাও মত দিয়েছেন। হয়তো তোমার বাবার কাছেও যাবে। কথা বলতে। হাজার হোক পাত্রের বাবা-মা।

সুজিত বলে,

—সত্যি, এ যে আমি ভাবতেই পারছিনা নিবেদিতা।

—জীবনে অনেক কিছুই অপ্রত্যাশিত ভাবেই ঘটে তার হিসাব ও মেলে না সুজিত, বাবা তোমায় কারখানার লেবার অফিসার করতে চান তবে এক শর্তে।

—কি শর্ত?

—এবার জাতীয় লীগ চ্যাম্পিয়ন হতে হবেই। আর বিশ্বকাপও খেলতে হবে টিমকে, এটা বাবার শর্ত একার শর্ত নয় আমার তোমার কাছে একান্ত চাওয়া।

—এ আমাকে পারতেই হবে নিবেদিতা। আর তুমি পাশে থাকলে আমি নিশ্চয়ই পারবো।

—আমি তোমায় জয়ী দেখতে চাই সুজিত। নিবেদিতা ওকে কাছে টেনে নেয়।

নিবেদিতা স্বপ্ন নিয়ে ফিরছে বাড়িতে। হঠাৎ অনিমেষের ডাক শুনে চাইল। অনিমেষ ওদিকের লনে একাই বসে আছে। নিবেদিতা ওদিকে সুজিতের সঙ্গে কথা বলে তাকে বিদায় দিয়ে ফিরছে সেটা দেখেছে অনিমেষ।

অনিমেষ বলে,

—তাহলে সুজিতকেই বিয়ের মনস্থ করলি?

নিবেদিতা ওর কথার স্বরে বুঝেছে যে এই ব্যাপারে অনিমেষ খুশি হতে পারেনি। আর কেন পারেনি তাও জানে নিবেদিতা। বলে সে—তুই খুব খুশি হোসনি তা বুঝেছি দাদা। আর কেন হোসনি তাও জানি। তোর ওই আদর্শবান প্রতিবাদী সৎ বন্ধুকে মেনে নিতে পারিনি। তাই সুজিতকেই বেছে নিয়েছি। তোর বন্ধু তোকে এনিয়ে কিছু বলেছে নাকি?

—বিজিতের সেই মানসিকতা নেই। জীবনে সে কিছুই পেতে চায়নি।

—একেবারে মহাপুরুষ—নিবেদিতা ব্যঙ্গ করে বলে,

—মহাপুরুষ কিনা জানিনা—তবে লোভী কাপুরুষ নয়। তাকে চেনার চোখও তোর নেই। থাকলে কাঞ্চন ফেলে কাঁচ নিয়ে খুশি হতে চাইতিস না। আর তোর এই মোহ একদিন ভাঙবে।

অনিমেষ চলে যায় নিবেদিতার মুখের উপর কথাগুলো বলে। নিবেদিতা দাদার এসব কথার কোনও দামই দেয়না। বিজিত এখন তার দোকান নিয়েই ব্যস্ত। এর মধ্যে নতুন গড়ে ওঠা বাজারে একটা দোকানের জন্য সে-ও দরখাস্ত করেছে। এখন তার ফুটপাতের দোকানও বেশ জমে উঠেছে। এই অঞ্চলের হকারবাহিনীও বিজিতের মতো একজন ছেলেকে পেয়ে খুশি। তাদের দোকানের দরখাস্তগুলো নিয়েও তদ্বির করছে বিজিত। নতুন বাজার কমিটিও চায় প্রকৃত হকারদেরই দোকান ঘর দিতে।

বিজিতও তাই নিয়ে ব্যস্ত। আজও তাদের কি একটা জরুরি মিটিং আছে এই সব নিয়ে। তাই বাড়ি ফিরতে পারেনি। ফিরেছে সেই রাতে এসব হাঙ্গামা চুকিয়ে। বাড়িতে ভবেশবাবু খবরটা শুনে অবাক হয়। সুজিতই তার মাকে বলে তার বিয়ের কথা, আর বিয়ে করলে যে ভালো চাকরি পাবে সেই কথা ও জানাতে ভবেশবাবু বলেন,

—এতবড় ঘরে বিয়ে করবি? বড়লোকের মেয়ে অন্যভাবে মানুষ হয়েছে অন্য পরিবেশে, সে কি এসে আমাদের ঘরে আমাদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবে?

সুজিত বলে,

—বাড়িওয়ালার সঙ্গে কথা বলেছি বাবা। তিনি টাকা পেলে এই—বাড়ি আমাদের বিক্রি করে দেবেন, তখন এটাকে দোতলা করে নেব। সাবিত্রী ওর কথা শুনছিল। এখন সুজিতের খুব নাম-ডাক। খেলার জন্য লাখ লাখ টাকা পায়। বিজিত এত পড়াশোনা করেও তেমন কিছু করতে পারেনি। আর ভবেশবাবুরও করার কিছুই ছিলনা। চিরকাল ভাড়া বাড়িতেই পড়ে থাকতে হয়েছে।

এবার বাড়ি কিনে দোতলা করার কথায় সাবিত্রী বলে,

—তাই কর বাবা। চিরকাল কি ভাড়া বাড়িতে পড়ে থাকতে হবে? নিজেদের একটু ভিটে মাটি হোক।

ভবেশবাবু বলে,

—কিন্তু বড় ভাই থাকতে ছোট ভাই-এর বিয়ে হবে।

—কি করে তোমার বড় ছেলে? সে তো অকম্মা সামান্য একটা চাকরি করে। আর সুজিত, সুজিত আমার সোনার টুকরো ছেলে। সারা দেশে কত নাম-ডাক। খবরের কাগজে কত ছবি ছাপা হয়। ওকে মেয়ে দেবার জন্য কত আচ্ছা আচ্ছা লোক আসবে।

সুজিত বলে,

—আসবে নয় মা—তারা আজই তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে আসবেন।

—ওমা, তাই নাকি। ওগো তুমি বাপু বিকেলে একটু সাফ সুতরো হয়ে থাকবে। আমি ঘর-দোর বসার খাটটা সাফ সুতরো করছি। কত বড় লোকরা আসবেন, ওরে সুজিত তুই বাবা কিছু ভালো সন্দেশ আর ঠান্ডা কিসব আছে তাই আন।

ভবেশবাবুকে আবার সাবধান করে সাবিত্রী,

—ওদের সামনে বড় ছেলের কথা একদম বলবে না। ওরা যা বলে শুনে যাবে। মাস্টারি ফলাতে যেয়ো না।

ভবেশবাবু নীরবে স্ত্রীর কথা শোনেন। আজ প্রয়োজন হলে ওরা বিজিতের মতো সন্তানকে ভুলেও যেতে পারে। নিজেদের স্বার্থে। সুজিত বলে,

—মা তুমি এদিকটা দ্যাখো। খাবার কোল্ড ড্রিংকস এসব আমি এনে রাখব।

সাবিত্রী বলে।

—আর কলেজ স্ট্রিট মার্কেট থেকে কিছু রজনীগন্ধার ইসটিকও আনবি। আমি ফুলদানিটা বের করে দিচ্ছি সাজিয়ে রাখবি।

ভবেশ বাবু বলেন,

—কিছু ফুল দিয়ে অন্তর মনের এতবড় দৈন্য তাকে কি ঢাকা যায়? বড়বউ, যায় না।

—আবার ওই মাস্টারি, তুমি দয়া করে এবার থামো তো।

বিকেলে নরেশবাবু, কল্যাণীরা এসেছেন। অবশ্য নিয়ম রক্ষার জন্যই আসা। সাবিত্রী এরমধ্যে যতটা পেরেছে ঘরদোর সাফ করেছে। ভবেশবাবুকেও পাটভাঙা জামা কাপড় পরতে হয়েছে নরেশবাবু বলেন,

—সুজিতকে আমাদের পছন্দ, তাই আপনাদের সঙ্গে এই সম্পর্ক গড়তে চাই। অবশ্য ওর ভালে হবে এতে।

সাবিত্রী বলে,

—আপনাদের কথাতে তো অমত করতে পারেনা। সুজিতেরও সৌভাগ্য নরেশবাবু শুভদিনও ঠিক করে দেন। মাসখানের মধ্যে তারা শুভকাজটা সেরে নিতে চান। ভবেশবাবু সারাক্ষণ চুপ করেই থাকেন। তার মনে কেমন যেন একটা আতঙ্কের ছায়া নেমে আসে।

সাবিত্রী চেয়েছিল দেনাপাওনার ব্যাপারটা জানতে। ভবেশবাবু ওদিকেই জান না।

সুজিত মাকে আড়ালে বলে,

—ওসব নিয়ে তুমি ভেবনা মা।

তাই মাসখানের মধ্যে বিয়ের কথা উঠতে সাবিত্রী বলে,

—বিয়ের উদ্যোগে আয়োজন আছে। বাড়িঘরও রং করতে হবে নরেশবাবু বলেন,

—আমাদের ম্যানেজার বাবুকে কাল আপনাদের বাড়িতে পাঠাব। উনিই ওসব কিছুর ব্যবস্থা করবেন, আপনাদের ভাবতে হবে না।

ওরা কথাবার্তা শেষ করে বিশাল একটা গাড়িতে উঠে বের হয়ে গেলেন। পাড়ার লোকও এবার খবর পায় সুজিত রাজকন্যার সাথে এবার অর্ধেক রাজত্বও পাচ্ছে। খবর পেয়েছে শিখা-অর্ক। তারা এখন শহরের অন্যদিকে নিজেদের ফ্ল্যাটে থাকে। অর্ক এখন তার থিসিস আর কলেজ নিয়েই ব্যস্ত। শিখাও বি.এ. পরীক্ষা দিয়েছে। সাবিত্রীই ফোন করে ওদের বলে,

—সুজিতের বিয়ের ঠিক হয়ে গেল হঠাৎ। বিরাট কারখানার মালিক নরেশবাবু। সুজিতকে পছন্দ করে তার মেয়ের সাথে বিয়ে দিচ্ছেন। সামনের সাত তারিখে বিয়ে। এরমধ্যে তোরা একবার আয়।

শিখা প্রথমে সুজিতের বিয়ের কথা শুনে একটু অবাক হয়। মাকে কিছু বলেনা। কারণ সুজিতের চরিত্র সে ভালো রকমই চেনে। ও যা করে নিজের জন্যই করে, এসব বিয়ের ব্যাপারটা সুজিত নিজের জন্যই করেছে। তবে দাদা থাকতে ছোট ভাই-এর বিয়েতে শিখার আপত্তি।

অর্ক পাশের ঘরে লেখাপড়ার কাজ করছিল, শিখা তাকে খবরটা দিতে অর্ক একটু অবাক হয়। আজ তিনবন্ধু প্রত্যেকের কাজ নিয়ে একটু দূরে সরে গেছে। তবু তাদের সেই প্রীতির বন্ধন অটুট রয়েছে।

অর্ক জানতো নিবেদিতা আর বিজিতের মেলামেশার খবরটা। তারপর বিজিতকে দূরে সরিয়ে দেয় নিবেদিতা। কিন্তু আজ সুজিতের সঙ্গে নিবেদিতার বিয়ের কথাটা শুনে চমকে ওঠে অর্ক।

—নিবেদিতা বড়লোকের মেয়ে। এসবের কোনও দামই নেই ওর কাছে। তবু এত সহজে নিবেদিতা এই সিদ্ধান্ত নিতে পারলো কি করে তাই ভাবছে।

শিখাও দাদার কথা ভাবছে। সে এক বিচিত্র মানুষ। জগতের কোনও কিছুতেই যেন তার নিজের কোনও দাবী নেই। সে নিজে কিছু পেতে চায় না বরং দিতেই চায়। শিখা বলে,

—এ ভালোই হয়েছে। দাদার মতো দোদুল্যমান মানুষ নিবেদিতাকে নিয়ে সুখী হতে পারতো না। নিবেদিতা আত্মসর্ব্বস্ব-স্বার্থপর মেয়ে-সুজিতও অমনি। দুজনে মিলবে ভালো।

অর্ক বলে,

—কে জানে? তেলে জলে মিশ খায়না শিখা। সুজিত তাই করতে চায়। আমার কিন্তু ভালো ঠেকছে না।

শিখা বলে,

—ওদের এসব বলে কোনও লাভ নেই। যাবো বিয়েতে নেমন্তন্ন খেয়ে চলে আসবো। আর বড়দাকে বলবো—পারিস তবে ওই বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যা, ওরা তোকে কোনদিন চিনল না। চিনবেও না। তুই সব দিয়ে যাবি আর বদলে পাবি শুধু শুধু দুঃখই।

বিজিত ওদের মিটিং-এ নানা আলোচনা সেরে ফিরছে বাড়িতে। ওই ফেরার সময় কাঁচা বাজারটা করে আসে। এই সন্ধ্যার পর ফড়েরাও সপ্তায় আনাজপত্র বেচে দিয়ে বাড়ি চলে যায়। তাই বেশ কিছু লোক রাতে বাজার করে। বিজিতও ফেরার পথে বাজার করে। বাবা এখন আসতে পারেনা, আজ অবশ্য বিজিতের মনটা খুশি। তাদের হকার সমিতির এতদিনের লড়াই এবার সার্থক হতে চলেছে। বাজার কমিটি তাদের দাবি মেনে নিয়েছে। তারা এবার বাজার তৈরি হলে দোকান ঘরও পাবে। আর রোদে জলে পথে বসে ফেরি করতে হবে না জিনিসপত্র।

বিজিত বাড়িতে ঢুকে দেখে বাড়িটার হাল কেমন বদলে গেছে। বসার ঘরে সোফার নতুন কভার ফুলদানিতে বেশ কিছু টাটকা রজনীগন্ধা ফুল। সুজিত নেই। ভবেশ বাবু গম্ভীর হয়ে বসে আছেন। বিজিত বাজারের থলে নামিয়ে বলে।

—হাত-মুখ ধুয়ে আসছি মা—বাবার খাওয়া হয়েছে?

—হ্যাঁ।

—তাহলে আমাকে দিয়ে দাও। সুজিত কখন ফিরবে বলে গেছে।

সাবিত্রী বলে,

—গেছে কোথায়, তুই বোস।

বিজিতকে খেতে দেয় সাবিত্রী। এবার সাবিত্রী বলে,

—সুজিতের বিয়ের ঠিক হয়ে গেল রে।

—তাই নাকি। বিজিত একটু অবাকই হয়। অবশ্য এখন সুজিত নাম-ডাক করেছে তার পক্ষে বিয়ে করা কঠিন কাজ নয়।

সাবিত্রী বলে,

—ওই যে নরেশবাবু। বিরাট কারখানার মালিক কোনও ফুটবল ক্লাবের কর্মকর্তা।

বিজিত নরেশবাবুকে ভালোই চেনে, সাবিত্রী বলে,

—উনি নিজে এসেছিলেন ওর মেয়ের সঙ্গে বিয়ের ঠিক করে গেলেন। এত বড় লোক যেচে এলো— আর সুজিতেরও মত আছে—তাই আমি অমত করতে পারিনি বাবা। বিয়েতে মত দিলাম। সামনের সাত তারিখে বিয়ে।

বিজিত চমকে ওঠে। নিবেদিতার কথা মনে পড়ে। অবশ্য বিজিত নিজেই ওইসব স্বপ্নকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। টাকার কাছে ওদের ঔদ্ধত্যর কাছে নিজেকে বিক্রি করে দিতে পারেনি। তাই বের হয়ে এসেছে ওই রাজপ্রাসাদ ছেড়ে রুক্ষ কঠিন জীবন সংগ্রামের পথে।

তার কাছে জীবনের সংজ্ঞাটা আলাদা। সে পথের ধারে তার সর্ব্বস্ব ছিটিয়ে দিতে চায়। আর অনেকে সেই ছিন্ন ফুলদলকে কুড়িয়ে নিজেদের সঞ্চয় বাড়াতে চায়। তাদের

পাবার ব্যাকুলতাকে মেটাতে চায়। বিজিতের মনের কোণে ক্ষণিকের জন্য একটা হতাশার ছায়া ঘনিয়ে আসে। কিন্তু কঠিন বাস্তবকে সে মেনে নিয়েছে। কঠিন বঞ্চনার জগতে সে থেকে এসবের ঊর্ধ্বে থাকে সে। তাই বলে,

—এতো খুব ভালো কথা মা। উনিতো অনিমেষের বাবা। ভালোই হল অনিমেষদের সঙ্গে একটা সম্পর্ক হবে। সুজিতেরও ভাগ্য বদলাবে। এ বাড়ির হালও বদলাবে।

ভবেশবাবু বলেন,

—তা বদলাবে। সুজিত নাকি বাড়িওয়ালার সঙ্গে কথা বলেছে। সে-ও নাকি এ বাড়ি সুজিতকে বিক্রি করে দেবে। সুজিত এটাকে দোতলা করবে।

—তাই! তবে তো ভালো কথা, এতদিন পর নিজেদের বাড়ি হবে।

—হ্যা, সুজিতের বাড়ি হবে। তার ইচ্ছা হলে থাকতে দেবে না হলে এই বুড়ো বয়সে কোথায় যে যেতে হবে জানে না।

সাবিত্রী বলে,

—তোমার যতসব বিদ্‌ঘুটে কথা, ছেলের বাড়িতে থাকবে তাতে কি!

—এ বাড়িটা তোমার ছেলের একার নয়। বৌমারও — আজকাল মানুষের উপরও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। দুনিয়াটা কেমন যেন বদলে যাচ্ছে। তাল মেলাতে পারছিনা। সাবিত্রী বলে,

—তোর বাবার কথাবার্তা ওখানেই। ভীমরতি হয়েছে—যেতে দে সব কথা আর সময় নেই—বিয়ের উদ্যোগ আয়োজন কাজ কর্ম সব করতে হবে।

সুজিতেরও সময় নেই—নতুন চাকরিতে ঢুকবে তাই ট্রেনিং নিতে হচ্ছে খুব ব্যস্ত। তোর বাবার তো ওই হাল। কি করবো দিশা পাচ্ছিনা। তুই যা হয় কর।

বিজিত বলে,

—এনিয়ে তুমি ভেবনা মা। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। দেখবে সুজিতের বিয়ে ধূমধাম করেই হবে।

—তাই যেন হয় বাবা।

অনিমেষ এখন খুবই ব্যস্ত। এরমধ্যে বিদেশ যেতে হয়েছিল কয়েকদিনের জন্য। বিজিতের সঙ্গে অনেকদিন দেখা নাই। অনিমেষ দেখে বাড়িতে মা-বাবা এখন নিবেদিতার বিয়ে নিয়েই ব্যস্ত। দুজনে মাঝে মাঝে বের হচ্ছে।

সুজিতও এখন নতুন চাকরির ট্রেনিং নিচ্ছে। ওদিকে মাঠেও প্র্যাকটিস করতে হচ্ছে। কিছুদিন পর আবার জাতীয় লীগের খেলা শুরু হবে। তার মধ্যেই ওদের বিয়েটা চুকিয়ে ফেলতে হবে। তাই এত ব্যস্ততা, অনিমেষের এসব ভালো লাগে না। সে এখন বিদেশেই বিরাট একটা প্রতিষ্ঠান গড়তে চায়, তার জন্য নিউ ইয়র্ক যেতে হবে।

সেদিন নরেশবাবুরা মার্কেটিং সেরে ফিরছেন, অনিমেষ বলে,

—বাবা ভাবছি এবার নিউইয়র্কে আমাদের আর নিউ জার্সিতে কারখানা চালু করতে হবে। তাই যাওয়া দরকার। ভাবছি সামনের সপ্তাহে চলে যাই। কল্যাণী বলে,

—বাইরে যেতে হয় যাবি, তার আগে একমাত্র বোন এর বিয়েটা চুকিয়ে যা।

তুই বিয়েতে না থাকলেও দুঃখ পাবে। পাঁচজনে কি বলবে?

নরেশবাবু বলেন,

—তাই ভালো বিয়ের পরই যাবি।

আনিমেষ বাবা-মায়ের কথার অবাধ্য হতে পারে না। তাই ভালো না লাগলেও থাকতে হয় তাকে। বিজিত এ-বাড়িতে আর বিশেষ আসে না। তবু সেদিন বিয়ের কি উদ্যোগের ব্যাপারেই মা ওকে নরেশবাবুর কাছে আলোচনার জন্য পাঠায়। নরেশবাবুর সাথে কথা বলে বের হয় বিজিত। অনিমেষের ঘরে আলো জ্বলতে দেখে এগিয়ে যায় সে। হঠাৎ এসময় নিবেদিতা ওকে দেখে তাকায় বিজিত বলে,

—কেমন আছো!

ও যে এত কাণ্ডের পরও এখানে আসবে তা ভাবেনি, তাই নিবেদিতা বলে—এর পরেও এখানে এসেছ?

বিজিত বলে,

—মা, তোমার বাবার কাছে কটা কথা জানাতে পাঠিয়েছিলেন।

—ওসব তোমার বাহানা, ওতে কোনও লাভ হবে না।

চলে যায় নিবেদিতা বাড়ির ভিতরে। অনিমেষ এসে পড়ে সে-ও শুনেছে নিবেদিতার কথা। বিজিতকে দেখছে সে,

অনিমেষ-ই বলে,

—চল ভিতরে চল।

একটা মাস বাড়ির উপর দিয়ে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। সাবিত্রীও খুশি। সুজিত এই বাড়িটা কিনে নিয়েছে আর নরেশবাবুর কারখানার বিল্ডিং ডিপার্টমেন্ট থেকে লোকজন এসে বাড়ির দোতলার কাজও শুরু করেছে, সুজিতের সময় নেই। সে চাকরির ট্রেনিং খেলা এসব নিয়েই ব্যস্ত। কোম্পানির গাড়িতে যাতায়াত করে। এ বাড়ির জীবনে কোনও পরিবর্তন আসেনি। শুধু হইচই বেড়েছে। দোতলার কাজ চলছে রাতদিন। ছাদ ঢালাই-এর শুরু হয়েছে। বিজিতকেই তার কাজের ফাঁকে এসব দেখাশোনা করতে হয়। মেজেতে মার্বেল পাথর বসেছে। টয়লেটে আধুনিক বাথটাব—শাওয়ার বেসিন বসেছে, মেঝেতে দামি টাইলস, সাবিত্রী বলে,

—ওমা, এত হাঙ্গামা কি হবে, পা যে পিছলে যাবে।

ভবেশ বলে,

—তুমি একতলার সাবেকি বাথরুমেই যাবে। এটা সুজিতদের মতো করে করা ওদের পা পিছলালেও কিছু হবে না।

বাড়িটার হালই ফিরে গেছে। বেশ কিছুদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে সুজিতদের নিজেদের মহল তৈরি হয়ে গেল। ওদিকের ফাঁকা জায়গাতে উঠেছে গ্যারেজ। এ বাড়ির কৌলিন্যও বেড়ে গেছে। পুরোনো বাড়িটা রং করেছে। বাড়িতে চলেছে উৎসবের আয়োজন।

শিখা, অর্কও এসেছে এই বাড়িতে কয়েকদিনের জন্য। শিখাও বিয়ের উদ্যোগ আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বিজিতও ব্যস্ত, অর্কও দেখছে বিজিতকে। সে জানতো

বিজিত নিবেদিতার সম্পর্কের কথা।

আজ সেই সম্পর্কটাই বদলে যেতে বসেছে। বিজিতও এটাকে অতি সহজভাবেই মেনে নিয়েছে। অর্কও দেখে এই উৎসবের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে চলেছে। বিজিত হাসিখুশি। বিয়েতে কি কি মেনু হবে। বরযাত্রীরা কোথায় বসবে। আলোর কি ব্যবস্থা হবে। এসব নিয়ে বিজিত ব্যস্ত। তার মনের একটা শূন্যতাকে যেন বিজিত বাইরের হাসি খুশি দিয়েই ভুলে থাকতে চায়।

নদীর এককূল ভাঙ্গে অন্যকূল গড়ে, ওঠে নতুন চরভূমি। শস্যক্ষেত্র গড়ে ওঠে, ওঠে মানুষের ঘর। একদিকে এর শূন্যতা আর অন্যদিকে পূর্ণতা। সুজিতের টিমও এরমধ্যে জাতীয় লীগের মধ্যে উপরের পজিশনেই এসেছে। নরেশবাবুরাও আশা করেন এবার টিম লীগ চ্যাম্পিয়ন হতে পারবে, ওদিকে সুজিতকে হাতে রাখার জন্য একটা পদক্ষেপ নেন তিনি। কারখানায় এতদিন লেবার ওয়েল ফেয়ারের কাজে ট্রেনিং নিয়েছে সুজিত। তার জন্য আলাদা চেম্বারও তৈরি হয়েছে। ওদিকে এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিলডিং-এ। এয়ার কুলার মেশিন বসানো কার্পেট পাতা ঠান্ডা ঘরে বসে এবার সুজিত ঠান্ডা মাথায় কারখানায় কয়েক হাজার শ্রমিকের কল্যাণ করার কথাই ভাবছে।

বিপুলবাবুও এসেছে। নরেশবাবু মেয়ের বিয়ের আগেই সুজিতের পদমর্যাদা বাড়িয়ে যোগ্য সুপাত্র করে তুলে তবে তার হাতে মেয়েকে সম্প্রদান করবে। তাই আজই তাকে কারখানার ওই পদে অধিষ্ঠিত করতে চান। তাই নতুন লেবার অফিসারকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য—কারখানার শ্রমিকরা আয়োজন করেছে।

অবশ্য এসবই করা হয়েছে শ্রমিক কল্যাণ তহবিল থেকেই। সুজিতকে আজ শ্রমিকরা খুশি করে। নরেশবাবু ম্যানেজার অন্যরাও ছিল। এই উৎসবে অনিমেষ উপস্থিত থাকতে পারেনি। অবশ্য তার জরুরি কাজ ছিল এরমধ্যে তাকে এক্সপোর্ট লাইসেন্স এর জন্য দিল্লিতে যেতে হয়েছে।

অবশ্য কাজ সেরে সে ফিরতে পারতো। কিন্তু অনিমেষ এসব বিষয়ে তেমন আগ্রহ নেই। বিজিত এইসব হয়তো পেতো। কিন্তু সে অনায়াসে এই পাওয়াকেও তুচ্ছ করে আজ বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে তার লড়াই জারি রেখেছে।

নরেশবাবু অনিমেষকে প্রোগ্রাম শুনে বলেন,

—এদিন আসতে না পারো কিছু বলার নেই; তবে নিবেদিতার বিয়ের দিন কোনও কাজ রাখবে না। সেদিন তোমাকে থাকতেই হবে।

—কিন্তু লন্ডনে যেতে হবে।

—বিয়ের পরই ওসব প্রোগ্রাম করবে।

সুজিতের অভিষেক পর্ব সারা হয়ে গেল। এবার সে বিরাট কারখানার একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। গাড়িতে প্রায় যাতায়াত করে। বাড়ি ফেরে গাড়িতে, গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির যাবতীয় একবার ঘুরে দেখে। তখনও কয়েকটা ঘরে মার্বেল ঠিকমতো পালিশ হয়নি। ময়লা জমে রয়েছে। সুজিত বলে,

—কি কাজ দেখিস দাদা? মিস্ত্রী লেবাররা এই ভাবে ফাঁকি দেবে। এখনও পালিশ শেষ হল না।

বিজিত বলে,

—ওসব হয়ে যাবে। ভাবিস না।

—আর শোন, জানালায় দামী পর্দা দিবি। দেখিস ওর থেকে যেন আবার কাটমানি ঝাড়িস না।

ও বিজিতকে বিশ্বাস করতে পারে না। ভবেশবাবু সব কিছুই শোনেন। সুজিতের কথাবার্তা ইদানীং অভদ্র ধরনের হয়ে উঠেছে। ভবেশবাবু বলেন,

—ওই ভাবে কথা বলবে সুজিত তুই কিছু বলবি না? ওর সব অন্যায় মেনে নিবি?

বিজিত বলে,

—সামনে এত কাজ তাই চিন্তায় রয়েছে সুজিত। তাই হয়তো এসব কথা বলছে। এখন বাকি কাজ শেষ করে নিই।

নরেশবাবু তার একমাত্র মেয়ের বিয়েতে আয়োজনের কোনও ত্রুটি রাখেন নি। তার বাড়ির পিছনের লনে গড়ে উঠেছে সুন্দর সাজানো প্যানডেল। একদিকে আধুনিক ধরনের ছাদনাতলা। অতিথিদের বসার জন্য দামী সোফা—বিশাল কয়েকটা ঝাড়ের আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে আর সানাইয়ের সুর ওঠে তার সাথে।

বাইরে গাড়ির ভিড়—কত গাড়ি কত নামী লোকজন। যাদের পোশাকই তাদের আভিজাত্যের পরিচয়। অন্যদিকে বিশাল প্যানডেলে দামী খাবার সাজানো। অতিথি অভ্যাগতদের ভিড়ে ঠাসা সব প্যান্ডেল। অনিমেষও রয়েছে। এসেছে অর্ক ও বিজিত। ভবেশবাবু ও এসেছেন। তিনি দেখছেন আজ সমাজের উচ্চশ্রেণীর মানুষের ঐশ্বর্য প্রদর্শনী, মেয়েরা পরীর মত সেজে এসেছে। পরনে দামী পোশাক আর গহনার চলমান প্রদর্শনী চলছে।

আর পুরুষদের মধ্যে যেন মদ্যপানের প্রতিযোগিতা চলছে। ওদিকে সুন্দর বার কাউন্টার বসানো হয়েছে। দামী স্কচ হুইস্কির স্রোত বইছে। নামী-দামী লোকেদের এই ভাবে দেখে ভবেশবাবুও অবাক হন।

বিয়ের অনুষ্ঠান—ওদিকে পানভোজনের পর্ব চলেছে।

ভবেশবাবু হাঁপিয়ে ওঠেন। অসহ্য লাগে তার এই পরিবেশ। এখানে তার অসহায় একা লাগে। বিজিত, অর্ক, অনিমেষ ওদিকে কথা বলছে, বিজিত বলে,

—আবার কবে বাইরে যাচ্ছিস?

অনিমেষ আজকের ব্যাপারে মোটেই খুশি নয়। সে বলে,

—এ ব্যাপারে আমি প্রথম থেকেই থাকতে চাইনি। ওখানেও অনেক কাজ পড়ে আছে। উৎসব শেষ হলেই চলে যাবো দু-তিনদিনের মধ্যে; কারণটা কি জানিস?

বিজিত চাইল, অনিমেষ বলে,

—এসব অন্যপক্ষে আর কেউ সহজে মেনে নিলেও আমি মেনে নিতে পারছিনা। তাই এদেশ থেকে চলে যাবো। এখানে মানুষের কোনও দাম নেই। মনুষ্যত্বের কোন মর্যাদা নেই।

বিজিত বলে।

—হয়তো তাই। তোর চলে যাবার পথ আছে, যাদের নেই তাদের এই অন্যায়ের অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করে বেঁচে থাকা ছাড়া আর পথও নেই রে।

অনিমেষ বলে,

—আছে, যদি বিদেশ তুই নাম খ্যাতি পাস, তোর যোগ্যতার স্বীকৃতি পাস। সেদিন দেখবি এরাই তোর গলায় মালা দিয়ে তোকে বরণ করে নেবে। চেনে বিদেশীরা যখন তাকে চিনিয়ে দেয়। আর সেটাই আমি প্রমাণ করে দোব। তাই বিদেশে আমাকে যেতেই হবে।

অর্ক বলে,

—তা সত্যি, তাই বোধহয় বিজিত তোর এখানে এই লড়াই করেই ফুরিয়ে যেতে হবে, সবই তোর হারিয়ে যাবে।

ওদিকে বিয়ের অনুষ্ঠান চলছে। ঘর্মাক্ত কলেবরে ভবেশবাবু বিজিতদের দেখে এগিয়ে আসেন।

—তোরা এখানে। বিজিত আমাকে বাড়ি নিয়ে চল বাবা। এই ভিড় হই-হল্লা আর এ-পরিবেশে আমি হাঁপিয়ে উঠছি। একটু ফাঁকায় নিয়ে চল। এখানে দমবন্ধ হয়ে আসছে।

অনিমেষ বলে,

—তাই চলুন।

বিজিত বাবাকে বের করে আনে। অনিমেষও এসেছে সঙ্গে। সেই-ই বলে,

—আপনাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি চলুন।

ভবেশবাবু বলেন,

—আবার তুমি যাবে অনিমেষ। কাজের বাড়ি—

—এখানে আমার কোনও কাজই নেই চলুন।

ওরা ওই উৎসব মুখর পরিবেশের বাইরে আসে ওদের যেন কোনও ঠাঁইট নেই ওখানে। ওই উৎসবের আনন্দ ওদের কাউকে স্পর্শ করতে পারেনি।

অখিল ব্রজবাবুরা সেই চিটফান্ডের মামলাতে জড়িয়ে পড়েছিল। তার জন্য বেশ কিছুটা টাকা আর বেশ কিছুদিন কোর্ট কাছারিও করতে হয়েছে। বড় উকিল ব্যারিষ্টারও লাগিয়েছিল তারা, তাদের টাকার অভাব নেই। ওই চিটফান্ড—আরও অনেক দুনম্বরী ব্যাবসা করে তারা ভালো টাকাই রোজগার করেছিল ফলে সমাজের একটা মহলে তাদের নাম-ডাক প্রসার প্রতিপত্তি বেড়েছিল। অখিল আর ব্রজবাবু টাকার জোরেই আইনের ফাঁক-ফোকর বের করে ঠিক কাজ হাসিল করে নেয়।

তারা মুক্তি পেল কিন্তু প্রচুর লোক সর্বস্বান্ত হল। তারা আর জমা টাকার হদিসই পেল না। তারপর অবশ্য অখিল ব্রজবাবু বেশ কিছুদিন চুপচাপই রইল। টাকার অভাব তাদের নেই, হাতে এসে গেছে প্রচুর টাকা। আর তাদের কাছে রয়েছে লোক ঠকাবার মত অনেক বুদ্ধি। ফলে বেশ কিছুদিন চুপচাপ থাকার পর ওরা আবার ক্রমশ নিজেদের

কাজ কারবার ব্যাবসা শুরু করলো। আবহাওয়া থিতিয়ে গেছে। কোনও গোলমাল আর নেই। আর সমাজে এমন প্রতারণার ঘটনাগুলো লোকের গা সওয়া হয়ে যায়।

তাই অখিল-ব্রজদের মতো লোকেদের একটার পর একটা ব্যাবসাও আবার চালু হয়ে যায়। এসব ব্যাবসাতে তারা নিপুণ ও আর সমাজের বুকে বেশ কিছু অন্ধকারের জীবনেও এখন স্থায়ী ভাবে বাসা বেঁধেছে সংখ্যাতেও বেড়েছে কারণ প্রশাসনও তাদের ঠিক মজুত করতে পারেনা নানা কারণে। ওই অন্ধকার জগতের জীবদের তাদেরই গডফাদাররা আশ্রয় দেয়। ফলে ওই জীবরা আরামে প্রাচুর্যের মাঝে বাস করে। আর তাদের ঘাড়ে ভর করে একশ্রেণীর মানুষ সমাজে অর্থ প্রতিষ্ঠা সব লাভ করে বহাল তবিয়তে থাকে।

ব্রজবাবুরা বেশ কিছুদিন নানা চোরাই মাল-এর ব্যাবসা করে আবার বেশ ফুলে ফেঁপে উঠেছে, আর এই সঙ্গে শুরু হয়েছে সাট্টা খেলার ব্যাবসাও। শহরে ও তার বাইরে তাদের হাজার হাজার বুকি, পেনসিলর আছে, নানা শ্রেণীর মানুষই এখন অতি সহজে বেশ মোটা টাকা পেতে চায়। এরা সেই মোটা টাকা পাইয়ে দেবার লোভ দেখিয়ে লাখ লাখ মানুষেরা কাছ থেকে প্রতিদিন লাখ লাখ টাকা আদায় করে। সাট্টার নম্বর মিললে সামান্য কিছু দেয়। তবে সিংহভাগই লুটে নেয় তারা। এইভাবে প্রতিদিনই ওই ব্রজ এন্ড অখিল কোম্পানি লাখ লাখ টাকা রোজগার করে। এছাড়াও উঁচু সমাজের বহুলোক নানা ধরনের ফাটকাবাজিও খেলে,

বিশেষত ক্রিকেট খেলার উপর মোটা টাকার বাজি ধরে অনেকে, তার উপর জুয়া খেলা হয়। এর জন্য আধুনিক প্রযুক্তিও ব্যবহার করে তারা। আর লেনদেন হয় হুণ্ডিতে, শেয়ারে। বিদেশের পার্টিদের পেমেন্ট হয় ডলার ও পাউন্ডে। ব্রজ এবং অখিল দেখছে এরকম আন্তর্জাতিক লেনদেন করেও তাদের লাখলাখ টাকা লাভ থাকে বিনা মূলধনে। অবশ্য এ সমস্ত ব্যাপার ঘটে গোপনে।

প্রকাশ্যে ওদের অন্য অনেক ব্যাবসা আছে। ওসব লোক দেখানো ব্যাবসা। তার জন্য বড় অফিস বিল্ডিং ও কিনেছে তারা। অফিসকে সাজিয়েছেও কাজের অফিসের মতো। তাতে অর্ডার সাপ্লাই-এর্র কাজও কিছু করা হয়। ওসব ব্যাবসা তাদের বাইরের পরিচয় মাত্র আসল ব্যাবসা চলে ভিতরে গোপনে। সেখানে রয়েছে প্রচুর সেলফোন— কম্পুটার, ইমেলের ব্যবস্থা, ফ্যাক্স মেসিন। শুনেই তাদের আসল ব্যবসা চলে, এখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার অভাব নেই। বিশেষ করে ইন্ডিয়া টিমকে নিয়েই লাখ লাখ টাকার বাজী ওঠে।

এছাড়া ফুটবল মরশুমেও ফুটবলপ্রেমী বাঙালি তখন ফুটবলে মেতে ওঠে ইদানীং বেঙ্গল টিম-এর খেলাতে এখন সারা দেশে দেশের বাইরে ভারতীয়দের মধ্যে ফুটবল খেলার ক্রেজ এসেছে। তাই ফুটবলে বাজির অঙ্কটাও বাড়ছে। সেবার বেঙ্গল টিম এশিয়ান গেমস-এর ফাইনালে গেছে। আর ব্রজবাবুরাও প্রায় কোটি টাকার উপর জুয়ায় জিতেছে তাই ব্রজ-অখিলরাও এখন ক্রিকেট ছাড়াও ফুটবলের বাজি খেলতে চায় নিয়মিত ভাবে। বিশেষ করে বেঙ্গল টিমকে নিয়েই ওরা প্রায় কোটি টাকার জুয়া খেলে।

তাই ওরা এখন ফুটবল মাঠে যায় খেলা দেখতে। ওই ব্রজ আর অখিলও ফুটবলের ভক্ত হয়ে উঠেছে। ওরা কোন প্লেয়ারের কি দায়িত্ব কে বেশি গোল দিতে পারে এসমস্ত হিসাব নিকাশ করতে শুরু করেছে। ব্রজবাবু বলে,—বুঝলে অখিল এই জুয়া খেলাও একরকম অঙ্ক। এখানে ও চুলচেরা হিসাব করে পা ফেলতে হবে। তবেই বাজীমাত করবে— নাহলে কুপোকাৎ হতে হবে। আর পার্টিদের বাজির টাকা ঘর থেকে দিতে হবে। ঘরে আর কিছুই আসবে না। তাই ঠান্ডা মাথায় বিচার করে টাকা নেবে।

হিসাবটা ব্রজবাবুই ভালো বোঝেন। সে ঠান্ডা মাথার লোক। তার তুলনায় অখিল গোঁয়ার গোবিন্দ ধরনের। সে চায় গায়ের জোরে তার লোকজনদের দিয়ে কাজ হাসিল করতে। ব্রজও পথের পথিক নয়। সে হিসাবী ধূর্ত তাই বিনা অশান্তিতে নীরবে কাজ হাসিল করতে চায়। আর তাই তাদের ফার্ম এই দুনম্বরী বাজারে বেশ বিশ্বাস অর্জন করেছে বাজির টাকাও পার্টিদের ঠিকঠাক দেয়।

ব্রজবাবু আর অখিল ফুটবলের মাঠে এসে সুজিতের খেলাও দেখেছে। দেখেছে ওই ছেলেটা একাই বেঙ্গল টিমকে জিতিয়ে নিয়ে চলেছে। ব্রজও মনে মনে হিসাবটা কষে নেয়।

নিবেদিতা বিয়ের পর সুজিতের বাড়িতে এসেছে। অবশ্য নরেশবাবু ও কল্যাণী চেয়েছিল নিবেদিতা তাদের কারখানার ওদিকের বাংলোতে থাকুক। নাহয় বালিগঞ্জের ওদিকে একটা বাড়ি আছে। সেখানেই নিজেদের সংসার গড়ে তুলুক। কিন্তু সুজিত তা চায়নি। সে এর মধ্যে তাদের পুরোনো বাড়িটা নিজের নামেই কিনে নিয়েছে আর বাড়ির দোতলায় চারখানা ঘরও বানিয়েছে। অবশ্য নরেশবাবুর লোকেরাই তার বাড়ি তৈরির খরচা জুগিয়েছে। সেখানে সমস্ত রকম আধুনিক সুযোগ সুবিধা রয়েছে। ঘরে এ.সি. বসিয়েছে, ঝকঝকে টয়লেট ওপরের জন্য রোলিং সিঁড়িও বসিয়েছে।

এখানে তারা আরামেই থাকবে। আর সুজিতই রোজই ঠনঠনিয়ার মা কালীকে প্রণাম করে মাঠে গিয়ে প্রতিপক্ষকে গোল দিতে পারবে। এবার ইন্ডিয়া লীগ তাদের পেতেই হবে। নিবেদিতা এই নতুন পরিবেশে এসেছে।। একতলায় ভবেশবাবুদের সংসার। তবু সাবিত্রী মাঝে মাঝে উপরে আসে। সেই বলে,

—বউমা! তোমার বোধহয় ওই রান্না খেতে অসুবিধা হবে। আসলে সুজিত এতদিন আমার রান্নাই খেয়েছে। তোমরা নাহয় রান্না-বান্নার ঝামেলা নাইবা করলে। এখানেই খাবে।

নিবেদিতাও ঘর সংসারের হিসাব—রান্নার ব্যাপার-এর খোঁজ-খবর আগে রাখেনি। এরমধ্যে দেখেছে কাজের মেয়েও ঠিকমত এসব করতে পারে না। ফলে সুজিতের খাওয়াও ঠিকমত হয় না। নিবেদিতারও অসুবিধা হয়।

তাই নিবেদিতা বলে,

—আপনি যখন বলছেন তাই হবে। আমি সুজিতকে বলে দেবো।

সুজিত এসব কথা শোনে মাত্র। তার মাথায় এখন খেলার চিন্তা ছাড়াও অফিসের

চিন্তাও জুটেছে। অনিমেষ বাইরে চলে গেছে। ফলে নরেশবাবু এখন সুজিতের উপর কিছুটা নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। তাকে দুদিকে ব্যস্ত থাকতে হয়। তাই সুজিত বলে,

—মাকে কিছু টাকা ধরে দিও। আমি আর এসব ব্যাপারে কি বলবো? তুমি তোমার মতো করেই সংসার চালাবে।

বিজিত এই সংসারের নীরব ভারবাহী জীবে পরিণত হয়েছে। সংসারের অনেক কাজ আগে ভবেশবাবু নিজে করতেন। এখন তার শরীর ভেঙে পড়েছে বিজিতই সব কাজ সেরে দোকানে যায়। সুজিত মাঝে মাঝে অবশ্য বাবার ঘরে আসে, সাবিত্রী ছোটছেলের গৌরবে গৌরবান্বিতা। সুজিত মাকে মাসে মাসে হাজার পাঁচেক টাকা দেয়। ওতে ওদের ফরমাইস মতো খাবার দিতে হয় সাবিত্রীকে। তবু সাবিত্রী বলে,

—সুজিত আমার সোনার টুকরো ছেলে। কত নাম ডাক। মাসে মাসে টাকাও দিচ্ছে।

ভবেশবাবু বলেন,

—ওগো সোনা চিনলে না। তোমার বিজিতও সংসারে টাকা দেয় আর নিঃশেষ ভালোবাসা দিয়ে এই সংসারকে আগলে রেখেছে। তার কথা কোনদিন ভেবেছো

—যে ছেলে নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবেনা। তার কথা কি ভাববো? সে আমাদের ভাবনার জন্য প্রত্যাশাও করে না।

নিবেদিতা এ বাড়িতে আসার পর বিজিতকে দেখেছে। সকালে বাজার থেকে বেরিয়ে বিজিত সামান্য জলখাবার রাতের বাসি রুটি আর একটু তরকারি সৎকার করে বের হয়। ওদিকে সুজিতের জন্য সাবিত্রী ডবলডিমের ওমলেট, টোষ্ট করে। একনম্বর মাখন, জ্যাম, কলা, দুধ ইত্যাদির বরাদ্দ থাকে। নিবেদিতা এসমস্ত কিছু দেখে। সে দেখেছে বিজিতের কোন দাবী নেই। তার মনে হয় বিজিত এই কৃচ্ছ সাধনার জন্য যেন সেইই দায়ী। কিন্তু নিবেদিতার মনে একটা চাপা রাগও ফুটে ওঠে। বিজিত যেন তাকে উপেক্ষা করে চলছে। দেখেও দেখেনা। নিবেদিতাকে চরম অগ্রাহ্য করে। অবহেলা করে চলে যাওয়াটা একদম সহ্য করতে পারে না নিবেদিতা। মনে হয় এই অবজ্ঞা করেই যেন বিজিত নিবেদিতাকে তার আঘাত জানাতে চায়—তার এই ব্যবহারে বিজিতের মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করেনি। নিবেদিতা মাঝে মাঝে বের হয় মার্কেটিং করতে। কোনদিন সুজিত সঙ্গে থাকে। কখনও বা একাই যায়। সুজিত এখন দেখছে নরেশবাবুর ওখান থেকে যেটুকু পাবার তার চেয়ে অনেক বেশি পেয়েছে। তাই নরেশবাবুর জন্য তার আর কোন ব্যকুলতা নেই। এখন তার লক্ষ্য জাতীয় লিগ জিতে বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়া। বাইরের টিমের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে সে। তেমন সুযোগ পেলে দেশ ছেড়ে ইংল্যান্ডের কোন টিমে চলে যাবে।

সুজিত অনেক কিছু পেতে চায়। তার মনে শুধু একটাই লোভ জেগে থাকে নিরন্তর। সে চায় অনেক কিছু পেতে। তার জন্য যা কিছু করার দরকার তা সে করতে পারবে অনায়াসেই। তাই আজ তার কাছে নিবেদিতার প্রয়োজন বোধ হয় ফুরিয়েছে। এখন তার সামনে আরও বড় কিছু পাবার স্বপ্ন। তার চাই আরও টাকা প্রতিষ্ঠা। নিবেদিতাও সেটা দেখেছে। সেদিন মার্কেটিং করতে গেছে নিবেদিতা।

এ অঞ্চলে হাতিবাগান-ই এ এলাকার সবচেয়ে বড় কেনাকাটার বাজার। এখানে নানা ভ্যারাইটির জিনিস বেশ কম দামেই পাওয়া যায়। গাড়িটাকে ওদিকে রেখে নিবেদিতা আর সুজিত চলেছে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে। ফুটপাতে চলা দায়। ফুটপাত পুরোটাই হকারদের দখলে, আজকের তরুণদের একটা বিরাট অংশ লেখাপড়া শিখেও রোজগারের অন্যপথে না পেয়ে ফুটপাতে হকারি করতে শুরু করেছে। তবু একরকম সৎভাবে খেটে খুটে রোজগার করতে পারছে। নিবেদিতা এগিয়ে চলেছে। সুজিতও পাশাপাশি রয়েছে। অবশ্য সুজিত এখন সর্বজন পরিচিত। পথে ঘাটে তার অজস্র ভক্ত। ওকে দেখলে ভক্তের দলও ঘিরে ধরে। 'আসলি লক্ষ্ণৌ চিকনের কাজ করা ব্লাউজ—দিদি' 'শিফন জর্জেট কি লাগবে বলুন' —

পিছন থেকে একটা চেনা কণ্ঠস্বর শুনে চাইল নিবেদিতা। অবাক হয়ে দেখছে বিজিতকে। সে তখন ফুটপাতে তক্তাপোশের উপর দোকান সাজিয়ে খদ্দেরদের হাঁকাহাঁকি করছে। রোদবৃষ্টি এড়াবার জন্য দড়ি দিয়ে একটা প্লাস্টিক টানা দেওয়া তার মাথার উপর। বিজিতও ভাবেনি যে নিবেদিতা আসবে এখানে। নিবেদিতা শুনেছিল বাড়িতে বিজিত নাকি কোন অফিসে সেলস মার্কেটিংস-এ কাজ করে। অফিসের চাকরী। কিন্তু অনার্স নিয়ে বি. এস. সি পাশ করে তার বাবার কারখানায় ট্রেনিং নিলে ডেপুটি ওয়ার্কাস ম্যানেজার হতে পারতো। সেই প্রস্তাব প্রত্যাখান করে বিজিত আজ ফুটপাতে হকারি করছে।

নিবেদিতা দেখছে বিজিতকে। বিজিত বলে,

—অবাক হচ্ছো নাকি?

—না। তোমায় দেখে অবাক অনুকম্পা কিছুই হয় না। দেখছি নিজের জেদের জন্য নিজের ভবিষ্যৎ শেষ করে আজ কোথায় নেমেছো। ফুটপাতে হকারি করতে তোমার এতটুকু বাধলো না। বেধেছিল আমার বাবার সাহায্য নিতে।

বিজিত বলে,

—ফুটপাতে হকারি করতে আমার কোন লজ্জা নেই নিবেদিতা। এতো আমার স্বাধীন ব্যাবসা। মাথা নীচু করতে হয় না। কিন্তু তোমার বাবার সাহায্য নিলে নিজেকে বিক্রি করে দিতে হতো। সেখানেই বেধেছিল আমার।

নিবেদিতা জবাব দিল না। ভিড়ের মধ্যে তার যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। বলে,

—তোমার মার্কেটিং করার আর জায়গা পেলে না? এই নোংরা ভিড়ের মধ্যে কেন আসো। চলো—ওদিকে চৌরঙ্গীর মার্কেটে না হয় নিউ মার্কেটে। তবু ভদ্রভাবে কেনাকাটা করতে পারবে। নিবেদিতা কিছু বলে না। সে ভিড় ঠেলে ওদিকে রাখা গাড়ির দিকে এগিয়ে যাবে। আজ এখানে না এলে জীবনের কঠিন একটা বাস্তব দিককে সে দেখতে পেতো না। এতদিন সে এই জীবনকে দেখেননি। দেখেনি কলকাতার নিম্নবিত্তদের জীবনের বঞ্চনা যন্ত্রণাকে। সে এতদিন বাবার প্রাচুর্যের সংসারে বাস করে রঙীন এক জগৎকে দেখেছিল। কোন অভাব নেই—দরিদ্র নেই—নেই বাঁচার জন্য কঠিন সংগ্রাম।

আজ সেটাকে খুব কাছ থেকে দেখেছে। বিজিতকে সে চেয়েছিল অবজ্ঞা অবহেলা

করতে। কিন্তু বিজিত তার অসহায় বাবা মাকে সাহায্য করার জন্যই নিজেই পথে নেমেছে সুজিত তার তুলনায় অনেক আত্মসর্বস্ব আর স্বার্থপর। এই ছবিটা এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে নিবেদিতার সামনে। বিজিত কোনদিন কিছু পেতে চায়নি। কাউকে সে জোর করে তার দাবীর কথা জানায়নি। অতি সহজেই সে সব কিছু ত্যাগ করে এসেছে।

সুজিতের এখন নামডাক প্রতিষ্ঠা বেড়েছে। এত কিছু এত সহজেই পাবে তা জীবনে কোনদিন ভাবেনি সে। আর ওই ভক্তদের প্রশংসা জয়ধ্বনি সুজিতের মাথা কিছুটা বিগড়ে দিয়েছে। এখন তার পিছনে ঘোরে বেশ কিছু টিমের কর্মকর্তারা। বাইরের টিমের লোকেরাও তাকে টোপ দিয়ে হাতে আনতে চায়। এর মধ্যে দু চারজন অনুরাগী বন্ধু জুটে গেছে। তাদের ক্লাবের পার্টিতেও যায় সুজিত। আর প্রথমে মদ খেতনা। তখন তার জীবনের লক্ষ্য ছিল বড় প্লেয়ার হওয়ার। তাকে কষ্ট করে নিজের পথ করে নিতে হবে। জীবনের গোলে তাকে যেতে হবে তাই তখন মদ খেতনা।

এখন মাঝে মাঝে পার্টিতে যায়, আর বন্ধুদের অনুরোধে দু-এক পেগ খেতে খেতে মাত্রাও বাড়তে থাকে। পার্টি থেকে বাড়ি ফিরতেও রাত হয়। নিবেদিতা এতদিন ধরে সুজিতকে দেখেছে। তখন এসব বদ অভ্যাস তার ছিল না। সতেজ এক তরুণ। খেলার জন্য নিবেদিত প্রাণ কথাবার্তার মধ্য ছিল সারল্য বিনয়।

কিন্তু হঠাৎ অনেক কিছু পেয়ে যেতে সুজিতও এবার বদলে গেছে। তার কথাবার্তায় যে সৌজন্যতা ছিল সেটুকুও আর নেই। নিবেদিতা কিছুদিন ধরেই দেখছে সুজিত রাত করে ফিরছে। ভবেশবাবু নীচে থাকেন। বিজিত কাজকর্ম সেরে ফেরে রাত্রে নটার মধ্যে। তখনও সুজিতের দেখা নেই। তার গাড়ি ফেরেনি। ভবেশ বাবু বলেন,

—বউমা। সুজিত ফেরেনি। এতরাত অবধি কি করে?

নিবেদিতা প্রথম প্রথম ভবেশবাবুকে বলতো,

—অফিসের কাজ সেরে ক্লাবে যায় মিটিং থাকে।

—না না। এতরাত করে ফিরতে নিষেধ করো সুজিতকে। দিনকাল ভালো নয়।

ভবেশবাবুর চোখে ঘুম নেই। সাবিত্রী বলে,

—সুজিতের পার্টি থাকে গো। বড় বড় লোকেদের সঙ্গে ওঠা বসা। ফিরতে তো দেরী হবেই। তুমি শুয়ে পড়ো। ভবেশবাবুর বয়স হয়েছে। আর বয়সের সাথে সাথে অকারণ চিন্তাগুলোও ভিড় করে আসে তার মনে। নিবেদিতাও জেগে থাকে। সুজিত ফেরে অনেক রাতে। প্রথম প্রথম নিবেদিতা টের পায়নি। কিন্তু ক্রমশঃ সুজিতের পানের মাত্রাও বেড়েছে সেটা টের পায় নিবেদিতা। নিবেদিতা সুজিতকে বলে,

—মদ খাওয়া ধরেছ দেখছি।

—পার্টিতে গেছলাম। ওরা ছাড়লো না, একটু খেতে হলো।

—এসব তো আগে খেতে না। পার্টিতে তোমার সঙ্গে গেছি তখন তো কেউ অফার করলেও খেতে না।

—তখন তেমন পজিশন ছিল না। এখন মিঃ আগরওয়ালা মিঃ সেনের অনুরোধ

ফেলতে পারলাম না।

—তোমার সামনে লীগ-এর বড় বড় খেলা। তারপর যদি লীগ জেতো তবেইতো বিশ্বকাপ খেলতে যাবে। এসময় মদ ছুঁয়ো না। তোমাদের কেরিয়ার আমাদের স্বপ্ন বলে কথা। এজন্য তোমাকে হিসাব করে চলতে হবে।

—ঠিক আছে।

—আর শোনো। বেশি রাত করে বাড়ি ফিরো না। দেরি হলে ফোন করবে তোমার মা-বাবা বারবার খোঁজ করে।

—ওদের ওই পুওর মিডল ক্লাস মেন্টালিটি। আমার দাদা ওদের কাছে আদর্শ পুরুষ। রাত দশটার মধ্যে আলুপটল কুমড়ো বাজার করে বাড়ি ফিরে আসে। সে-ও এসে বাবা-মাকে তাতায়। বুঝলে স্রেফ হিংসে। আমি কিছু বুঝি না নাকি?

—অনেক কথাই তো বললে? মিডল ক্লাস মেন্টালিটি ওদের, তুমি তো ওদের ওই পরিবেশেই মানুষ হয়েছো।

সুজিত বলে,

—আজ আমার দিন বদলেছে। তোমায় ঘরে এনেছি আমি। ওই অকম্মা আদর্শবান দাদা।

নিবেদিতা নিজে দেখেছে বিজিতকে। সে সংসারে মুখ বুজে সব কাজ করে। বাবা-মায়ের সেবা, সংসারের সব ভার সে নিয়েছে। অথচ কারো নামে কোনও নালিশ নেই তার। কি ভাবে রোদজলের মধ্যে বসে দোকান করে তাও দেখেছে। সেই অন্নে সে বাবা-মায়ের সেবা করে। তাই নিবেদিতা বলে,

—তোমার দাদা তোমার জয়েই খুশি। তোমার অন্য কোনও ব্যাপারে সে মাথা গলায় না। তার পাশে না দাঁড়াতে পারো, তার প্রতি অবিচার করো না।

সুজিত দেখছে নিবেদিতাকে। আজ নিবেদিতার মুখে বিজিতের সম্বন্ধে ওই সব কথা শুনে একটু অবাক হয়েছে সুজিত। তার মাথায় তখন বিলাতি মদের নেশার ঘোর চলছে। তবু চিন্তাশক্তি হারায়নি। বরং আরও সজাগ হয়ে ওঠে। সে-ও তার দিদি শিখার কাছেও শুনেছে যে বিজিতের সঙ্গে নিবেদিতার ভালো পরিচয়ই ছিল। নিবেদিতা অবশ্য তেমন কিছু বলেনি তাকে। আর সুজিতও নিবেদিতাকে একান্তভাবে পেতে চেয়েছিল তার নিজের ভবিষ্যত গড়ার জন্য। সেই চাওয়ার জন্য ভালোবাসা প্রেমের কোনও স্পর্শ ছিল কিনা তার হিসাব করেনি সুজিতের স্বার্থপর মন।

আজ তাই নিবেদিতার মুখে বিজিত সম্বন্ধে এইসব কথা শুনে অবাক হয় সুজিত। নিবেদিতা বলে,

—রাত হয়েছে। খাবে চলো।

—পার্টিতে ডিনার করে এসেছি।

—তাহলে শুয়ে পড়বে চলো। আমার ঘুম পাচ্ছে।

নিবেদিতা শোবার ঘরে গিয়ে খাটে শুয়ে পড়ে। নাইট ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে সুজিত দেখছে যেন নতুন এক নিবেদিতাকে।

সুজিতের মনের অতলে যেন সন্দেহের একটা কালোছায়া এবার ঘনিয়ে আসে। সে নিজে পরম স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক। তার মনে অপরের সম্বন্ধে এই ধারণাগুলো সহজেই আসে। সুজিতও এবার যেন নিবেদিতার দিকে নজর রাখতে থাকে—সেইসঙ্গে বিজিতের উপরেও। তবে এই সন্দেহের কথা সে ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করে না।

সকালে প্র্যাকটিসে যেতে হয় সুজিতকে। রাত অবধি পার্টিতে হইচই করে মদ খেয়ে ফিরে বিছানা থেকে উঠতে দেরি হয় সুজিতের। নিবেদিতাই ওকে কোনমতে ডেকে তোলে। গজগজ করে নিবেদিতা।

—নিজের খেলাটার দিকেও নজর রাখবে না? এই তো তোমার ভবিষ্যৎ ওইসব পার্টি ছাড়ো।

সুজিত কোনরকমে ভোরে উঠে গাড়ি নিয়ে মাঠে চলে যায়। ফেরে নটা নাগাদ। তারপর স্নান করে ব্রেকফাস্ট সেরে বেলা বারোটার মধ্যে অফিসে পৌঁছে যায়—কয়েক ঘণ্টা যেতেই সুজিত মাঠে যায়। সামনে লীগের খেলা তার জন্য প্র্যাকটিস করতে হয়।

অন্য ম্যাচের খেলাও থাকে। আর নরেশবাবুও চান সুজিত যেন রোজ মাঠে কিছুক্ষণের জন্যও আসে। তাই যেতে হয়, মাঠে না গেলে অন্য প্লেয়াররা নাকি উৎসাহ পায় না।

সুজিত সকালে প্র্যাকটিস থেকে ফিরেছে। দেখে নিবেদিতা ঘরে নেই। সুজিতের .দেরি হয়ে গেছে। অফিসে যেতে হবে। সে স্নান সেরে এসে দেখে তখনও নিবেদিতা ফেরেনি। সে বোধহয় নীচের তলায় কিচেনে গেছে। সুজিত দেখেছে নিবেদিতা প্রথম এখানে এসে নিজের মহলেই থাকতো। ম্যাগাজিন পড়তো। না হয় টিভি দেখতো। কাজের মেয়েই ওর খাবার আনতো।

ইদানীং নিবেদিতা প্রায়ই সকালে নীচের ঘরেতে যাচ্ছে, সুজিত এটা মোটেই পছন্দ করে না। সে চায়না বাবা-মায়ের সঙ্গে নিবেদিতা একটু ঘনিষ্ঠ হোক। হয়তো ওরা টাকা-কড়ি চেয়ে বসবে। তাই এড়িয়ে থাকতে চায় সুজিত। কিন্তু নিবেদিতা নীচে যাতায়াত করে প্রায়ই। নিবেদিতা এসেছে সাবিত্রীর এখানে। সাবিত্রীর শরীর ভালো নেই। ওর কাজের মেয়ে টোস্ট করছে। এরমধ্যে বিজিত বাজার থেকে ফিরে জলযোগ সেরে তার দোকানে যাবে। মায়ের শরীর ভালো নেই। তাই বিজিত নিজেই গোটা দুয়েক বাসি রুটি এবং একটু গুড় দিয়েই জলযোগ সেরে বের হবে।

হঠাৎ এসে পড়ে নিবেদিতা। একটা প্লেটে ওর জন্যে টোস্ট ডবল ডিমের ওমলেট নিয়ে। বিজিত অবাক হয়, বলে—

—এসব দিয়ে কি হবে? এইতো রুটি রয়েছে।

নিবেদিতা বলে,

—রোজ রোজ বাসি রুটি খেতে হবে না। কাজের মেয়েকে বলেছি ও তোমার জন্য টোষ্ট ওমলেট করে দেবে। নাও—

বিজিত মুখের উপর না বলতে পারে না। সাবিত্রীও বলে,

—ওরে বিজিত কষ্ট করে বউমা নিজে তোর জন্য এনেছে। খেয়ে নে বাবা,

বিজিত অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্লেটটা নেয়। এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ঢুকছে সুজিত। সুজিত দেখছে নিবেদিতা নীচে এসে বিজিতকেই তার টাকায় কেনা ব্রেকফাস্ট প্লেট সাজিয়ে দিচ্ছে। যে এতদিন বাসি রুটি দিয়েই জলযোগ করতো। নিবেদিতা তাকে ওইভাবে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে খাওয়াচ্ছে। সুজিত ব্যাপারটা দেখে। সাবিত্রী বলে,

—বউমা। সুজিত এসে গেছে — ওর খাবারটা ওপরে পাঠিয়ে দিচ্ছি, বউমা তুমি যাও।

সুজিত অবশ্য কিছু বলে না—শুধু দেখেই চলে যায়, উপরে গিয়ে মুখ গম্ভীর করে বসে থাকে। নিবেদিতাও সুজিতের সামনে খাবার দিয়ে ভেতরের ঘরে চলে যায়। বিজিত খাওয়া শেষ করে বলে,

—মা ওষুধটা ঠিকমত খেয়ো। তোমাদের খাওয়া হলে আমার খাবারে ঢাকাটা দিয়ে রেখো ফিরতে দেরি হতে পারে।

অনিমেষ এখন লন্ডন-নিউইয়র্ক-এর কাজ নিয়েই ব্যস্ত। লন্ডনেও তাদের এজেন্সি অফিস করেছে। সেখানের কাজ সেরে যেতে হবে নিউইয়র্কে। প্লেনে প্রায় ন ঘণ্টা সময় লাগে। সকালে কাজ সেরে বেলা এগারোটার মধ্যে চলে আসে হিথরো এয়ারপোর্টে। বিশাল এয়ারপোর্ট, পৃথিবীর অন্যতম কর্মব্যস্ত এয়ারপোর্ট। গোটা চারেক রানওয়ে থেকে দু-পাঁচ মিনিট অন্তর নানা দেশের প্লেন ওঠা-নামা করছে। পৃথিবীর সবদেশের প্রায় প্লেন নামে ওখানে। আর পৃথিবীর সব জাতের সব ভাষার লোকদেরই দেখা যাবে এখানে এয়ারপোর্ট লাউঞ্জে। এইসব জাতিপুঞ্জের মিলন স্থলে একটা জিনিস অনিমেষ-এর খারাপ লাগে। এই এয়ার পোর্ট লাউঞ্জকে সাফসুতরো রাখতে হয় সর্বদা, তাই চব্বিশ ঘণ্টা এখানে বড় বড় হাতল লাগানো রাবারের ব্রাশ হাতে মজুত রয়েছে সাফাই কর্মীরা আর এইসব সাফাই কর্মীদের অধিকাংশ ভারতীয়। পাঞ্জাব মুলুকের মেয়েরা। নিজেদের মধ্যে তারা ঝগড়া করে কলরব করে মারামারি করে।

লীগের খেলা জমে উঠেছে। কলকাতার নামী-দামী ক্লাবদের সহজেই গোল দেয় সুজিত। খেলার মাঠে নামলে সে তখন অন্যমানুষ। তার লক্ষ্য তখন গোল পাওয়া আর সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে তার বিশেষ অসুবিধা হয় না। তার চোখের সামনে প্লেয়ারদের ফাঁকফোকরগুলো সহজেই ধরা পড়ে। কিভাবে তাদের কাটিয়ে এগিয়ে যেতে হবে এটা তার ভালই জানা। তাই গোলও পায় সে।

সারা মাঠ কেঁপে ওঠে সুজিতের জয়ধ্বনিতে। ওর ভক্তের সংখ্যাও অজস্র। তাদের টিমের সমর্থকও কয়েক লাখ। তার কিছু অংশ মাঠে এসে চিৎকার করে। তাতেই মাঠ কেঁপে ওঠে। নরেশবাবু বিপুলবাবুরাও খুশি হয়— এবার তাদের টিম জাতীয় লীগে একমাত্র অপরাজিত টিম। কেউ তাদের গোল দিতে পারেনি। তারাই এখন লীগের শীর্ষে আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে গোয়ার একটা টিম আর কলকাতার অন্য একটা নামী দল। নরেশবাবুরা কোনও আই. এফ. এ-রও এবার

আশা করছে। বেঙ্গল টিম এবার এশিয়ান কাপ জয়ে করেছে। তারপর বিশ্বকাপ খেলতে যাবে। ভারতীয় ফুটবলের নতুন ইতিহাস রচিত হবে।

এর আগে ভারতের কোনও দল বিশ্বকাপ খেলায় পৌছতে পারেনি। এই লীগ জিতলে ওদের সামনে সেই পথ খুলে যাবে। বেঙ্গল টিম থেকে বেশি সংখ্যক প্লেয়ার খেলতে পারবে ভারতীয় টিমে। আর সুজিত হবে তাদের ক্যাপ্টেন। কাগজে টিভিতে লোকের মুখে মুখে এবার এই লীগের খেলার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। বাজার গরম হয়ে উঠছে। পথে-ঘাটে, বাসে-ট্রামে, অফিস-কাছারিতে চলছে এই কথাই। এরমধ্যে বেঙ্গল টিমের সমর্থকরা তো ঘোষণা করেছে তারা লীগ পাচ্ছেই। এনিয়ে আর এরমধ্যে বাজারও সরগরম।

ব্রজবাবু অখিলবাবুদের কোম্পানি এখন বাজারের এই পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে। তারা এখন ক্রিকেটের উপর বাজি রেখে কোটি টাকা উপার্জন করেছে। তার জন্য দেশে-বিদেশের বাজারেও এজেন্সি রয়েছে। এবার দেশের মধ্যে এই ফুটবলের হাওয়াকে কাজে লাগাতে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তারা নজর রেখেছে এই বেঙ্গল টিমের বিপক্ষে কারা ফাইনালে উঠেছে। তখন পরিস্থিতি বুঝে তার ব্যবস্থা নেবে। ব্রজবাবু বলে,

—অখিল, এই কটা দিন তুমিও মাঠে চলো আমার সঙ্গে। ওই সব ক্লাবের কর্তাদের সঙ্গে প্লেয়ারদের সঙ্গে একটু মেলামেশা করা দরকার। বিশেষ করে সুজিতের সঙ্গে একটা রফা করতে হবে।

—দেখি কোনও পথ বের করতে পারি কিনা।

ব্রজবাবু বলে,

—পারতেই হবে হে। আমার মনে হয় ওই ছেলেটাই হবে আমাদের তুরুপের তাস।

সুজিত এখন অনেক উপর তলার মানুষ ভাবে নিজেকে। চাকরি প্রতিষ্ঠা-সম্মান সবই পেয়েছে। তাই বড় বড় পার্টিতে তার সাদর আমন্ত্রণ আসে। সুজিতও না করতে পারে না। সে-ও স্বপ্ন দেখে এবার নরেশবাবুর চেয়েও অনেক বড় ব্যাবসায়ীদের ঘনিষ্ঠ হয়ে সে নিজেই ওদের ব্যাবসার পার্টনার হবে।

মিঃ চৌহান শহরের বড় ব্যবসায়ী। জাহাজের ব্যাবসা তার। বেশ কয়েকটা কারখানা রয়েছে। তার জাহাজগুলো দেশ বিদেশের বন্দরে নানা প্রকার মাল নিয়ে যাতায়াত করে। ওইসব জাহাজেই নরেশবাবুদের প্রচুর মাল যায় বিদেশের নানা জায়গাতে। অনিমেষ বাইরে গিয়ে এখন এদের ব্যাবসাকে আরও বাড়াচ্ছে। আর মিঃ চৌহান কোম্পানীর সঙ্গে তাই নরেশবাবুর কোম্পানীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে সেই সুবাদেই সুজিত ও মিঃ চৌহানের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। চৌহানও ফুটবল খেলার বড় সমঝদার। তাই তার পার্টিতেও সুজিতকে যেতে হয়। ব্রজবাবুদেরও কাজ কারবার আছে। মিঃ চৌহান-এর ফার্মের সঙ্গে। ওদের জাহাজেই ব্রজবাবুদের নানা রকম দুনম্বরী মাল নানাভাবে আসে সরকারের নজর এড়িয়ে, তার জন্য অবশ্য চৌহান কোম্পানি মোটা টাকাই পায়। তাই ওদের মধ্যে সুসম্পর্কও রয়েছে।

বিরাট হলে পার্টির আয়োজন চলছে। হলের বাইরে ও ক্লাবের বাগানে গার্ডেন আমব্রেলার নীচে দলে দলে নানা আলোচনা পান-ভোজনও চলে। ব্রজবাবুই সুজিতকে এনেছে তার টেবিলে।

ব্রজবাবু অখিলরা জানে এসব ব্যাবসা করতে গেলে এসবের প্রয়োজন হয়। ব্রজের অফিসের পার্সোনাল এ্যাসিটেন্ট লিজা এমনিতে স্মার্ট ও সুন্দরী। ব্রজবাবু অভিজ্ঞ লোক। সেও বেছে বেছে এমনি সব মেয়েদের তার ফার্মে রেখেছে। ওদের সে টোপ হিসাবে ব্যবহার করে মাঝে মাঝে বড় বড় রুই-কাতলা ধরে এবং বেশ কিছু উপার্জনও করে।

লিজাকেও সে পার্টিতে এনেছে। সুজিতের চোখে তখন রঙীন নেশা। সেই নেশার ঘোরে সে লিজাকে দেখে। আর লিজাও জানে কিভাবে শিকারকে হাতে আনতে হয়। সুজিতের শূন্য গ্লাস বদলে সে ঘন ঘন পানীয় যোগাচ্ছে। ব্রজবাবুও বুঝেছে এবার শিকার হাতে আসবে। সুজিতকে বলে ব্রজ—

—একদিন আমাদের অফিসে আসুন সুজিতবাবু। কিছু বিজনেস ডিল করা যাবে। আপনারও তাতে লাভ হবে।

লিজা বলে,

—উনি তো এখন খুব বিজি আমাদের কথা কি মনে থাকবে?

সুজিত এরমধ্যেই লিজার মনমোহিনী রূপে আকৃষ্ট হয়েছে। ওর উদ্ধত যৌবন সুজিতের লোভী মনে ঝড় তুলেছে। সুজিত বলে,

—আমি নিশ্চয়ই যাবো সময় করে। আপনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন। আমি রাত্রি নটার মধ্যেই ক্লাবে আসি। এই আমার কার্ড। লিজা কার্ডখানা হাত বাড়িয়ে নেয়।

রাত হয়ে গেছে। উত্তর কলকাতার এই সাবেকি অঞ্চলের জীবন যাত্রার ধরনটা আলাদা। এখানে এখঁনও সাবেকি রক্ষণশীলতার কিছুটা অবশিষ্ট আছে। রাত এগারোটার পর এ অঞ্চল নিশুতি হয়ে যায়। লোকজনও কম চলাচল করে। নির্জন পথে দু-চারখানা গাড়িই ছুটে যায় রাতের নির্জনতা ভেদ করে। সারা পাড়া নিশুতি হয়ে গেছে। এ বাড়িতে ভবেশবাবু জেগে আছেন। উপরের ঘরের নিবেদিতারও ঘুম আসে না।

বেশ কিছুদিন ধরেই সে দেখেছে সুজিত যেন বদলে গেছে। রাত করে ফেরে। কোনও কোনদিন মাতালও হয়ে আসে। টলছে। নিবেদিতা দেখে ওকে। তাদের বাড়িতে বাবা-দাদারা প্রচুর অর্থ রোজগার করে। কিন্তু এইভাবে মদ খায়না। তাদের মধ্যে যে সংযম রয়েছে। সুজিতের মধ্যে তা নেই। সে উদ্ধত আর অসংযমী। সামান্য পেয়েই সে একেবারে বদলে গেছে। নিবেদিতার মনে হয় যে সন্তান তার বাবা-মা সংসারকে দেখেনা—তার হৃদয় বলে কিছুই নেই। এটা নিবেদিতা আগে বোঝেনি — আজ বুঝেছে।

দেখেছে বিজিতকে। দিনভোর কঠিন পরিশ্রম করে সে সংসারকে ধরে রেখেছে। আজ নিবেদিতার মনে হয় সে জীবনে একটা ভুলই করেছে।

জেগে আছে বিজিতও। সে বলে ভবেশবাবুকে,

—বাবা তুমি শোও। আমি জেগে আছি—

ভবেশবাবু বলেন,

—সুজিত এসব ঠিক করছে না। এত রাত অবধি কি কাজরে? সারাদিন কাজ করেও কি কাজ শেষ করা যায় না।

গাড়িটা এসে থামে বাইরে। জানলা দিয়ে দেখে ভবেশবাবু সুজিত নামছে। ওর চলার ক্ষমতা নেই। টাল খেয়ে পড়তে যাচ্ছিল। ড্রাইভার ধরে ফেলে। গর্জায় সুজিত।

—কি করিস রাস্কেল। একটু ঠিক করে নিয়ে যাবে তো?

ড্রাইভারের ঘাড়ে ভর দিয়ে সুজিত টলতে টলতে উপরে উঠে যায়। ভবেশবাবুর গালে যেন সজোরে একটা থাপ্পড় কসেছে। তিনি ভাবতেও পারেন না যে সুজিত এত রাতে মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরবে। সামান্য শিক্ষক তিনি। জীবনে বেশ কিছু নীতি আদর্শ মেনে এসেছেন। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে সেসব নীতি আদর্শকে যে এমনি ভাবে ব্যর্থ করে দেবে তার সন্তান তা ভাবেন নি তিনি। ভবেশবাবু অস্ফুট কণ্ঠে বলে,

—সুজিত মাতাল হয়ে বাড়ি ফেরে। টাকা প্রতিষ্ঠার এই পরিণতি। বিজিতও দেখছে। সে-ও অবাক হয় সুজিতের এ সমস্ত কাজ দেখে। আরও মনে হয় এসব আজই ঘটেনি—আগেও ঘটেছে। তবু বাবাকে বলে,

—নানা। এত খাটাখাটুনি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তুমি শুয়ে পড়ো বাবা।

তারপরই উপর থেকে নিবেদিতার কি কথার উত্তরে সুজিতের জড়িত কণ্ঠের শাসানি ওঠে।

—সাট আপ। তোমার বাবার পয়সায় এসব খাইনা। ফের একটা কথা বললে ভালো হবে না। একদম মুখ বন্ধ করে থাকবে।

ভবেশবাবু আর্তকণ্ঠে বলেন,

—কি হলো। সুজিত বউমাকে ওইসব কি বলছে? ধমকাচ্ছে।

বিজিত বাবাকে আশ্বস্ত করে বলে,

—আমি দেখছি। এনিয়ে তুমি ভেব না বাবা।

—তাই যা বিজিত। সুজিতরা আবার কিছু বাধিয়ে না বসে। ওকি কোনদিন এতটুকু শান্তি দেবে না আমায়।

নিবেদিতা বেশ কদিন ধরেই সুজিতের ব্যাপারটা দেখছে। এরমধ্যে দু-চারবার নিষেধও করেছে। নিবেদিতা এনিয়ে বাবাকে মাকেও কিছু বলতে পারেনি। দরদী অনিমেষও এদেশে নেই, সে এখন আমেরিকায়। তাছাড়া নিবেদিতা নিজেই সুজিতকে পছন্দ করেছিল। একমাত্র তার বাবা-মার প্রথমে সম্মতি ছিল না। তারাও চাননি সাধারণ ঘরের একটি ছেলে সুজিত—তার সঙ্গে ওদের মেয়ের বিয়ে দিতে। তারা নানাভাবে তাদের আমলের কথাও জানতে চেষ্টা করেছিলেন। অনিমেষ তো নিবেদিতাকে পরিষ্কারভাবে নিষেধই করেছিল। কিন্তু নিবেদিতা জেদি খেয়ালি মেয়ে। সে নিজেই সুজিতের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। তাই তার বাবা-মা আর অমত করেনি।

একাজ করেছে নিবেদিতা নিজে, তাই আজ নিবেদিতা নিজেকেই দোষী মনে করে। আর রাগ হয় নিজের উপরই। আজও সুজিতের ফেরার কথা ছিল বিকেলে। আজ প্র্যাকটিশে যাবে না। নিবেদিতাকে নিয়ে নরেশবাবুর বাড়িতে যাবে। নিবেদিতাও তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সুজিত বিকেলে ফেরেনি ফোনও করেনি। কোনও খবরও দেয়নি। ফিরেছে এই গভীর রাতে মাতাল হয়ে টলতে টলতে।

নিবেদিতা রাগে ফেটে পড়ে বলে,

—এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই তোমার? বলে গেলে বিকেলে ফিরবে বাবার ওখানে যেতাম। ফিরলে না—খবরও দিলে না। ফিরলে রাত দুপুরে মাতাল হয়ে। এইভাবে মদ গিলে বাড়ি ফিরতে তোমার লজ্জা করে না?

গর্জে ওঠে সুজিত। তার মনে তখন লিজার রঙীন স্বপ্ন মদের মত্ততা। সেই ঘোর কেটে গেছে নিবেদিতার কথায়। গর্জে ওঠে সুজিত।

—সাট আপ। লজ্জা করবে কেন? আরে মদ তোমার বাপের পয়সায় গিলিনি।

নিবেদিতা বলে,

—আমার বাবার জন্যই আজ তোমার সব কিছু নাম-প্রতিষ্ঠা—টাকা চাকরি-গাড়ি। নাহলে কি ছিল তোমার? কে চিনতো তোমাকে? পথের থেকে তোমাকে তুলে নিয়ে গেছেন প্রাসাদে আমার বাবাই। আমার জন্য।

—খবরদার। ফ্যাচ ফ্যাচ করো না। তোমার জন্য নয় এসব হয়েছে আমার নিজের যোগ্যতায়। এনিয়ে ফের কোনও কথা বললে—

সুজিতের কথায় নিবেদিতা বলে,

—যা সত্য তা বলবেই। একশোবার বলবো। কি করবে? কি করবে তুমি? সুজিতের পৌরষে ঘা লাগে। সে গর্জে ওঠে।

—এক থাপ্পড়ে মুখ ভেঙে দোব।

হাত তোলে সে। ওদিক থেকে বিজিত এসে তার হাতটা চেপে ধরে, গর্জে ওঠে—

—সুজিত। এত বড় সাহস তোর বউ-এর গায়ে হাত তুলিস।

সুজিত তার দাদাকে চেনে। বহুবার দেখেছে সুজিত তার দাদা কি ভাবে কঠিন হাতে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারে। বিজিত বলে,

—আজ তোকে শেষবারের মতো সাবধান করে দিচ্ছি ফের কোনদিন এমনি ভাবে হাত তোলার চেষ্টা করলে তোর হাতখানাই মুচড়ে ভেঙে তোর ভবিষ্যৎকে আমিই শেষ করে দোব।

সুজিতও জানে ও কাজটা দাদা অনায়াসেই করতে পারে। বিজিত বলে,

—রাত দুপুরে মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরে স্ত্রীর গায়ে হাত তুলতে লজ্জা করে না? শেষবারের মত তোকে সাবধান করে দিচ্ছি অন্যায়কে আমি বরদাস্ত করব না একথা তুই জানিস।

সুজিত চুপসে গেছে, সে বলে।

—ভুল হয়ে গেছে আর হবে না।

—কথাটা মনে রাখলে ভালো করবি।

চলে যায় বিজিত। সুজিতও মাথা নীচু করে ওঘরে চলে যায়। নিবেদিতার চোখে জল নামে। জীবনে এর আগে এত অসহায় এত অপমানিত সে বোধ করেনি।

আজও নিবেদিতা বিজিতকে যেন নতুন করে চিনেছে। ও কর্তব্য করতে আজও দ্বিধা করেনি। নিবেদিতার মনে হয় ভুলই করেছে সে। কিন্তু সেটা বুঝেছে অনেক দেরিতে—

সকাল হয়। সুজিতের নেশাও ছুটে গেছে। কাল রাতের কথাগুলো তবু ভোলেনি সে। সুজিতকে কাল বিজিত বেশ কিছু কথা বলেছে যেগুলো সুজিত নেশার ঘোরেও মেনে নিতে পারেনি। নিবেদিতা তার স্ত্রী তার সঙ্গে সুজিতের এমন ঝগড়া হতেই পারে। কিন্তু তাই বলে তাদের ঝগড়ার মাঝে বিজিত ওই ভাবে গিয়ে সুজিতকে শাসাবে। এমন কি গায়ে হাত তুলবে স্ত্রীর সামনে অপমানিত করবে এটা ভাবতেই পারে না সুজিত।

সুজিত অবশ্য মুখে কিছুই বলেনি। তবে তার মনে হয় নিবেদিতার প্রতি বিজিতের যে দূর্বলতার কথা সুজিত শুনেছিল সেটা কার্যত সত্যিই। আরও মনে হয় সুজিতের-বিজিত নিবেদিতা দুজনেই এখনও সেই অতীতের পরিচয়টাকে ভুলতে পারেনি।

তাই নিবেদিতাকে সামান্য বকুনি দিতেই বিজিতও গিয়ে হাজির হয়। আর সুজিতের ঘরেই সুজিতকে আক্রমণ করে।

আজ নিবেদিতা সুজিতের স্ত্রী হয়েও তার স্বামীর প্রতি এই আক্রমণের প্রতিবাদ করেনি। তাই সুজিত আরও কঠিন হয়ে উঠেছে আর ওদের উপর নজর রাখতে শুরু করেছে।

পরদিন সকালে নিবেদিতার মনেও গতরাতের ঘটনাটা একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া শুরু করেছে। সুজিতের নগ্ন স্বরূপটাকে সে দেখেছে। আরও বুঝেছে যে ওই সুজিতকে শাসন করার অধিকার একমাত্র বিজিতেরই আছে। আজ নিবেদিতা বিজিতের প্রতি কৃতজ্ঞ। না বুঝে বিজিতকে চরম অবজ্ঞা অবহেলা করেছিল সে। এবার বুঝেছে সুজিতকে সামলাবার জন্য ঠিকপথে আমার জন্যই বিজিতকে দরকার।

বিজিত অবশ্য কোনদিন কোনও অভিযোগ করেনি নিবেদিতার কাছে। নিজের দাবিও জানাতে চায়নি। সে নীরবে সরে গিয়েছিল নিবেদিতার জীবন থেকে অন্য এক জগতে। আবার সেখান থেকেই এসে নিবেদিতাকে চরম অপমানের হাত থেকে বাঁচিয়েছে কাল। নেহাত তা কর্তব্য ভেবেই করেছে। বিজিত এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। সে রোজকার মতো বাজার করে, ফিরে এসে জলখাবার সেই বাসিরুটি আর গুড় খেয়ে কাজে যাবে। কিন্তু তার আগেই নিবেদিতা নিজে বিজিতের জন্য টোস্ট-অমলেট-কলা এসব এনেছে। বিজিত বলে,

—এসব খেলে কেমন পেট ভার হয়, মা ওই রুটি তরকারিই দাও। সাবিত্রী বলে,

—ও তৈরি করলো তোর জন্য। আজ রবিবার সুজিত ওঠেনি তুই খেয়ে নে বাবা।

অগত্যা বিজিত হাত বাড়িয়ে জলখাবারটা নিয়ে বলে,

—আজ খাচ্ছি তবে এসব খাবার আমাদের মতো যারা পথে-ঘাটে ঘোরে তাদের পেটে সয়না।

নিবেদিতা চুপ করে থাকে। বিজিত খাচ্ছে। নিবেদিতা জানে বিজিতের আসল কথাটা কি। অবশ্য বাড়িতে এনিয়ে বিজিতও কিছু বলেনি। নিবেদিতা শুনেছে বিজিতের সঙ্গে ভবেশবাবুর কথা। সে বাজারে একটা দোকান ঘর পাবে। নিবেদিতা বলে বিজিতকে,

—পথে-ঘাটে না ঘুরে এবার দোকানঘর পাবে বলছিলে সেই দোকানেই বসো। ঠিকমতো চালাতে পারলে দোকান থেকেও আয় কম হবে না।

বিজিত বলে,

—তাতো হবে না। কিন্তু দোকানের পুঁজি তো দরকার।

—তা কত টাকা লাগতে পারে দোকান করতে?

—সে অনেক টাকা, হাজার পঞ্চাশ হলে দোকানটা জমানো যাবে। চেষ্টা করছি যদি ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিতে পারি।

নিবেদিতা কি বলতে যাচ্ছিল। বিজিত ঘরির দিকে চেয়ে উঠে পড়ে —

—ইস্। দেরি হয়ে গেল। রবিবারের বাজার—চলি। বের হয়ে যায় বিজিত। নিবেদিতা কথাটা ভাবছে। ওরা দুজন যখন কথা বলছিল সুজিত উপরে নিবেদিতাকে না পেয়ে নীচেই এসেছে। আর সিঁড়ির ওখান থেকেই দেখে ব্যাপারটা। নিবেদিতা বিজিতকে তারই পয়সায় আনা ওই সুখাদ্য প্লেটে সাজিয়ে খাওয়াচ্ছে আর দুজনে বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে কি সব কথা বলছে।

ওদিকের সুজিতের জন্য যে চা নিয়ে যেতে হবে, এ কথাটা নিবেদিতার মনে নেই। এসব দেখে সুজিতের মাথায় রক্ত চড়ে যায়। সে এবার নিশ্চিত যে ওদের দুজনের মধ্যে সে সম্পর্কটা এখনও আছে। বিজিত নিবেদিতা দুজনেই ঠকিয়েছে সুজিতকে। সুজিত ওর আসার ব্যাপারটা জানাতে চায়না নিবেদিতাকে। তাই সরে এল সুজিত। অসহায় রাগে সে ফুঁসতে থাকে।

অর্ক শিখার সংসারে কোনও সমস্যা নেই। অর্ক ডক্টরেট করছে। শিখাও গ্র্যাজুয়েশন করে ওদিকে একটা ছোটদের স্কুলে চাকরি নিয়েছে। একটা স্পেশাল ট্রেনিংও নিয়েছে। মাঝে মাঝে বিজিতও আসে এখানে। শিখা অবশ্য মাঝে মাঝে এ বাড়িতে আসে। নিবেদিতার সঙ্গেও তার সৌহার্দ জমে উঠেছে। কিন্তু সুজিত যেন ওদের আসাটা পছন্দ করে না। বিজিত বলে,

—শিখা, ও এখন সমাজের ওপরের তলার লোক। তাই একটু এড়িয়ে থাকতে চায়। তবে একটা ব্যাপারে ও ভীষণ সিনসিয়ার।

—ছাই। শুনি এতটাকা রোজগার করে। নিজে বাড়ি কিনেছে মা-বাবাকে দেখে না।

বিজিত বলে,

—না রে, এত কাজের চাপ। লেবার অফিসার, তারপর আবার এত বড় খেলার টেনসন্-প্র্যাকটিস। আমিই বলেছি বাড়ির জন্য তোকে ভাবতে হবে না। আমি তো আছি চালিয়ে নেব আর বাবার পেনসন আছে যেমন-তেমন করে চালিয়ে নেব।

অর্ক চা খাচ্ছে। শিখা বলে,

—তুই কিরে দাদা?

—কেন?

—জীবনে নিজের কথাটা কি কোনদিনই ভাববি না? তোর কি কিছুই চাওয়ার নেই? সারাজীবন সংসারের জন্য করে যাবি?

বিজিত হাসে। সে বলে,

—তোদের সকলকে সুখী দেখলেই আমি সুখী হইরে। মনে হয় এই বোধহয় সব পাওয়া। জীবনে চাওয়া-পাওয়ার আর কিছু নেই। আসলে আমার পাওয়ার হিসাবটা তোদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তাই হয়তো মিলবে না।

অর্ক বলে,

—শিখা-বিজিতকে আর ডিসটার্ব করো না ওইসব বলে। এখুনি প্লেটোর জীবনদর্শনের ব্যাখ্যা শুরু করে দেবে। শিখা বলে,

—কে জানে, তা তোর দোকানের কি হল?

অর্কই বলে,

—সেই কথাটাই বলো তো, তোমার নামে দোকান ঘর-এর এ্যালটমেন্ট লেটারটা পেলে দয়া করে আনো।

—কেন বলোতো?

—আমার এক বন্ধু ব্যাঙ্কের বড় অফিসার। আমি তার সঙ্গে কথা বলে রেখেছি। তিনিও কথা দিয়েছেন ওইসব কাগজপত্র থাকলে তোমাকে তিনি একলাখ টাকা অবধি লোনের ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন ব্যাঙ্ক থেকে। মাসে মাসে শোধ দিয়ে দোব।

শিখা বলে,

—তাহলে ওই সব কাগজপত্র এনে দরখাস্ত করে দে দাদা। আর তুমিও একটু তদ্বির তদারক করো যাতে টাকাটা পেয়ে যায় দাদা।

বিজিত বলে,

—ব্যাঙ্ক আমাকে কি দেখে এতটাকা লোন দেবে। আমার ভাঁড়ে তো মা ভবানী। কেউ গ্যারান্টারও হবে না।

অর্ক বলে,

—বিজিত, অনিমেষ আজ বাইরে। সে থাকলে এসবের দরকার পড়তো না। অনিমেষ না থাক আমি তো আছি। তোর গ্যারেন্টার হতে পারলে আমি খুশি হবো রে। ও নিয়ে ভাবিস না। তুই কাগজপত্র আন।

—সত্যি অর্ক ভাবতে আশ্চর্য লাগছে তোর মতো বন্ধু আমার মতো ছেলের আছে।

—বিজিত তোর মত ছেলে জীবনের ভিড়ে হারিয়ে যাক এটা আমি চাইনা। তোকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাই। আদর্শ, প্রতিবাদী সমাজে একদিন জয়ী হয়ে, এ বিশ্বাসটুকু হারাতে দিসনা।

বিজিত কথাটা ভাবছে। সে বলে,

—ঠিক আছে। ওসব কাগজপত্র এনে দোব তোকে।

শিখাও বলে,

—যাক্, সুমতি হয়েছে তাহলে। দাদা তোর—

সুজিত এতদিন ধরে অফিসের চেম্বারে বসেছে ফাইলপত্র দেখেছে মাত্র। বড় কারখানা— এখানে কয়েক হাজার কর্মী কাজ করে। তাদের নানাজনের নানা সমস্যা। এসব সমস্যার সমাধান করতে হয় কারখানার কাজ সুষ্ঠুভাবে চালাতে গেলে। সুজিত এতদিন তার সহকর্মীদের উপরই নির্ভর করতো। এরমধ্যে শ্রমিক নেতাদেরও খুশি করতে হয়।

শ্রমিকদের দাবি দাওয়া নিয়ে কিছুদিন ধরে কথা বলছে। সুজিত এসব ব্যাপারে কান ও দেয়না। সে এখন নামী লোক। শ্রমিকদের তুচ্ছ অভাব অভিযোগ। তাদের চিকিৎসা ছেলেমেয়েদের শিক্ষা বাবদ কোম্পানি যে টাকা ধার্য করেছে সুজিত সেসব টাকাও ঠিকমত খরচা করে না। বরং এরমধ্যে বেশ কিছু ভুয়ো মেডিক্যাল বিল মারফত কিছু অসাধু শ্রমিকদের পাইয়ে দিয়েছে।

এ নিয়েই শ্রমিকদের মধ্যে অশান্তি চলছিল এবার তারা আন্দোলনে নামে। আর ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা প্রডাকসন বন্ধ করে দেয়। হইচই পড়ে যায় কারখানায়। অনিমেষ বাইরে। ম্যানেজারবাবু বিপদে পড়েন। নরেশবাবুও খবর পেয়ে চমকে ওঠেন তার কারখানায় শ্রমিক সমস্যা ছিল না কোনদিন। ধর্মঘটও হয়নি কখনও। আজ এতদিন পর এই ধর্মঘট হতে তিনি নিজে আসেন কারখানায়।

আর ধর্মঘটের কারণটা শুনেও অবাক হন। তিনি শ্রমিকদের জন্য যা বরাদ্দ করেছেন তা কম নয়। কিন্তু সেসব টাকা লেবার ওয়েলফেয়ার ফান্ডে ঠিকমত খরচ করতে পারে না। বরং অপচয় করে। তাই নিয়েই এই অশান্তি। নরেশবাবুকে শ্রমিকরা শ্রদ্ধা করে। তিনি এসেই ওদের সমস্যার সমাধান করে। শ্রমিকরাও তাদের দাবি মিটতে আবার কাজ শুরু করে।

নরেশবাবু তার চেম্বারে এবার সুজিতকে ডেকে পাঠান। নরেশবাবু এমনি ভালো মানুষ। কিন্তু কাজে তিনি কোনও ত্রুটি সহ্য করতে পারে না। এসব ঘটেছে সুজিতের জন্য। সহকর্মীদের উপর ঠিকঠাক নজর রাখলে এসব ঘটতো না, অথবা শ্রমিকদের দাবির কথাশুনে সেগুলো যথাযথভাবে মিটিয়ে দিলে এসব ঘটতো না। কিন্তু সুজিত তা করেনি। বরং তা এড়িয়ে গেছে। নরেশবাবু ব্যাবসা বোঝেন। ব্যাবসার ক্ষেত্রে সম্পর্কের কোনও যোগ নেই। তাই বলেন সুজিতকে।

—কোম্পানির কাজ ঠিকমত করতে হবে। ঘণ্টা তিনেকের কাজ। এটুকু তো করতেই হবে। কোম্পানি তার লোকসান সইবেনা। তাদের গুডউইল হারাতে চাইবে

না। তাই তোমাকে আরও সাবধান হতে হবে কোম্পানির কাজে। কথাটা মনে রেখো।

সুজিত বের হয়ে আসে তার ঘর থেকে। আজ নরেশবাবুও ম্যানেজারদের সামনেই তাকে এসব কথা বলেছে। সুজিত মোটেই তাতে খুশি হয়নি। কিন্তু এখন সে চাকরির মোটা মাইনেতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়ে নিজের জালে জড়িয়ে পড়েছে। নরেশবাবু যেন তার কথার মধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন যে এখানে সে একজন কর্মী মাত্র।

সুজিত এবার বুঝেছে টাকা নিলে নিজেকেও সেখানে বিক্রি করে দিতে হয়। খেলার জগতে ও দেখেছে যত টাকাই নিক, টিমের কাছে তার মাথা বিকিয়ে যায়। টিমের জন্য তাকে জানপ্রাণ দিয়ে খেলতে হয় চাকরির ক্ষেত্রেও তাই। মন মেজাজ তার বিষিয়ে ওঠে। একটা অর্থবান শ্রেণীর কাছে সে আত্মবিক্রয় করে দিয়েছে। নরেশবাবুও এদিকে শাসাচ্ছেন।

ওদিকে ফুটবল টিমকে লীগ জিতিয়ে দিতেই হবে যেভাবে হোক। আর বাড়িতেও দেখেছে সুজিত নরেশবাবুর ওই লাডলী মেয়ে নিবেদিতাও তার সঙ্গে আজ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

বারবার নিবেদিতা সুজিতের সেই দৃশ্যগুলোর কথা মনে পড়ে। সুজিতের মন মেজাজ বিগড়ে যায়। মাঠে গিয়েও প্র্যাকটিসে মন দিতে পারে না।

এদিকে মাঠে আগামী খেলা নিয়ে জোরদার আলোচনা চলছে। বেঙ্গল টিম লীগের ফাইনালে উঠেছে। ওদিকে আজ মুম্বাই এ ওদিকের দুটো বিখ্যাত টিমের খেলা হবে। আজই জানা যাবে বেঙ্গল টিমের প্রতিপক্ষ কে হবে? সেইমত এদেরও প্রস্তুতি নিতে হবে। সুজিত আজ ঠিকমত প্র্যাকটিসে মন লাগাতে পারে না। কোচ বলে,

—কি ব্যাপার সুজিত? কদিন দেখছি ঠিক মত প্র্যাকটিসেও যাচ্ছ না, সামনে এতবড় খেলা—এর উপরে আমাদের সকলের ভবিষ্যত রয়েছে। ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যত নির্ভর করছে। আর তুমি সিরিয়াস নও কেন। সুজিত আজ অফিসেও নরেশবাবুর ওইসব কথা শুনে এসেছে। এমনিতে মনমেজাজ ভালো নেই। সুজিতের মনে হয় নিশ্চয়ই নিবেদিতা এ ব্যাপারে ফোনে তার বাবাকে কিছু জানিয়েছে। আজ আবার কোচের কাছে ওইসব কথা শুনে বলে,

—আমি খেলার ব্যাপারে কোনদিনও ফাঁকি দিইনি মিঃ রায়, এসব কথা কেন বলছেন? আজ শরীরটা ভালো নেই।

কোচ ব্যাপারটাকে চাপা দিতে চান। হাজার হোক সুজিত এখন গোটা টিমের মেরুদণ্ড। তাকে চটানো ঠিক নয়। তাই বলেন,

—বলবে তো। তাহলে আজ প্র্যাকটিসের দরকার নেই। বাড়ি গিয়ে রেস্ট নাও গে।

সুজিত বের হয়ে যায় বাড়ির দিকে।

ভবেশবাবু সাবিত্রী সন্ধ্যার আগে পাড়ার পার্কের ধারে মন্দিরে যান। সারাদিন এই ঘরে বন্দি থাকার পর এই সন্ধ্যেটা একটু যেন ছুটি মেলে তাদের। পার্কে একটু

বসেন। সন্ধ্যায় মন্দিরে আরতি দেখে বাড়ি ফেরেন।

নিবেদিতা এইসময় বাড়িতে রয়েছে। কাজের মেয়ে কিচেনে চা বানাতে ব্যস্ত। বিজিত আজ আর দোকানে বেশিক্ষণ থাকেনি। সে কদিন আগে ব্যাঙ্কে ওইসব কাগজপত্র জমা দিয়েছিল। ব্যাঙ্ক তাকে ডেকে পাঠিয়েছিল ওই ব্যাপারে। সেখানে কথাবার্তা বলে ফিরতে দেরি হয়ে যেতে দোকানে না গিয়ে বাড়িতেই ফিরেছে।

নিবেদিতা বিজিতকে বাড়ি ফিরতে দেখে নেমে আসে। সে এরমধ্যে তার নিজের এ্যাকাউন্ট থেকেই পঞ্চাশ হাজার টাকা তুলে এনেছে বিজিতকে দেবে, খামটা নিয়ে নীচে এসেছে। বিজিত বলে,

—কি ব্যাপার?

নিবেদিতা বলে,

—একটা কথা রাখতে হবে তোমাকে, অবশ্য তোমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার আমি করিনি। তবু যদি একটা অনুরোধই রাখো—

বিজিত অতীতের সব কথাই ভুলে যেতে চায়, সে বলে,

—ওসব প্রসঙ্গে আর কেন? কি দরকার বলো?

—তোমার দোকানের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা আমি তুলে এনেছি। এ আমার টাকা। তুমি এখন রাখো—আমাকে নাহয় সুবিধামত শোধ করে দেবে।

বিজিত বলে,

—তোমার টাকার জন্য ধন্যবাদ নিবেদিতা। কিন্তু ও টাকার আর দরকার হবে না, ব্যাঙ্ক থেকে টাকা আমি লোন পাচ্ছি।

নিবেদিতা বলে,

—ব্যাঙ্কের লোন নিতে পারো চড়া সুদে তবু আমার টাকা নেবে না? সুজিত বাড়ি ঢুকছে—হঠাৎ দেখে সে শূন্যবাড়িতে নীচের ঘরে নিবেদিতা আর বিজিতকে। ওরা দুজনে ঘনিষ্ঠ হয়ে,কথা বলছে। বাড়িতে আর কেউ নেই। সুজিতের মনমেজাজ খারাপই ছিল। আজকের দিনে সে বারবার অপমানিত হয়েছে প্রতি পদে পদে। বাড়ি ফিরে দেখে তার স্ত্রীও আজ তার পুরোনো প্রেমিকের সঙ্গে তার অজ্ঞাতসারে গোপন প্রেমলীলা চালিয়ে যাচ্ছে, সুজিত ভিতরে ঢুকে বলে,

—বা! খালি বাড়িতে বেশ দুজনে অভিসার চালাচ্ছে। দাদা তুই যে এত নীচে নামতে পারিস তা ভাবিনি। আর নিবেদিতার হাতে কি? দেখি—

ছোঁ মেরে নিবেদিতার হাত থেকে খামটা নিয়ে ভিতরে এতটাকা দেখে বলে,

—ওই বেকার বাউন্ডুলে প্রেমিককে আমার ঘাম ঝরানো টাকা দেওয়া হচ্ছিল?

বিজিত বলে,

—কাকে কি বলছিস সুজিত? আমার দোকানের জন্য নিবেদিতা টাকা ধার দিতে চেয়েছিল—ওটাকা আমি নিইনি। আর এটা ভদ্রলোকের বাড়ি একজন ভদ্রমহিলা যে তোর স্ত্রী সম্মান রেখে কথা বলবি।

সুজিত ফুঁসে ওঠে,

—তোমরা রাসলীলা করতে পারো—এতদিন ধরে তাই চালিয়ে এসেছো। আর

ধরা পড়ে সাধু সাজা হচ্ছে। ইতর—বাবা-মা তোমাকে দেবতা দেবতা বলে আসলে তুই একটা ল্যুজ ক্যারেকটার-লম্পট।

নিবেদিতাও বলে,

—মুখ সামলে কথা বলবে। তুমিই ইতর-মাতাল—

এবার নিবেদিতার গালে সুজিত সজোরে চড় মারতে যায়। বিজিত ওর হাতটা ধরে একটা মোচড় দিয়ে ওকে সরিয়ে দিতে আর্তনাদ করে ওঠে সুজিত। জানে বিজিতের ক্ষমতা। বিজিত বলে,

—সেদিন তোরে সাবধান করেছিলাম। তবু তুই হাত তুলতে যাস নিবেদিতার উপর। তোর ওই হাতটাই দুমড়ে-মুচড়ে ভেঙে তোকে উচিত শিক্ষা দেবো। নিবেদিতার চোখে জল। সুজিত গজরাচ্ছে,

—আমি ন্যাকা কিছু বুঝিনা তোদের লীলাখেলা। বেকার ফুটপাথের হকার এতবড় সাহস তোর। আমারই বাড়িতে থাকবি আর আমারই গায়ে হাত তুলবি? তোকে পুলিশে দোব জেলের ঘানি টানাবো। একটা গুণ্ডা মস্তান ইতর।

এসে পড়েন ভবেশবাবু সাবিত্রী। সাবিত্রী আর্তকণ্ঠে বলে,

—কি যাতা বলছিস সুজিত তোর দাদাকে।

—দাদা, একটা ল্যুজ ক্যারেকটার। জিজ্ঞাসা করোনা ওরা দুজনে কি করছিল।

নিবেদিতা বলে,

—আর কত মিথ্যা কথা বলবে? যা-তা কথা।

—সট আপ। আমার বাড়িতে থেকে আমাকে মারতে আসবে। এসব আমি টলারেট করবোনা। একটা ফুটপাথের হকারের এত সাহস।

ভবেশবাবু বলেন,

—চুপ কর সুজিত। এসব তোর ভুল ধারণা।

নিবেদিতার চোখে জল। সুজিত বলে নিবেদিতাকে,

—চলো উপরে চলো। তারপর দেখছি এর বিহিত আমি করবোই।

বিজিত বলে,

—সুজিত। শুনে যা তুই যা বলেছিস সব মিথ্যা। একবর্ণও সত্য নয়। কোনও কিছুর উপর আমার লোভ বা মোহ নেই। থাকলে এই সংসারের চেহারাটা অন্যরকম হতো। আর হ্যাঁ—বাড়িটা তোরই। আমি এবাড়ি ছেড়ে চলে যাবো। আজই এক্ষুণি চলে যাচ্ছি। তোরা সুখ শান্তিতে থাক। আমার জন্য তোদের সুখের জীবনে অশান্তি ডেকে আনিস না।

সাবিত্রী বলে,

—তুই চলে যাবি এখান থেকে। ওরে বিজিত—

ভবেশবাবু সবই দেখেছেন, শুনেছেন, বলেন তিনি,

—তাই যা তুই এখান থেকে চলে যা বিজিত। এরা তোর কোনও দামই দেয়না সংসারকে তুই সব দিয়েছিস— সংসার তোর সব কিছু কেড়ে নিয়ে তোকে বঞ্চনার জ্বালায় জ্বালিয়ে তোকে ছিবড়ে করে ফেলে দিয়েছে। তুই যা চলে যা। এই বিষ

সংসারের বাইরে গিয়ে নতুন করে বাঁচার চেষ্টা কর। যা চলে যা তুই। আমাদের যা হবার হবে।

সাবিত্রীর মায়ের অন্তর হাহাকার করে ওঠে।

—ওরে বিজিত, না গো এতুমি কি বলছ—না।

—ওকে বাধা দিয়োনা। বিজিতকে এ জগতে নিজের ঠাঁই খুঁজে নিতে দাও আর ওকে বাধা দিয়ো না। আমি তোকে মুক্তি দিলাম বাবা।

বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর বেদনায় রুদ্ধ হয়ে আসে।

পথের হকারদেরও একটা আশ্রয় থাকে—হাতিবাগানের ওদিকে একটা এঁদো গলির মধ্যে ভাঙা চোরা পুরোনো বাড়িটাতে হকারদের অনেকে আশ্রয় নিয়েছে। প্যালেস্তারা খসা ঘরের দেওয়াল মেজেতে মাদুর পাতা সারাদিনের হাকাঁহাকিঁর পর রাতে ক্লান্ত হয়ে ওরা ঘরে ফিরে এবার নিজেরাই রুটি তরকারি বসাচ্ছে। কেউ সারা দিনের বিক্রি বাটার হিসাব করছে, কোন ঘরে তারা তাস খেলতে বসেছে। বিজিতকে দেখে ওরা খুশি হয়।

—আরে দাদা যে। হঠাৎ—

বিধ্বস্ত বিজিত বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে। ও বাড়িতে থাকার আর ইচ্ছা তার নেই। অর্কের ওখানে যেতেও চায়নি। অসহায় বাবা-মাকে ছেড়ে যেতেও চায়না সে। তাই এখানেই এসেছে। আজ এই হাতভাগ্য হকারাই তার সুখ-দুঃখের সাথী আপনজন।

বিজিত বলে,

—বাড়িতে আর থাকা যাবে না রে। বড়লোকদের বাড়িতে হকারের ঠাঁই নেই। তাই তোদের কাছেই এলাম। যদি থাকার জায়গা পাই।

মদন, বিষ্টুরা বলে,

—তোমার জন্য ঠাঁই এখানে সবসময়ই ছিল বিজিতদা। আর বলোতো একটা খাটিয়া এনে দিই এই ঘরে। একেবারে ফুলশয্যা বানিয়ে দোব। উইদাউট বউ—পঞ্চা বিজিতের জন্য একখানা খাটিয়া নিয়ে আয় এই জানলার ধারে পাতবি।

—তার অবশ্য দরকার হবে না। মাটিতেই মাদুর পেতে নেবো।

মদনা বলে,

—আবে দেখছিস কি? যা নাকুর দোকান থেকে গুরুর জন্য একখানা মাদুর, চাদর, বালিশও নিয়ে আয়। বোস বিজিত—চা খাও—

বিষ্টু কিচেনে ব্যস্ত। লোকদের হাঁক পেড়ে বলে,

—শিবু, বিজিতদাও আজ থেকে এখানে খাবে। ওর খবরও নিবি? রাতে রুটি তো?

বিজিতও এদের উষ্ণ আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়ে বলে,

—তাই কর।

সহজেই সে এদের একজন হয়ে যায়। অভাবের মধ্যে থাকা মানুষদের মধ্যে

সহজেই একটা সমঝোতা হয়ে যায়। কিন্তু হঠাৎ বড়লোক হওয়া মানুষগুলো বোধহয় আরও বেশি স্বার্থপর হয়। তাই তাদের আপনজনেরাও পরই হয়ে ওঠে। বিজিতের পায়ের নীচে মাটি নেই। এতদিন একটা আশ্রয় ছিল আজ সেটাও কেড়ে নিয়েছে ভাগ্যবিধাতা। অবশ্য বিজিত নিজের জন্য কোনদিনই ভাবেনি। তাই কিছু হারাবার দুঃখ তার আর নেই। এই হকাররাই আজ তার বন্ধু এবং আপনজন।

ভবেশবাবু, সাবিত্রী দেবী নিচতলাতে রয়েছেন। রাত নামে উপরের তলায়। একটু আগে পর্যন্ত সুজিতের তর্জন-গর্জন শোনা যাচ্ছিল এখন তারাও বোধহয় শুয়ে পড়েছে নীচের তলায়। এরা বৃদ্ধ বৃদ্ধা পড়ে আছে। কদিন এই ঘর তাদের পূর্ণ ছিল। সেদিন ওই অভাব কষ্টের মধ্যে ভবেশবাবু দিন কাটিয়েছেন। বিজিত সুজিত শিখাও ছিল।

ভবেশবাবু স্বপ্ন দেখতেন তার ছেলেরাও মানুষ হয়ে তার পাশে দাঁড়াবে। তার ঘরে সুখে শান্তিতে বাস করবে। মানুষ ভাবে এক, আর ঘটে অন্যরকম। আজ তার সব আশাস্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে গেছে। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আজ তিনি নিঃস্ব রিক্ত নিঃসঙ্গ। সবই আছে অথচ কিছুই তার নেই। বিজিত ছিল তার বল ভরসা- আজ সেই বিজিতকেই এই বাড়িতে রাখার অধিকার তার নেই। বিজিতও পথে হারিয়ে যাবে এটা ভাবতে পারে না ভবেশ। এযে মানবিকতার চরম অপমান। সমাজে শুভবুদ্ধি কি হারিয়ে গেছে—যে মানবিকতার কোনও মূল্যই দেবে না।

সাবিত্রীও ভবেশকে ছটফট করতে দেখে। বলে,

—ঘুমোও।

ভবেশবাবু বলেন,

—ঘুম আসছে না গো। কি থেকে যে কিসব হয়ে গেল—বিজিতটা কোথায় গেল?

সাবিত্রীও জানে না। তবু বলে,

—ও ঠিক আসবে। ওর জন্য ভেবনা।

প্রতিদিনের মত আজও ভোর হয়। সকালের আলো ফোটে। কলকাতা শহর আবার জেগে ওঠে। অন্যদিন নিবেদিতা সকালে নিচের কিচেনে আসতো তার কাজের মেয়েকেও পাঠাতো চা করতে। আজ কেউ আসেনি। উপরের কিচেনেই ওদের রান্না হচ্ছে। সুজিত কড়া ভাষায় মানা করেছে নীচতলার সঙ্গে আর মাখামাখি নয়। তাই, নিবেদিতাও আর অশান্তি বাড়ার ভয়ে নীচে আসেনি।

সাবিত্রী দুকাপ চা করে আনে। ভবেশকে দেয় নিজেও খায়। ব্যাপারটা ভবেশও লক্ষ্য করেছে। অনেকদিন ভবেশবাবু বাজার যাননি। চোখেও কম দেখেন বৃদ্ধ। আজ বিজিতও নেই। বাজার যেতে হবে—তাই সাবিত্রী বলে,—হ্যাগো বাজারের কি হবে?

ভবেশবাবু বলেন,

—আমিই যাচ্ছি কোনরকমে—কিছু নিয়ে আসি, অন্ন চিন্তা বড় চিন্তা এই বয়সে আবার সেই চিন্তা করতে হবে।

—সাবধানে যেয়ো। গাড়ির যা ভিড়।

ভবেশবাবু বের হন,

ওদিকে সুজিতের ড্রাইভারও বাড়ির বাজার করে এনে দোতলায় উঠে যায়, ভবেশবাবু চলেছেন বাজারের দিকে। পথে এসময় ভিড় শুরু হয়েছে। হঠাৎই কার ডাকে চাইলেন ভবেশবাবু। পিছন ফিরে দেখেন বিজিত ডাকছে। বাবাকে দেখে বিজিত এগিয়ে আসে। বলে,

—কোথায় চললে?

বিজিত বাজারে। ঘরে তো কিছুই নাই।

বিজিত হাতের থালিটা ভবেশবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেন,

—বাজারে যেতে হবে না বাবা। আমিই সব এনেছি—রোজ সকালে তুমি পার্কে আসবে, আমি এখানেই তোমার সব পৌঁছে দেব। মাকে ভাবতে নিষেধ করো—আমি ভালোই আছি।

ভবেশ দেখছে বিজিতকে। সে চলে গেলেও তাদের কথা ভোলেনি। সকালে সব কিছু পৌঁছে দিতে এসেছে। একটা রিক্সা ডেকে তাতে মালপত্র সমেত বাবাকে তুলে দিয়ে বলে,

—বাড়ি চলে যাও। কাল সকালে আসবো।

ভবেশ জানে তার ছেলেকে। সে ওই বাড়িতে আর যেতে চায় না, ভবেশবাবু বলেন,

—কোথায় আছিস তুই?

বিজিত বাবাকে ঠিকানা জানিয়ে বলে,

—হাতিবাগানের কাছ একটা বস্তির মধ্যে মেসে। তুমি আবার ওদের মেসে গিয়ে হাজির হয়ো না। কাল আসবো এইসময় এখানে। তুমি সাবধানে থেকো। আর খুব দরকার হলে এই নাম্বারে ফোন করে খবর দিয়ো। ওরা আমাকে জানিয়ে দেবে।

বিজিত বাজারের এক চেনা দোকানদারের ফোন নাম্বারও দেয়।

—যদি জরুরি দরকার পড়ে খবর দিতে পারবে।

সাবিত্রী ভবেশবাবুকে এত তাড়াতাড়ি এতসব জিনিসপত্র নিয়ে ফিরতে দেখে বলে,

—কি ব্যাপার? এত তাড়াতাড়ি ফিরলে। আর এতসব গুছিয়ে বাজারও করে এনেছো।

—আমি করিনি। বিজিতই সব বাজারপত্র করে আসছিল, আমায় দিয়ে গেল। বলেছে কালও সব বাজার করে দিয়ে যাবে।

—বাড়িতে এল না।

—ওকে তো চেন—এবাড়িতে ও আসতে চায় না। তবে কি জানো ও রাতের ধ্রুবতারার মত অন্ধকারে আমার আলো হয়ে জ্বলছে। ও একদিন সুখী হবেই বড়বউ। ঈশ্বর ধর্ম বলে যদি কিছু থাকে ওকে তার স্বীকৃতি একদিন দেবেই।

সুজিত এবার থেকে আরো কঠিন হাতে তার সংসারের শান্তি বজায় রাখতে চায়। নিবেদিতাকে বলে,

নীচের তলায় আর যাবে না। ওরা যা করে করুক—এবার আমি এই বাড়ি

বিক্রি করে সাউথের দিকে চলে যাবো।

—সেকি! তোমার বাবা-মায়ের বয়স হয়েছে। তাদের প্রতি তোমার কোনও কর্তব্য নেই। বাড়ি বিক্রি করলে ওরা যাবে কোথায়? ওদের কথা ভেবেছ?

—ওদের জন্য যত না দরদ—তার চেয়ে বেশি ভাবনা দেখছি ওই বিজিতের জন্য। তাই ওদের সর্বনাশের মুখে রেখেই চলে যাবো। যা পারে করুক—এই হবে ওদের উচিত শাস্তি। আমার গায়ে হাত তুলবে আর তাই টলারেট করব? নেভার—

—সে কি?

—শোন। এদিকে তোমার বাবার চাকরি, এদিকে খেলার চাপ। রাজ্যজয় করে দিতে হবে। তোমার বাবার চাপে নাজেহাল হয়ে গেছি। তুমি আর একদিন আমায় জ্বালাতন করো না। খুব টেনশনে আছি।

বের হয়ে যায় সুজিত। নীচের তলায় দুই অসহায় বৃদ্ধ বৃদ্ধার খবর নেবার মতো সময়— প্রয়োজন কোনটাই তার নেই। নিবেদিতা আজ নিজেকে অপরাধী মনে করে। তার রাগ হয় সুজিতের উপর। সেই তাকে ঠকিয়েছে। অপমানও করেছে। এদের সংসারে সে হয়ে উঠেছে সব অশান্তির কারণ। কাজের মেয়েই খবর আনে নীচে দাদাবাবুও বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে।

নিবেদিতা বিজিতকে ভালোমতই চেনে। সুজিতের বাড়ি একথাটা জানিয়ে দেবার পর বিজিতের মতো ছেলে এখানে থাকবে না সেইটাই ভেবেছিল। আর বিজিতও তাই করেছে। নিবেদিতা বলে,

—তাহলে নীচের গিন্নিমা কর্তাবাবু ওদের কি হবে?

কাজের মেয়ে বলে,

—দিদিমণি বিজিতবাবু মানুষ নয়। ওকে এঁরা চিনল না, বাড়ি ছেড়ে গেছে তবু আজ সকালে নিজে এসে কর্তাবাবুকে পথে ধরে সবকিছু কিনে রিক্সায় করে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে।

নিবেদিতা অবাক হয়। দেখেছে সে সুজিতকে আর বিজিতকে। দুজনে দুই মেরুর বাসিন্দা। একজন নিজের ভবিষ্যৎ আর স্বার্থ ছাড়া কিছুই দেখল না। অন্যজন নিজের কথা কোনদিনই ভাবেনি। সে শুধু দিয়েই গেছে। বিনিময়ে কিছুই চায়নি। আর তাকেই নিবেদিতা সবচেয়ে বেশি অপমান করেছে। আজ তাই তার নিজের উপরে রাগ হয়। এই শাস্তি তার প্রাপ্য বলেই মেনে নিয়েছে নিবেদিতা।

খেলার বাজারে ঝড় ওঠে তখন। জাতীয় লীগ-এর ফাইন্যালে উঠেছে বেঙ্গল ক্লাব—অন্যদিকে উঠেছে গোয়ার এক টিম। এবার ওই দুইটিমের মধ্যে ফাইন্যাল খেলা হবে। জিতলেই হবে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন। আর পয়েন্টের হিসাবেও ওরা এগিয়ে আছে। তাই জিতে আগামী বিশ্বকাপে ওদের যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সব খবরের কাগজে সেই আলোচনা। এই খেলায় যদি সুজিত দু-তিনটে গোল করতে পারে তাহলেই টিম জিতে যাবে। বিশেষজ্ঞরা গবেষণা করে কি ভাবে কি হতে পারে সেইসব তথ্য জানাচ্ছেন।

নরেশবাবু, বিপুলবাবুরাও এবার খেলোয়াড়দের নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছেন—জোর কদমে প্র্যাকটিস চলছে। মিটিং চলছে গেম প্ল্যান নিয়ে। মাঠের গ্যালারিতে এখন থেকেই প্র্যাকটিস দেখতে হাজার হাজার উৎসাহী দর্শক এসে ভিড় করেছে। পুলিশ তাদের সামলাতে হিমসিম খাচ্ছে। পথে-ঘাটেও ওই আলোচনা চলছে, সারা বাংলার ফুটবলপ্রেমী দর্শকদের কাছে।

বিজিত এখন এই মেসে আছে। সকালে উঠে একবার তাদের পুরোনো পাড়ার পার্কে আসে। বাজার নিয়ে বাবার হাতে দেয়। এখন সকালে পার্কে ভবেশবাবুর সাথে সাবিত্রীও আসে ছেলের সাথে দেখা করতে। সাবিত্রী বলে,

—বাড়ি যাবি না বিজিত?

বিজিত বলে,

—যদি নিজের আস্তানা কোনদিন করতে পারি সেদিন তোমাদের আমার কাছে নিয়ে আসবো মা। তার আগে ওখানে আর যেতে বলো না। বাবার ওষুধগুলোও এনে দিয়েছি। দেখে নাও।

ভবেশবাবু বলে,

—সব ঠিক আছে রে। তুই সব খবর নিস, বাইরে থেকে। আর ঘরে যে আছে সে তো বেঁচে আছি না মরে গেছি সে খবর নেয় না।

—তা জানি বাবা। তবে ওর মাথাতেও অনেক টেনশন সামনে বড় খেলা তাই হয়তো তোমাদের দিকে ঠিকমতো নজর দিতে পারছে না।

ভবেশবাবু বলেন,

—তুই সত্যি বিচিত্র রে। যে তোকে মিথ্যা বদনাম দিয়ে ঘরছাড়া করলো তার বিরুদ্ধে তোর কোনও অভিযোগ নেই।

বিজিত ওই প্রসঙ্গ এড়াবার জন্য বলে,

—বাবা বেলা হয়েছে, তোমরা বাড়ি যাও, কাল দেখা হবে মা তোমার জর্দাটা কালই এনে দোব। আজ ভুলে গেছি।

সাবিত্রী বলে,

—এত মনে থাকে তোর।

বিজিত হাসে। ওরা চলে যায়। বিজিত বড় রাস্তার দিকে ফিরে আসছিল। হঠাৎ নিবেদিতাকে দেখে থমকে দাঁড়ায়, বিজিত বলে,

—তুমি যাচ্ছিলে কোথায়?

নিবেদিতাও শুনেছে বিজিত সকালে এদিকে আসে। তাই আজ সুজিত বের হয়ে যেতে নিবেদিতা নিজেই এসেছে। সে-ও বিজিতের উপর লক্ষ্য রেখেছিল। ভবেশবাবুরা চলে যেতে এবার এগিয়ে আসে।

নিবেদিতা বলে,

—তোমাকে দেখতে এসেছিলাম। তুমি কি সত্যিই বাড়ি ফিরবে না। সুজিতকে

ক্ষমা করতেও পারবে না? সবার জন্য আমিই দায়ী।

বিজিত বলে,

—না-না, নিবেদিতা কারোও বিরুদ্ধে আমার কোনও অভিযোগ নেই। সুজিত ছেলেমানুষ হয়তো ভুল করেছে। তাই ওসব ভুল বোঝাবুঝি যাতে না হয় তাই সরে এসেছি। ওর উপর রাগ করবো কেন? সমাজে বাস করতে গেলে সবকিছুকে সহজভাবে মেনে নেওয়াই ভালো সেই চেষ্টাই করছি। যাও বাড়ি যাও নিবেদিতা।

বিজিত চলে গেল। নিবেদিতা দেখছে ওকে। তার এতদিনের সব হিসাব ওই বিজিত কেমন গোলমাল করে দিয়েছে।

বিজিতদের মেসের অধিকাংশ হকারই বেঙ্গল টিমের সমর্থক। তাদের মধ্যেও এখন জোর আলোচনা চলে। আমাদের টিমই চ্যাম্পিয়ন হবে। বিশ্বকাপ খেলতে যাবে। আর সুজিত থাকতে গোলের অভাব হবে না। ফাইন্যাল খেলাতেই দেখবি তিনখানা গোলই করবে।

এ পর্যন্ত সুজিতই বেশি সংখ্যক গোল দিয়েছে। এবার সেই ভরসা।

ব্রজবাবুরা বসে নেই। তাদের ওই ফাটকা কোম্পানিও এবার সারা দেশের এই খেলাকে কেন্দ্র করে যে উন্মাদনা শুরু হয়েছে তাকে কেন্দ্র করে বাণিজ্য শুরু হয়েছে। গোয়ার টিমও বেশ শক্তিশালী তাদের পিছনেও ধনী সমর্থকের দল। তারাও চাইছে এই খেলায় জিতে রেকর্ড করতে।

এদিকে বেঙ্গলকে ঘিরে উন্মাদনা তুঙ্গে। তাই বাজীর দর বেড়ে গেছে। সারা ভারতের বিভিন্ন শহরে এসমস্ত খেলায় বাজী ধরার লোকের অভাব নেই। লাখ লাখ কালো টাকার খেলায় সামিল হয়ে মোটা দুনম্বরী টাকা রোজগার করার জন্য এখন একটা বিরাট সংখ্যক লোক এসে গেছে। তারাই মোবাইল ফোনে লাখ লাখ টাকার বাজী ধরছে।

গোয়ার টিমের দর পাঁচ টাকায় পঞ্চাশ টাকা আর বেঙ্গলটিমের নিশ্চিত জয় জেনে তার রেট দিয়েছে পাঁচ টাকায় দশটাকা। ওই লাখ টাকার মধ্যে সকলেই প্রায় নিশ্চিত ডবলটাকা পাবার জন্য বেঙ্গল টিমের হয়েই লাখ লাখ টাকার বাজী ধরেছে, গোয়ার টিমের জন্য বাজী ধরেছে কমই সবাই বাজী ধরেছে বেঙ্গল টিমের হয়ে।

ব্রজ-অখিলরাও আশা করেনি যে এই খেলাকে কেন্দ্র করে এমন বাজীর টাকা আসবে। তাদের অফিসে লোকজন আসছে ফোন আসছে। সারা কলকাতা মফস্বল শহরের হাজার হাজার লোক বেঙ্গল টিমের হয়ে প্রায়ই কোটি টাকা বাজীই ধরেছে। তারা জানে গোয়ার চান্স খুব কম। গোয়ার টিমকে সুজিত গোল দেবেই তাই বেঙ্গল টিমের দিকে বাজীর পাল্লা উঠেছে প্রায় কোটি টাকার।

ব্রজবাবু অখিলও ভাবছে কথাটা। যদি কোনরকমে খেলার ফল ঠিক উল্টো করে দিতে পারে তাহলে তাদের পকেটে আসবে এই বাজীর টাকার সিংহভাগ। গোয়ার হয়ে যেকজন বাজী ধরেছে তাদের পেমেন্ট করতে হবে অনেক কম টাকা। তাদের

দিয়ে-থুয়েও এদের যা টাকা থাকবে তা প্রায় কোটির কাছাকাছি তাদের ভাগ্য ফিরে যাবে।

তাই ব্রজ অখিল বাবুরাও এবার ভাবছে কথাটা। তাদের পি.এ লিজাও বসে নেই। এরমধ্যে সে-ও সুজিতের অনেক কাছের মানুষ হয়ে উঠেছে। ব্রজই কথাটা বলে,

—লিজা, একদিন সুজিত বাবুকে এখানে আনো। ওকে একটু দরকার। লিজা এখানে কাজ করে। এদের অন্ধকারের ব্যাবসার সব খবর জানে। ক্রিকেট ম্যাচের সময় ও কি হয় তাও দেখেছে। ফোনে ফোনেই বাজীমাত করে এরা।

—হঠাৎ সুজিতবাবুকে কি দরকার।

ব্রজবাবু বলে,

—একটা কাজ করতে হবে। অবশ্য যদি ঠিকমত ম্যানেজ করতে পারো সুজিতকে তোমারও ভালো আমদানী হবে।

—ঠিক আছে। দেখি যদি আনতে পারি।

ব্রজবাবু বলেন,

—আনতে পারো নয়—তাকে যেভাবে হোক আনতেই হবে, বুঝেছ?

ব্রজবাবু-অখিলদের অফিসটা একেবারে আধুনিকভাবে সাজানো দেখে মনে হবে সত্যি কোনও বড় কোম্পানির মালিকদের চেম্বার। মেঝেতে পুরু কার্পেট পাতা ঘরে এয়ার কুলার চারিপাশে মোজাইক, দেওয়ালে সুন্দর পেন্টিংস লাগানো। দামী আসবাব ছড়ানো। ওদিকের একটা ঘরে ফ্যাক্স-কম্পিউটার বেশ কয়েকটা ফোনও রয়েছে সবসময়ই ফোন বাজছে দু-তিনটে। লোকজন কাজ করছে।

লিজা এনেছে সুজিতকে। সুজিত অবশ্য প্রথমে আসতে চায়নি। সন্ধ্যার পর ক্লাব থেকে বের হয়েছে লিজাই বলেছে তাকে। সুজিত বলেছে,

—টায়ার্ড লিজা। পরশুই খেলা।

—আধ ঘণ্টার মধ্যে ছেড়ে দোব। প্লিজ চলো সুজিত। সুজিত তাই এসেছে ব্রজবাবুদের চেম্বারে। ঠান্ডা ঘরে এরমধ্যে পার্টিও জমে উঠেছে।

ব্রজবাবুও এনেছে দামী সিগার্স রিগ্যাল স্কচ। কলকাতায় যা সহজে পাওয়া যায় না। তার সঙ্গে নানা রকম চাট — ফিসফিংগার, স্যালাড। সুজিত এর মধ্যে ওই দুর্লভ মদ কয়েক পেগ গিলেছে। ব্রজবাবু বলে, নিন সুজিতবাবু,

সুজিত বলে—সিগার্স রিগ্যাল পেলেন কোথায়?

—শুধু এই নয় মশাই। সিঙ্গাপুর থেকে রয়াল স্যালুট স্কচও এনেছি কয়েক বোতল। অখিল চারটে রয়্যাল স্যালুট ওর গাড়িতে তুলে দাও।

সুজিত এই উৎকৃষ্টতম স্কচ এদেশে দেখেনি। লিজা এর মধ্যে সুজিতকে বেশ কয়েক পেগ খাইয়ে ওকে ফিট করে তুলেছে। নেশার ঘোরে মানুষও তার মনের সুপ্ত জ্বালাগুলোর কথাই প্রকাশ করে হালকা হতে চায়। ব্রজবাবুও তাই নরেশবাবুদের বেঙ্গল টিমের কথাই পেড়েছে, আর নরেশবাবুর কথাও। উনি নাকি টিমকে চালান ডিটেকটারের মত। প্লেয়ারদের টাকা দেন। কিন্তু প্রাপ্য সম্মান দেন না।

সুজিতও দেখেছে নরেশবাবু। বিপুলবাবুদের ব্যবহারে সেইটাই ফুটে উঠেছে।

সুজিত বলে, —কারেক্ট। আর চাকরি করি ওভাবে আমি যেন ওর চাকর। তেমন সুযোগ পেলে আমিই বিজনেস করবো। ওঁর তাঁবে থাকব না। শালা যেমন বাপ—তেমন মেয়ে। আমার উপর নজরদারি করে।

ব্রজবাবু বুঝেছে যে ক্ষেত্র প্রস্তুত। তাই সে-ও এবার বলে—

—তাই বলছিলাম আপনি আমাদের বিজনেসে আসুন। এখানে টাকা দিতে হবে না। কোম্পানিই আপনাকে টাকা দেবে। লাখ-লাখ টাকা।

টাকার গন্ধ পেয়ে লোভী সুজিত এবার উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। কৌতুহলী কণ্ঠে বলে—

—লাখ লাখ টাকা দেবে কোম্পানি আমায়।

—হ্যাঁ। আর ওই নরেশবাবুদের ওখানেই আপনি চাকরি করবেন। ওদের কোম্পানি এখন বিদেশে বিরাট মার্কেট করেছে। ওখানের বাজারের খবর চাই। তারজন্য ধরুন আপনাকে আমাদের কোম্পানি বিশ লাখ টাকা দেবে। বলেন তো আজই দশলাখ দিচ্ছি বাকি দশলাখ দেব দুদিন পর।

সুজিতের নেশা ছুটে গেছে এত টাকার অফার পেয়ে। বিড় বিড় করে সে।

—বিশলাখ টাকা।

—হ্যাঁ! তাই দেব—এখুনি—

ওরা তৈরিই ছিল। ব্রজবাবুর ইঙ্গিতে অখিল ওদিকের আলমারি খুলে একটা এটাচি বের করে আনে। ব্রজবাবু সেটা সুজিতের সামনে খুলতেই সুজিতের চোখে পড়ে এটাচিতে রাখা পাঁচশো হাজার টাকার বান্ডিলগুলোর দিকে। তার চোখে তখন লুব্ধ চাহনি। এত টাকা একসঙ্গে সে জীবনে দেখেনি।

ব্রজবাবুও দেখেছে সুজিতের মুখ-চোখের পরিবর্তনটা। মনে হয় এবার টোপ গিলবে। ব্রজবাবু বলে,

—দশলাখ আছে এতে। আজ এই দশ রাখুন আর বাকি দশলাখ পাবেন পরশু রাত দশটায় এখানে। তবে একটা ছোট শর্ত আছে সুজিতবাবু। সুজিত এবার ঢোক গিলে বলে,

—শর্ত! কি শর্ত।

এবার ব্রজবাবুর ইঙ্গিতে লিজা ওকে আরও মদ দেয়। সুজিতও নতুন উদ্যমে লিজার জন্য মদ গিলতে থাকে। ব্রজবাবু বলে,

—পরশু তো লীগের ফাইনাল খেলা। ওই খেলাতে আপনি প্রাণপণে খেলবেন তবে কোনও গোল করতে পারবেন না।

এরপর অবাক হয় সুজিত।

—খেলবো প্রাণপণে অথচ কোনও গোল করবো না।

—না।

—কিন্তু টিম তো গোল না পেলে হেরে যাবে।

সুজিতের কথায় ব্রজবাবু বলে,

—ওইটাই শর্ত। আপনি খালি গোল করবে না। আরে মশাই সবদিন কি কোনও প্লেয়ার গোল পায়? না সব খেলাতে আপনি গোল করেছেন?

সুজিত কথাটা বুঝতে পেরেছে। সে বলে,

—না সবদিন গোল পাইনি।

—তবে? পরশুর খেলাতে তাই হবে। সবাই দেখবে দারুণ খেলেছেন। তবে গোল পাননি। আর এই কৌশলে খেলায় আপনার টিমকে হারাতে পারলে আপনি পেয়ে যাবেন কুড়ি লাখ টাকা। আজ এই দশলাখ তারই এ্যাডভান্স।

সুটকেশে রাখা নোটগুলোকে একভাবে দেখছে সুজিত। এরমধ্যে টাকা দেখে তার স্বার্থপর লোভী মন ও কৌশলটার কথা ভেবে নিয়েছে এতগুলো টাকা বাড়তি পেয়ে যাবে সে। তাই এতটাকা হাতছাড়া করতে চায় না সুজিত। ব্রজবাবু বলেন,

—কি এত ভাবছেন সুজিতবাবু? হাতের লক্ষ্মী পায়ে ফেলবেন না—একটা আধটা টাকা নয় মশাই কুড়িলাখ টাকা।

সুজিত এর মধ্যে রণকৌশলটা ভেবে নিয়েছে। কেউ জানতেও পারে না তার এই টাকা নেবার কথা। মাঠেও সে ঠিকমতই খেলার ভান করবে তবে গোল দেবে না। সুজিত বলে,

—বাকি টাকা ঠিকমতো পাবো তো?

—সিওর। বলেন তো পোস্টডেটেড চেকই দিতে পারি।

—না-না। চেকে টাকা নিলে প্রমাণ থেকে যাবে।

—ক্যাশই দেব। কথার নড়চড় হবে না মশাই। বান্দা দুনম্বরী করে ঠিক কিন্তু কথায় আমরা এক নম্বরী। কথায় এক নম্বরী। এসব বিজনেসে কথার নড়চড় হবে না মশাই। আপনিও কথার নড়চড় করবেন না তাহলে আমি কথার নড়চড় করব না।

রাত নামে। সুজিত আজ খুশি মনে বাড়িতে ফিরছে হাতে সেই দশলাখ টাকার এটাচি। আর বাকিটাও দু-একদিনের মধ্যে পেয়ে যাবে। এবার ওই পুরোনো বাড়ি বিক্রি করে সুজিত সাউথ ক্যালকাটার কোনও পশ এলাকায় ফ্ল্যাটে উঠে যাবে। এবার তার পদোন্নতি হবে। ওই অতীত জীবনকে ভুলে পিছনের সব পরিচয় মুছে ফেলে সুজিত এবার অভিজাত সমাজের মানুষদের একজন হবে।

বাড়িটা স্তব্ধ হয়ে গেছে। নিবেদিতার ঘুম আসেনি। নীচের তলায় কোনও সাড়া নেই। ওরা ও কি যেন আজানা ভাবনায় স্তব্ধ হয়ে গেছে। ফিরছে সুজিত নিবেদিতা দেখছে ওকে। হাত একটা নতুন এটাচিও রয়েছে। সেটা নিয়ে সুজিত নিজের বেডরুমের আলমারী খুলে রেখে দিয়ে আলমারির তালাবন্ধ করে।

—নতুন এটাচি। কি আছে ওতে?

নিবেদিতার প্রশ্নে যেন একটু থতমত খেয়ে যার সুজিত। সেটাও নিবেদিতার নজর এড়ায় না। সামলে নিয়ে বলে সুজিত।

—ইয়ে। অপিসের কিছু দরকারি কাগজপত্র আছে। কদিন খেলার জন্য অফিস যেতে পারবো না। বাড়িতে বসেই কাজ করতে হবে। তাই অফিস থেকে ওসব নিয়ে এসেছে।

সুজিত জবাব দিয়ে টয়লেটের দিকে চলে গেল? নিবেদিতাও একটু অবাক হয়। অফিসের কাজতো বাড়িতে আনে না। কে জানে। সে-ও এবার কাজের মেয়েকে খাবার দেবার জন্য বলতে যায়।

সংবাদপত্র আর টিভিতে এখন ওই ফাইন্যাল খেলার খবর। সারা শহর ফুটবল জ্বরের কবলে পড়ে কাঁপছে। ওদিকে বেঙ্গল টিমই ফেবারিট ব্রজবাবুদের অফিসে তখন কর্মব্যস্ততা। সারা শহরের অলিতে-গলিতে তখন সাট্টার পেনসিলার-এর দল। তারা সাধারণ মানুষ থেকে সব শ্রেণীর মানুষের কাছ থেকে টাকা কুড়োয় সাট্টার নামে। হাজার হাজার টাকা। আর সেসব টাকা আসে কলকাতার ঠেকে, ব্রজবাবুদের মত অনেক দামী কোম্পানিই গোপনে এসব কারবার করে বহু টাকা তোলে। ব্রজবাবুদের হাতেই এসে গেছে কয়েক কোটি টাকা এই খেলাকে কেন্দ্র করে। আর বেঙ্গল টিমকে যদি হারাতে পারে গোয়ার টিম, ব্রজবাবুদের এই খেলায় কোটি টাকা আমদানী হবে।

ব্রজবাবুরাও তাই গোপন পথে এইসব কাজই করার চেষ্টা করে। অবশ্য এসব খবর গোপন থাকে।

বিজিতদের মেসেও এই খেলার হারজিৎ নিয়ে তুমুল তর্ক হয়। মদন কেষ্টোর দল তো বেঙ্গল টিমের সমর্থক। বিজিতও শোনে ওদের কথা।

—আরে আমাগোর সুজিত আছে। দেখবি গোয়ার ওই টিমে তিনখান গোলই দেবে। সিওর উইন।

মেসেও খেলা দেখার জন্য সাজসাজ রব পড়ে গেছে। সারা কলকাতায় ব্যানারে ফেস্টুন নিয়ে সমর্থকরা গাড়ি ঘোড়া বন্ধ করে চলেছে মাঠের দিকে

বিজিত বলে,

—মদন আমাকেও একখানা টিকিট জোগাড় করে দিতে হবে।

মদন বলে,

—তুমি যাবে? আরে তোমার টিকিট আইনা দিমু।

বিজিত অবশ্য কোনদিন তার পারিবারিক কোনও কথা এদের জানায়নি। ওরাও জানে না যে এই পথের হকার বিজিত সুজিতের বড় ভাই। বিজিত এসব কথা ইচ্ছা করেই জানায়নি।

ওরা হয়তো বিশ্বাসই করবে না। হাসাহাসি করবে। আর বিশ্বাস করলে সুজিত সম্বন্ধে ওদের শ্রদ্ধা ভক্তিই উবে যাবে। এইসব ভেবে বিজিত তার পরিচয় গোপন রেখেছিল।

অনিমেষ বিদেশে বেশ কিছুদিন থেকে অনেকটা কাজ এগিয়ে নিয়েছে। সে আমেরিকার বাজারে ইতিমধ্যে তাদের মালের চাহিদাও বাড়িয়েছে। আর আমেরিকার মার্কেট থেকে কয়েক লাখ ডলারের মালের অর্ডার পেয়েছে — ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বাজারেও তাদের মালের অর্ডার পেয়েছে প্রচুর। এসব কাজ করার জন্য লন্ডনে আর আমেরিকায় অফিসও নিয়েছে। লন্ডনে, নিউইয়র্কের ম্যানহাটানে

এরমধ্যে এপার্টমেন্ট কিনে অফিস সাজাবার কাজের অর্ডারও দিয়ে এসেছে।

অনিমেষ বেশ কয়েকবৎসরের পরিশ্রমে এবার বিদেশের মাটিতে তাদের পা রাখার জায়গা করে ফিরছে। কলকাতায় দমদম এয়ারপোর্টে নেমে দেখে কলকাতা শহরের এক বিচিত্র রূপ। পথে ঘাটে গাড়ি চলাচল বন্ধ। সারা শহর ভরে গেছে ব্যানার ফেস্টুনে। যেন জাতীয় উৎসব—ফুটবল খেলা নিয়ে উন্মাদনা অনিমেষের চোখে দৃষ্টিকটু লাগে।

অন্যদেশে তাদের কাজকর্ম—প্রডাকসন বাড়াতে ব্যস্ত। সার্বিক উন্নয়ন তাদের লক্ষ্য। তারা অযথা সময়-প্রাণশক্তিকে নষ্ট করলো। এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে এরা অযথা হইচই করে। যে দেশে মালক্ষ্মী অর্থাৎ অর্থের প্রাচুর্য তারা ঘটা করে মালক্ষ্মীর মাটির মূর্তি এনে রাত জেগে হইচই করে পুজো করে না। আমাদের মত লক্ষ্মীছাড়া হতদরিদ্র দেশেই মা লক্ষ্মীর পূজার জন্য লাখ লাখ টাকা জলে দিই।

যেসব দেশে বিজ্ঞানের চরম উন্নতি হয়েছে। যারা রোবট তৈরি করে। চাঁদে মহাকাশ যান পাঠায়। তারা বিশ্বকর্মা—অন্যান্য দেবতার পুজো করে না। আমাদের কাছে রিক্সাও বিশ্বকর্মার সৃষ্টি। মদের আর মাংসের বন্যায় উন্মাদ হয় তারা। তাসা পার্টির বাদ্য বাজনায় কাটে রাত। যে দেশে বিদ্যার চর্চা খুব বেশি তারা মা সরস্বতীর পুজো করে না। আর এদেশে বিদ্যা-লেখাপড়ার সঙ্গে যাদের যোগাযোগই প্রায় নেই তারাও জোর করে তোলা আদায় করে মহা উল্লাসে একদিনের জন্য মা সরস্বতীর পরম ভক্ত হয়ে ওঠে।

অনিমেষ-এর মনে হয় আমাদের সমাজের মানুষকে আসল সমস্যাগুলো থেকে ভুলিয়ে দূরে রাখার জন্যই একশ্রেণী জাতীয় চিন্তাধারা শক্তিকেই এইভাবে অন্যপথে প্রবাহিত করেছে। এদের সামনে কোনও আশ্বাস আশা নেই। তাই যা হোক একটা কিছুর মধ্যেই আশা-আশ্বাস পাবার জন্য এই অতি উৎসাহ—এই উন্মাদনা।

সুজিতের কাট আউট ছবিও দু-একটা ছবি রয়েছে। জনস্রোত চলেছে স্টেডিয়ামের দিকে।

দীর্ঘ বিমানযাত্রা করে আসছে অনিমেষ। সোজা নিউইয়র্কের জোসেফ কেনেডি এয়ারপোর্টে প্লেনে উঠেছিল ওখান থেকে দীর্ঘ প্রায় আটাশ ঘণ্টা পাড়ি দিয়ে মুম্বতে নেমে অন্য প্লেনে উঠেছিল — ওখান থেকে অন্য প্লেনে কলকাতা পৌঁছেছে বেলা এগারোটা নাগাদ। তার গাড়িটাকে অন্য পথে ঘুরিয়ে ওই খেলার মাঠের পথ এড়িয়ে বাড়ি পৌঁছায়।

বাড়িতে তখন বাবা ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে খেলার মাঠে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছেন। আজ তাদের ক্লাবের জীবন মরণ লড়াই, অনিমেষকে দেখে বলে,

—এসেছিস। খবর কি বল?

—ভালোই। অনেক সুখবর আছে। এখন তো তুমি ব্যস্ত।

নরেশবাবু বলে—

—হ্যারে। আজ ফাইনাল। খুব টেনশনে আছি। খেলা জিততেই হবে। দেখতে মাঠে যাচ্ছি। সুজিত যদি দুটো গোল করতে পারে।

অনিমেষ বলে,

—তাই যাও। ওদিকে টিমকে জিতিয়ে আনো। আমিও তোমার কোম্পানিকে চ্যাম্পিয়ন বানিয়ে দোব।

নরেশবাবু বলেন,

—ভেরি গুড। তাহলে যাই—ফিরে এসে তোর বিদেশের ব্যাবসার সুখবরগুলো শুনবো। জয় মা—আজকের খেলায় মুখ রাখিস মা।

মা কালীর ছবিতে প্রণাম করে বের হয়ে গেলেন নরেশবাবু। অনিমেষ-এর মা কল্যাণী বলে,

—তা তুই ওকি মাঠে যাবি নাকিরে অনি—

অনিমেষ-এর ও ব্যাপারে উৎসাহ বিশেষ নেই। সে বলে,

—ধ্যাৎ কাল প্লেনে ঘুমোতে পারিনি। আমি স্নান-খাওয়া করে ঘুমোবো। নিবেদিতার খবর কি?

—ভালোই। তুই স্নান-খাওয়ার পর ঘুমো। তারপর ওসব কথা হবে। অনিমেষ এখানেও অনেক কাজ নিয়ে এসেছে। কাল থেকেই সেই সব কাজ শুরু করতে হবে। এখন তার বিশ্রামের দরকার নাহলে অবসাদটা কাটবে না।

মাঠের গ্যালারিতে তিল ধারণের জায়গা নেই। লাখ দেড়েক লোক গিজগিজ করছে স্টেডিয়ামে। হাতে বেলুন ক্লাবের পতাকা আর গলায় চিৎকার। তাসাপার্টি ও ব্যান্ড এসেছে—কেউ ভেপু বাজাচ্ছে। অনেকের গায়ে বেঙ্গল টিমের জার্সি।

গোয়ার টিমের সমর্থকও কম নয়। এখানের অনেক টিম বেঙ্গল টিমের সমর্থন করে না। তারাও মিশেছে ওদের দলে। তারাও চিৎকার করছে। বেঙ্গল ক্লাবের কর্মকর্তারা নরেশবাবুও সদলবলে হাজির হয়েছেন। এসেছে নিবেদিতাও। সেওআজ ঘরে থাকতে পারেনি। বাবার সঙ্গে মাঠে এসেছে। টিমকে জেতাতেই হবে।

টিভিতে খেলার লাইভ ব্রডকাস্টিং হচ্ছে। সারা মাঠে হইচই চলছে।

ব্রজবাবু অখিলবাবুরা অবশ্য মাঠে আসেননি। তারা তাদের অপিসের বেসমেন্টে একটা বড় সাইজের টিভিতে খেলা দেখছে। ওদিকে তখনও ফোনে বুকিং চলছে বাজির। ব্রজ বলে,

—অখিল আজকের খেলায় আপসেট রেজাল্ট হলে কত থাকবে হে?

খেলা যা ধরন গোয়ার টিম লড়ছে—আর যা মুভমেন্ট করছে—

অখিল বলে,

—গোয়া জিতলে ভালো টাকাই হাতে আসবে ব্রজদা।

হঠাৎ চমকে ওঠে। সুজিতকে ওদিক থেকে কে বলটা সুন্দর ভাবে বাড়াচ্ছে

আর সুজিতও বলটা পয়ে লেফট উইং থেকে মুভমেন্ট শুরু করেছে। অখিল চিৎকার করে,

—শেষে বিপদ ঘটাবে নাতো সুজিত একজনকে কাটিয়েছে, এবার বলটা নিয়ে গোলের দিকে ঢুকছে।

ব্রজবাবু চেয়ার ছেড়ে ওঠে। আবার বসে পড়েন। গোয়ার ব্যাক বলটাকে লম্বা শটে ক্লিয়ার করেছে। ব্রজবাবু বলে,

—সুজিত আজ গোল করবে না। এত টাকা নিল কথার খেলাপ ও করে না।

অখিল এমনিতে গোঁয়ার। সে বলে,

—ও যদি গড়বড় করে ওকে ছাড়বো না ব্রজদা। আমাদের সর্বনাশ করলে ওকেও ফিনিশ করে দোব। আমায় চেনে না।

এদিকে দুরন্ত গতিতে মাঠে খেলা চলছে।

দুপক্ষই সমান তালে লড়ছে। বল যদি একবার যায় বেঙ্গলের গোলের দিকে ঠিক পরমুহূর্তেই বল চলে আসছে গোয়ার দিকে। সুজিত এর মধ্যে দুবার চেষ্টাও করেছিল।

সারা মাঠে চিৎকার ওঠে—সুজিত গোল চাই।

সুজিতও একবার গোলও মেরেছিল দুরূহ একটা কোণ থেকে। তবে বরাত মন্দ। বারে লেগে বল কর্নার হয়ে যায়।

নরেশবাবু গজগজ করেন,

—বলটাকে একটু নামিয়ে মার—কি যে করে।

নিবেদিতা দেখছে সুজিতের খেলা। তার মনে হয় আগেকার সেই সুজিত যেন আর নেই। ওর মনের আকুলতাই সুজিতের খেলার ছন্দটাকে নষ্ট করে দিয়েছে। প্রতিপক্ষের ফাঁকফোকরগুলো খুঁজে বের করে সেই অন্তর্দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেছে সুজিত।

আবার বল পেয়েছে।— তীর বেগে ছুটছে সুজিত। দর্শকরাও চিৎকার করে—কিন্তু আগেকার সেই গতিবেগ যেন নেই। গোয়ার একজন ডিফেন্সে এসে সুজিতকে টপকে বলটা বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে দেয় সুজিতের পা থেকে—হাফ টাইম হয়ে যায়। নরেশবাবুও ড্রেসিংরুমে গিয়ে সুজিতকে উৎসাহিত করে। বিপুল বলে,

—কি হলরে সুজিত। এখনও নিরামিষ রয়ে গেল। গোল করে আঁশ মুখ করো, শিবু—তুই সুজিতের পিছনে থাকবি। ওরা সুজিতকে বোতল বন্দি করে রেখেছে। সুজিত শিবুকে নিয়ে এ্যাটাক করো সুজিত আজ তেমন এ্যাটাক করতে চায় না। সুজিত জানে, কারখানার চাকরিও পেয়েছে। আর খেলার জন্য টিম থেকে টাকাও পাচ্ছে।

ওদিক থেকে ও পেয়েছে দশলাখ টাকা আর বাকি খেলার টাইমটা কোনমতে খেলে কাটাতে পারলেই আজ রাতে পাবে আরও দশলাখ টাকা। সুজিত তাই জানপ্রাণ দিয়ে খেলার চেষ্টা করে না। তবু সময়টা কাটাতেই হবে। শিবুও বেঙ্গল টিমের একজন অন্যতম ফরোয়ার্ড। সে-ও ভালোই খেলে। কিন্তু সুজিতের মতো নাম-ডাক

তার নেই। খেলার জন্যই সুজিত এতবড় লোকের মেয়েকে বিয়ে করে তার ভাগ্য বদলেছে। এসব কথাও শিবু জানে শিবুও তাই মনে মনে হিংসা করে। শিবুও চেষ্টা করছে আজ সে যদি গোল করতে পারে তার নাম-ডাক দামও বেড়ে যাবে।

এবার শিবুও তাই তার সেরা খেলাই খেলতে চায়। হাফ টাইমের পর খেলা শুরু করেছে মাঠে তখন প্রবল হইচই চলছে। বেঙ্গল টিমও মরীয়া হয়ে আক্রমণ চালাচ্ছে। কিন্তু গোয়ার ডিফেন্সও টীমের দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মত বাধা দিচ্ছে তাদের। সুজিতকেও ওরা দু-তিনজন গার্ড দিয়ে রেখেছে। খেলা প্রায় শেষের দিকে। সারাক্ষণ ধরে মাঠে লড়াই করছে। বেঙ্গল টিমের সমর্থকরা অধৈর্য্য হয়ে উঠেছে। ওদিকে গোয়ার সমর্থকরা ফুসছে তারা। তারাও দু-একবার তেড়ে ফুড়ে আসছে। কিন্তু বেঙ্গলের ডিফেন্স টপকাতে পারছে না। পুরো সময়ে কোনও সিদ্ধান্ত হল না। এরপর এক্সট্রা টাইমের খেলা শুরু হয়েছে। যে কোনও টিম গোল দিতে পারলে সেই বিজয়ী হবে। গোয়ার টিম এবার দারুণ খেলছে। একটা বল ডানদিকে উড়ে এল বেঙ্গলের গোলে। চিৎকার করে গোয়ার সমর্থকরা। কিন্তু বেঙ্গলের গোলকিপারও সর্বশক্তি দিয়ে বলটাকে পাঞ্চ করেছে শেষ মুহূর্তে বাঁধের উপর দিয়ে চলে গেল।

ব্রজবাবু অখিলও তাদের অফিসে টিভির সামনে চিৎকার করেছে। কিন্তু না গোল হয়নি। তার পরই বল পেয়েছে সুজিত। ওকে ঘিরে রেখেছে দু-তিনজন। সুজিত বল পেতে এবার যেন বদলে গেছে। তার আগেকার সেই গতিবেগ ক্ষিপ্রতা ফিরে এসেছে। দু-তিনজনকে নিয়েই সে বল নিয়ে ছুটে চলেছে। সামনে গোলকিপার হঠাৎ সুজিত বলটাকে ছেড়ে একাই এগিয়ে যায় গোলের দিকে। আর তাকে যারা গার্ডে রেখেছিল তারাও বল না পেয়ে সুজিতের সঙ্গে ছুটছে। বল পিছনে পড়ে আছে অবাঞ্ছিত অবস্থায়।

সুজিতের পিছনে ছিল বেঙ্গল টিমের শিবু—এবার সেই ওই বলটাকে নির্ভুল লক্ষ্যে গোলে পাঠাতে সারা মাঠ উল্লাসে ফেটে পড়ে। গগনবিদারী চিৎকার ওঠে।

—গোল।

এদিকে খেলা শেষের বাঁশি বেজে গেছে। গোল্ডেন গোলে জিতেছে বেঙ্গল টিম। মাঠে তখন বাঁধ ভাঙা জনতার আনন্দ কোলাহল। মাঠের বাইরেও সমর্থকদের নৃত্য শুরু হয়েছে।

সুজিতের সমর্থকরা বলে,

—গুরুর কেরামতি দেখলে। তিনজন ওকে ঘিরে রেখেছিল ওদের ভড়কি দিয়ে বের হয়ে গেল শিবুকে ইশারা করে। আরে একে বলে গোল মেকার। নিজে না দিয়ে শিবুকে দিয়ে দেওয়ালো। আরে একেই বলে গ্রেট প্লেয়ার।

বিজিতও খুশি হয়েছে। শেষ মুহূর্তে দেখিয়ে দিল সুজিত ওকি করতে পারে। ওদিকে টিভির সামনে ব্রজবাবু তখন চিৎকার করছে—

—শালা শুয়োরের বাচ্চা—গদ্দার। আমার টাকা খেয়ে আমার সর্বনাশ করবে। নিজে গোল না দিয়ে ওই প্লেয়ারটাকে দিয়ে গোল করালো বেঙ্গল টিমকে জেতানো।

এখন পার্টিকে এত টাকা পেমেন্ট দিতে হবে। অখিল গর্জে ওঠে—

—তখনই বলেছিলাম। ওটাকে বিশ্বাস করো না। তোমারই খাবে আর তোমারই সর্বনাশ করবে। এখন এতটাকা চলে যাবে প্রায় কোটি টাকা ফেরত দিতে হবে। কোম্পানি লাটে উঠবে।

ব্রজও এসব শুনে রাগে গর্জাচ্ছে।

—ওই শালার জন্যই শেষ হয়ে যেতে হবে।

অখিল বলে,

—তাই হবে ব্রজদা। আজই ওর ব্যবস্থা করছি।

অখিলও রাগে ফুঁসছে তার সব হিসাব ওই অখিল ওলট-পালট করে দিয়েছে সুজিত।

তাবুঁতে তখন আমোদ প্রমোদ চলছে। টিম জিতেছে নরেশবাবুও খুশি। কাগজের লোকজন ছবিও নিয়েছে। ইন্টারভিউ নিচ্ছে সুজিতের। আজ সুজিত নতুন কৌশলে খেলছে। শিবুকে দিয়েই গোল করেছে সেই। শিবুই সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে।

সুজিত অবশ্য এটা চায়নি। সে বল ছেড়ে দিয়েই দৌড়েছিল। নিজেই কিক নিতে পারতো গোলে। কিন্তু তা ও করেনি। সুজিতও ভাবতে পারেনি যে শিবু তার পিছনেই থাকবে আর সেই সঠিক ভাবে গোল করবে। ক্লাব তাঁবুতে স্নান সেরে পোশাক বদলে একাই বের হয়েছে সুজিত। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তখনও স্টেডিয়ামের আলোগুলো নিভে গেছে। বাইরে এদিক-ওদিক গাছগাছালি। দূরে বড় রাস্তা দিয়ে গাড়িগুলো চলেছে। স্টেডিয়ামের বাইরে তখনও উল্লাসমুখর জনতা রয়েছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। অনেকেই তখনও আনন্দ উৎসব করছে এদিকে-ওদিকে। তবে আসতে আসতে ভিড় পাতলা হয়ে গেছে।

সুজিতের মন মেজাজ ভালো নেই। সে একাই গাড়িটা নিয়ে বের হয়ে বড় রাস্তার দিকে চলেছে। খানিক দূর আসতেই গাছগাছালির ফাঁক থেকে কয়েকজন এসে ওর গাড়ির সামনে ঘিরে দাঁড়ায়। সুজিত প্রথমে কিছু বুঝতে না পেরে ওদের অনুরাগী ভক্ত ভেবেই ভুল করে। আর তক্ষুণি ওদের একজন এসে সুজিতের কপালে রিভলবারের নলটা ঠেকায়।

চমকে ওঠে সুজিত তাকে ঘিরে ফেলেছে তিন-চারজন। সকলের হাতেই রিভলবার। একজন চাপা স্বরে বলে—

—টু শব্দটা করলে ছটা দানাই মগজে সেধিঁয়ে দোব একেবারে লাশ হয়ে যাবে। চুপচাপ ওই গাড়িতে ওঠো যদি বাঁচতে চাও।

ছেলেটার কথা শেষ করে আরও শক্ত করে রিভলবারের নলটা সুজিতের মাথায় ঠেকিয়ে বলে,

—তাড়াতাড়ি করো। জলদি—

ওরা সুজিতকে ধরে নামিয়েছে আর টেনে নিয়ে যায় ওদিকে রাখা গাড়িটার

দিকে। পথের একফালি আলোয় দেখা যায় রিভলবার হাতে কয়েকজনকে। ওরা সুজিতকে ওদিকে টেনে নিয়ে যায়।

এদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বেশ কিছু সমর্থকও ছিল তখন এরাও দেখে ওই দৃশ্য। প্রথমে ঠিক বুঝতে পারেনি। কিন্তু ওদের হাতে উদ্যত রিভলবার দেখে ওদের মনেও সন্দেহ জাগে। সুজিত বুঝেছে ওই ছেলেগুলোর মতলব সুবিধার নয়। তাকে জোর করেই তুলে নিয়ে চলেছে কোথায় কেন তাও জানে না। তবে এরা যে তাকে কিডন্যাপই করতে চায় তাই বুঝে একবার চিৎকার করে ওঠে—

—হেল্প, হেল্প।

ওর ওই চিৎকারে বেশ কিছু লোকজনও সচকিত হয়ে ওঠে। এবার ওই অপহরণ কারীর দলও বিপদের গুরুত্ব বুঝে সুজিতের মুখ চেপে ধরে তাকে টেনে গাড়িতে তুলেছে। গাড়িটাতে স্টার্ট দেওয়াই ছিল এরা সুজিতকে নিয়ে উঠতেই গাড়িটা সশব্দে অন্ধকারের মধ্যে হেডলাইট জ্বেলে বের হয়ে যায়। অন্ধকারে হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে গেল আর বোঝা যায় না।

পিছনে সুজিতের গাড়িটা পড়ে আছে। মাঠের বাইরে তখন কোলাহল হইচই শুরু হয়েছে। অনেক ভক্তও দেখেছে সুজিতকে কারা যেন তুলে নিয়ে যাচ্ছে। এরাও চিৎকার করে। মাঠের ওদিকে বিজিত তখনও তার হকার বন্ধুদের সঙ্গে বসেছিল আজ সুজিতের টিম চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। মানে কেষ্টরাও মাঠে হইচই করছে। বিজিতও খুশি। সে বলে,

—এইবার চল। ভিড়ও কমেছে। বাস পাওয়া যেতে পারে।

ওরা বের হয়ে আসছে আর পথের ওখানে হঠাৎ এদের চিৎকার হইচই শুনে চাইল, কে বলে,

—সর্বনাশ হয়েছে দাদা কারা অন্ধকারে গাড়ি নিয়ে এসে সুজিতকে রিভলবার ঠেকিয়ে জোর করে তুলে নিয়ে গেল।

বিজিত চমকে ওঠে, —সেকি

অন্যজন বলে,

—টিমকে জিতিয়েছে তাই অন্যদলের সন্তানরাই এই কাজ করেছে। গুরুকে বিপদে না ফেলে।

বিজিত আর্তকণ্ঠে বলে,

—কারা নিয়ে গেল। কোনদিকে গেল?

—বেশি দূর যেতে পারেনি। বাইপাশে সিগন্যালে আটকেছে কালো একটা টাটা সুমো গাড়ি। এরমধ্যে মটর বাইকে ছিল একজন ভক্ত। একটা কম বয়সী ছেলে সে বলে,

—এই দিকে গেছে, দেখি ব্যাটাদের।

বিজিতও ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসে। সে বলে,

—আমাকেও নিয়ে চল ভাই, আমিও তোমার সঙ্গে যাবো।

ছেলেটা বলে,

—শিগগীর চলুন।

মটরবাইকটা ওকে নিয়ে বের হয়ে যায় বাইপাশের দিকে। দূরে দূরে সিগন্যালে বেশকিছু গাড়ি তখনও দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেটা বলে — ওই আগের মোড়ে রয়েছে একটা কালো রং-এর টাটাসুমো ওই গাড়িটাই ওদিকে সিগন্যালও খুলে গেছে। দেখা যায় গাড়িগুলো সচল হয়ে ওঠে।

বিজিত বলে,

—জোরে চলো—দূরে দেখা যাচ্ছে গাড়িটা। ওটাকেই ফলো করো,

তীর বেগে মটর বাইকটাও ছুটে চলেছে ওই গাড়িটাকে ধরার জন্য। নরেশবাবু-নিবেদিতা-বিপুলবাবুও বের হয়ে আসছেন। এতক্ষণ ওই ক্লাব হাউসে ভিড় হইচই এর মধ্যে থেকে যেন হাপিয়ে উঠেছিল এবার বাইরে মুক্ত হাওয়ায় এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে নিবেদিতা। ওই খেলার পর নিবেদিতারও সুজিতের সঙ্গে কয়েক মিনিটের জন্য দেখা হয়েছিল মাত্র। কিন্তু ভিড়ের মধ্যে কোনও কথাই হয়নি।

নরেশ বাবুদের সঙ্গে নিবেদিতা কর্মকর্তাদের ওখানেই আটকে পড়েছিল। আজ তবু খুশি হয়েছে নিবেদিতা। সুজিতকে ওরা কড়া পাহারায় আটকে রেখেছিল খেলার মাঠে। তবুও সুজিত কৌশলে বল নিয়ে এগিয়ে গোল করতে সুবিধা করে দিয়েছে। তবু নিবেদিতার মনে হয় তার আগেও সুজিতের গোল করা উচিত ছিল। সুজিত যেন অন্য দিনের মতো খেলেনি।

তবু টিম জিতেছে। মানসম্মানও রয়ে গেছে টিমের। এবার হয়তো বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ পাবে। নিবেদিতা বের হয়ে আসছে। নরেশবাবুদের মধ্যে পরবর্তী খেলার কথাবার্তা হচ্ছে। হঠাৎ বাইরে লোকজনের হইচই কলরব শুনে থামলেন নরেশবাবুরা। বাইরে বেশ কিছু লোক তখন দুজন পুলিশকে ধরে গর্জাচ্ছে।

—কি করেন আপনারা। আপনাদের চোখের সামনে দিয়ে ক্লাবের এক নম্বর প্লেয়ারকে রিভলবার দেখিয়ে কারা তুলে নিয়ে গেল। আর আপনারা বাধা দিলেন না। দর্শকরাও উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে—

—ওরা ঘুমোতে আসে এখানে। যতসব অকম্মার দল।

নরেশবাবুও ব্যাপারটা শুনে চমকে ওঠেন। বিপুলবাবুও জানেন খেলার মাঠে ও অনেক অন্ধকারের রাজনীতি চলে। বিপুল বলে,

—কি হয়েছে ভাই। সমর্থকরা বলে সেই দৃশ্যের কথা। ওরা বলে,

—তিন-চারজন রিভলবার দেখিয়ে সুজিতদাকে তুলে নিয়ে গেল একটা গাড়িতে।

নিবেদিতা চমকে ওঠে।

—সেকি কারা তাকে তুলে নিয়ে গেল?

অনেক সমর্থকই নানা কথা বলার চেষ্টা করছে। ফলে তেমন কোনও সঠিক উত্তর পাওয়া গেল না। তবে একটা কথা পরিষ্কার যে দু-তিনজন লোক সুজিতকে রিভলবার ঠেকিয়ে জোর করে একটা টাটা সুমো গাড়িতে করে তুলে নিয়ে গেছে।

আর তাদের উদ্দেশ্য যে ভালো নয় সেটাও পরিষ্কার হয়ে যায়। সুজিতের গাড়িটা পড়ে আছে পথের ধারে। বিপুল বলে,

—হঠাৎ এসব ব্যাপার ঘটলো বুঝতে পারছি না। সুজিতের কোনও বিপদ হয়নি তো!

নরেশবাবু বলেন,

—অসম্ভব কিছু নয়। পুলিশকেই জানাতে হবে। দরকার হলে পুলিশ কমিশনারের কাছে চলো।

ওরাও ক্লাবের কয়েকজনকে ডেকে সুজিতের গাড়িটা পাহারা দেবার ব্যবস্থা করে পুলিশ কমিশনারের উদ্দেশ্যে ছুটলো।

ভবেশবাবুও দেখছেন সারা অঞ্চলের মানুষ এখন সুজিতের ভক্ত। কদিন থেকে কাগজে টিভিতে সুজিতের নাম—তার ইন্টারভিউ খেলার সম্বন্ধে এসবই প্রচারিত হচ্ছে। পাড়ার লোকজনও ভবেশবাবুকে এখন বেশ কিছুটা সমীহ করে। ছেলেরাও নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সুজিতের কথা, ভবেশবাবুর এটা ভালো লাগে না। তাঁর এই পরিচয়টা অপছন্দ। আজীবন তিনি শিক্ষকতা করেছেন। সমাজের বহু ছাত্রকে তিনি মানুষ করেছেন তারাও সমাজে প্রতিষ্ঠিত।

সেই পরিচয়টা এরা কেউ জানে না। সেই স্বীকৃতিও কেউ দেয় না। এরা সুজিতের পরিচয়ে তাঁকে স্বীকৃতি দেয়। বিজিত-এর মতো সৎ প্রতিবাদী একটা ছেলেকেও এই সমাজ কোন স্বীকৃতি দেয়নি। তাকে আজ পথে হকারি করে দিন কাটাতে হয়। এরা চেনে চাকচিক্য আর চমক। সুজিত সেই চাকচিক্যে নাম করেছে। সাবিত্রী বলে,

—সুজিতের কত নাম ডাক!

ভবেশবাবু বলেন,

—তাতে তোমার কিছু লাভ হয়েছে?

বিজিতকে তো বাড়িতে ঠাঁই দেয়নি। কি দিয়েছে সে সংসারের জন্য? যা করেছে শুধু নিজের জন্য।

—তবু তো সন্তান। কুপুত্র সন্তান যদিও হয় কুমাতা কখনও নয়। মা হয়ে ছেলেকে তো আশীর্বাদ করবেই।

—বিজিতকে কি কোনদিন আশীর্বাদ করেছো? করোনি—

—মায়ের কাছে সব ছেলেই সমান।

তবু সাবিত্রী আজ টিভির সামনে বসে সুজিতের খেলা দেখছে। সারা পাড়ার ঘরে ঘরে টিভিতে সেই খেলা দেখছে অনেকে। ভবেশবাবুও মাঝে মাঝে খেলা দেখেন। টিম জিতেছে হইচই চলছে। সাবিত্রীও খুশি।

হঠাৎ-ই পরের সংবাদেই খবরটা ঘোষিত হয়—আজ সন্ধ্যায় মাঠ থেকে বাইরে আসার পরই বিখ্যাত ফুটবলার সুজিতবাবুকে কারা রিভলবার দেখিয়ে জোর করে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। এই নিয়ে সারা শহরে চাঞ্চল্য পড়ে গেছে। পুলিশ

ও অপহরণকারীদের জন্য শহর জুড়ে তল্লাসী চালিয়েছে। কিন্তু এখনও কাউকে ধরতে পারেনি পুলিশ। সাবিত্রী আর্তনাদ করে ওঠে।

—এসব কি শুনছি গো? সুজিতকে কারা খেলার মাঠ থেকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। এখন কি হবে? একি সর্বনাশ হলো গো?

ভবেশবাবু ব্যাপারটা শুনে ঘাবড়ে যান। আজকাল শহরে বেশ কিছু নামীদামী লোককে কারা অপহরণ করে নিয়ে চলেছে। সুজিতকে কারা অপহরণ করে নিয়ে গেছে কে জানে? অসহায় ভবেশবাবু বলেন,

—তাই তো! এখন কি হবে সাবিত্রী? বিজিতকে খবরটা দিতে হবে।

সেযদি কোন খোঁজখবর করতে পারে। এখন ওই একমাত্র ভরসা। ওই যদি কোন ব্যবস্থা করতে পারে।

সাবিত্রী বলে,

—এত রাতে তুমি ঠনঠনিয়া থেকে সেই হাতিবাগানে যাবে?

—বৌমাও নেই। ওদের বাড়িতে ওখবর দিতে হবে। আমাকে যেতেই হবে। দেখি বিজিতকে বলে ও যদি কোন খোঁজ খবর করতে পারে।

ভবেশবাবু ঐ রাত্রেই বের হয়ে যান। বাবা-মায়ের মন। ওদের অন্তরের ব্যাথা আজকের সন্তানেরা বুঝবে না।

ওই অপহরণকারীর দল কলকাতার একপ্রান্তে খিদিরপুরে গঙ্গার ধারে ব্রজবাবুদের মাল গুদামে এসে পড়েছে। এখানেই ব্রজবাবুদের ওইসব বিদেশী বেআইনী মালের কারবার চলে। দেশী-বিদেশী জাহাজ থেকে নানা পথে কাস্টমস সরকারি বিভাগের নজর এড়িয়ে লাখ লাখ টাকার নানা ধরনের মালপত্র আসে। এমনকি সন্ত্রাসবাদীদের জন্য বিদেশী অস্ত্রশস্ত্র বিস্ফোরক আসে নানা ভাবে। দূর সমুদ্রে না হয় গঙ্গার কোনও নির্জনে নোঙর করে। সেখানে নৌকাও তৈরি থাকে। তাতে সংকেত পেলে ওরাও মাল নামিয়ে দেয় জাহাজ ডকে পৌঁছবার আগেই। ফলে পুলিশও জানতে পারে না। সেই সব মাল চড়াদামে ব্রজবাবুরা বিক্রি করে তাদের পার্টিদের। সেসব কাজ হয় গঙ্গার ধারে বিশাল গুদামের একাংশে।

সন্ধ্যার পর এইসব এলাকা জনহীন হয়ে যায়। আলোর প্রাচুর্যও থাকে না। ব্রজবাবু অখিল তার লোকদের নির্দেশ দিয়েছিল সুজিতকে খেলার পর যেভাবে হোক তুলে আনার পর এখানে আনতে হবে। অখিলের চ্যালারা এসব কাজে নিপুণ। তারাই রাতের অন্ধকারে জাহাজের মাল নামায়। তারাই ট্রাক ভর্তি মাল পাচার করে দূর-দূরান্তরে। দরকার হলে গুলিগোলা চালাতেও দ্বিধা করে না তারা। সেই চ্যালার দলই নিয়ে এসেছে সুজিতকে খেলার মাঠ থেকে। ওরা অবশ্য নজর রেখেছিল কোনও গার্ড তাদের পিছনে ধাওয়া করেছে কিনা।

কর্মব্যস্ত পথে গাড়ি মোটরবাইক অনেক দেখেছে। কিন্তু তাদের যে কেউ পিছনে ধাওয়া করেছে সেটাও ঠিক টের পায় না।

ব্রজবাবু-অখিলদের প্রায় আশি লাখ টাকার মত পেমেন্ট করতে হবে। খেলার ফল উল্টো হলে পুরোটাকাটা বেঁচে যেতো। এতগুলো টাকা সুজিতের জন্য। তার ওপর ব্রজবাবুরা ভরসা করেছিল। ওরা অপেক্ষা করছে। আজ সুজিতের মত বেইমান গদ্দারকে তারা শেষই করে ওর লাশটা মাঝ নদীতে পাথর বেঁধে ফেলে দেবে কেউ আর কোনও হদিশ পাবেনা। বিখ্যাত খেলোয়াড় সুজিত রায় শুধু ইতিহাস হয়ে থাকবে। ব্রজ অপেক্ষা করছে। ব্রজ অখিলকে বলে,

—কই হে অখিল। তোমার লোকজন তো এখনও ফিরলো না। কি হল তাদের? উলটে তাদেরই কেউ অপহরণ করল নাকি?

অখিল বলে,

—ওরা ঠিকই আনবে মালকে,

গাড়ির শব্দ শোনা গেল বাইরে, দেখা যায় হেড লাইট, অখিল বলে

—ওই যে এসে গেছে।

ব্রজ-অখিল অসহায় রাগে ফুঁসছিল! এবার সুজিতকে নিয়ে ওদের ঢুকতে ব্রজবাবু বলে,

—আরে আসুন সুজিতবাবু। আজ্ঞে আপনার জন্যই পথ চেয়ে বসেছিলাম।

সুজিত এবার বুঝেছে যে ব্রজ-অখিলবাবুরাই তাকে এই ভাবে জোর করে তুলে এনেছে। আর কেন এনেছে সেটাও বুঝেছে সুজিত। অখিল গর্জে ওঠে।

—ব্যাটা বেইমান, গাদার। আমাদের এতগুলো টাকা খেয়ে গদ্দারি করলি

—আমি বেইমান নই, দেখলে তো সারা খেলায় এত সুযোগ পেয়েও আমি গোল করিনি। একটা গোলও দিইনি।

ব্রজবাবু সুজিতের গালে সপাটে একটা চড় মেড়ে গর্জে ওঠে আমি খেলা নিয়ে কোটি টাকার খেলা খেলি। ও ব্যাটা আমাকে খেলার নক্সা দেখাচ্ছে। আবে শেষের বলটা তো তুই গোলের মুখে এনে নিজে গোল না করে শিবুকে দিয়ে গোল করালি। নাহলে গোল হতো? তুই এই ভাবে না খেললে জিততো শালা বেঙ্গল টিম? বেইমানি করেও বলছিস বেইমানি করিনি? ন্যাকা পেয়েছিস আমাদের।

আবার একটা চড় মারে সুজিতকে।

অসহায় সুজিত। দেখে ওই গুদামের এদিকে-ওদিকে চার-পাঁচজন পাহারাতে রয়েছে। তার পালাবার কোনও পথ নেই।

অখিল বলে,

—এবার তোর হাত-পা ভেঙে টুকরো করে তোকে খতম করে নাম নিশানা মিটিয়ে দোব। জীবনের খেলা শেষ করে দোব।

আর্তনাদ করে ওঠে সুজিত,

—বিশ্বাস করো এ আমিও চাইনি। তোমাদের টাকা আমি ফেরত দেব, ব্রজবাবু বলে,

—তোর জন্য আমাদের কোটি টাকা লোকসান হয়ে গেল। সে টাকা কে ফেরত দেবে রে? ব্যাটা গদ্দার—

ওদিকে দাঁড়িয়ে থাকা একটা গালকাটা ভীষণ দর্শন লোকের হাতে একটা হাতুড়ি। ওর চোখে মুখে নির্বিকার পাশবিক ভাব।

ব্রজ বলে,

—এই গালকাটা, হাতুড়ির ঘায়ে ব্যাটা খেলোয়াড়ের ঠ্যাং দুটো ভেঙে চুরমার করেদে। তারপর পিটিয়ে ওকে শেষ করে ওই প্লাস্টিকের ব্যাগে পাথরের চাইসমেত বেধে গঙ্গায় ফেলে দে। ভাঙ শালার হাত-পা।

লোকটাও হাতুড়ি তুলেছে। মেঝেতে ফেলে রেখেছে সুজিতকে এবার তাকে শেষ করে দেবে ওরা। সুজিতের সামনে আজ নিশ্চিত মৃত্যুর কালো ছায়া নেমে এসেছে। আর্তনাদ করে সে।

—বাঁচাও ! বাঁচাও—

ব্রজ—, অখিল হাসছে। লোকটা হাতুড়ি চালাতে উদ্যত, হঠাৎ কে এসে ওই লোকটার পিছনে সপাটে লাথি মারতে লোকটা ছিটকে পড়ে যায়, একটানে ওর হাতুড়িটা টেনে ছিনিয়ে নেয় বিজিত।

তারপরই প্রচণ্ড ঘায়ে অখিল ছিটকে পড়ে, আর নিমেষের মধ্যে বিজিতের সঙ্গী সেই ছেলেটা ওদিকে একজন পাহারাদারের হাত থেকে রাইফেলটা ছিনিয়ে নিয়ে ব্রজবাবুর বুকে বসিয়েছে। তার লোকেদের বলে,

—কেউ গুলি করার চেষ্টা করলে তোমাকেই গুলিতে ঝাঝরা করে দোব। হাতুড়ির একটা আঘাতে অখিলের মেরুদণ্ডটাই বোধহয় ভেঙে গেছে। পড়ে পড়ে কাতরাচ্ছে সে। সুজিতও অবাক হয়।

—দাদা তুই!

বিজিত তাড়াতাড়ি সুজিতের হাতের বাঁধান খুলে দেয়। বিজিত এবার চিনতে পেরেছে ব্রজবাবু আর অখিলকে। সে বলে,

—তোমরা যুগলে তাহলে চিটফান্ডের পর আবার এই গুদামে নতুন কারবার ফেঁদেছো।

বিজিতকে বাধা দিতে এসে দু-তিনজন ওই হাতুড়ির মোক্ষম আঘাতে ছিট্‌কে পড়ে যায়। ব্রজবাবু ভাবেনি যে সুজিতের দাদা ওই বিজিত। বিজিত সেদিন ব্রজবাবুর মিথ্যা অভিযোগে হাজতবাস করেছিল। আজ এবার তার আসল অপকর্মগুলোর প্রমাণও পেয়ে গেছে। নরেশবাবুও বসে নেই। থানা থেকে কমিশনার অবধি খবর গেছে। টিভিতেও অপহরণের খবর ছড়িয়ে পড়েছে। বিজিতের সাথে যে ছেলেটা মটরবাইক নিয়ে তাদের পিছু ধাওয়া করেছিল সে-ও এবার মোবাইল ফোনে পুলিশকে সব জানাতে, নরেশবাবুও পুলিশ ফোর্স নিয়ে ওই গুদামে গিয়ে হাজির হন।

ব্রজের দল প্রথমে ওদের বাধা দেবার চেষ্টাও করেছিল। তারা গুলি চালাতে পুলিসও গুলি চালায়। আর ব্রজের লোকটাও দেখে পুলিশও তৈরি হয়ে এসেছিলেন।

তারাও প্রাণ বাঁচবার জন্যই গুলি থামিয়ে বাধা দেয়।

নরেশবাবু নিবেদিতাও এসে পড়ে, পুলিশ কমিশনারও এতদিন ব্রজবাবু অখিলদের এই ব্যাপক সাট্টা-জুয়া আর বেআইনী বিদেশীমাল আর বিদেশী অস্ত্রের বিরাট চোরা কারবার চক্রের সন্ধান করছিল। আজ তারা বামাল সমেত ধরতে পেরে অবাক হন। বিজিত বলে,

—সেদিন ওই ব্রজবাবু আমায় চোর সাজিয়ে হাজতে পুরেছিলেন, আজ দেখুন স্যার ওরা চোর নয়, অপহরণকারী, ডাকাত। আর্মস স্মাগলার।

নিবেদিতা ভেবেছিল সুজিতকে বোধহয় অপহরণকারীরা শেষ করে দিয়েছে। হয়তো দিতও, আর যে সুজিত বিজিতকে এতবড় অপবাদ, মিথ্যা কলঙ্ক দিয়ে বাড়ি থেকে পথে বের করে দিয়েছিল, সেই বিজিতই আজ সুজিতকে বাঁচিয়েছে ওই খুনে শয়তানদের হাত থেকে। সুজিতও ভাবতে পারেনি যে সে আবার প্রাণ ফিরে পাবে। ব্রজবাবুরা তাকে শেষ করে তার লাশ গায়েবই করে দিত, তাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে ওই বিজিত। সুজিতও তার ভুল বুঝতে পেরে বলে,

—তোর কাছে ক্ষমা চাওয়ার মুখ নেই দাদা। তোকে আমি চিনতে পারিনি—

বিজিত বলে,

—এতো আমার কর্তব্য রে। চোখের সামনে এতবড় অন্যায় দেখে আমি ঠিক থাকতে পারিনি। চিরকাল প্রতিবাদ করেছি, প্রতিকার করার চেষ্টা করেছি—আজও তাই করেছি। যা বাড়ি যা—

পুলিশ এবার ব্রজ-অখিলদের দায়িত্ব নেয়। ব্রজরা বুঝতে পেরেছে যে পুলিশ এবার কেঁচো খুড়তে গিয়ে কেউটে পর্যন্ত বের করে আনবে। এতদিন ধরে তাদের যে সব অপকীর্তি করে এসেছে, বিজিতের জন্য আজ তাদের সব কীর্তিকলাপ প্রকাশ হয়ে পড়বে। হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে এতদিন ঠকিয়ে এসেছে, তাদের সর্বস্ব লুঠ করেছে। সেই খেলা আজ সমাপ্ত।

সুজিত বলে,

—বাড়ি চল দাদা।

নিবেদিতাও বিজিতের কাছে কৃতজ্ঞ। বিজিতকে যত দেখছে ততই যেন নতুন করে চিনছে সে, নিবেদিতা বলে,

—চলো।

বিজিত হাসে, বলে,

—ঘরের ঠিকানা তো আমার নেইরে। পথই আমার ঘর। তোদের সুখী দেখলেই আমার সুখ। চলি—আবার দেখা হবে।

নরেশবাবুও আজ যেন নতুন এক বিজিতকে আবিষ্কার করেছেন। আর এও বুঝেছেন তাকে কখনো ঘরের সীমানায় বেঁধে রাখা যাবে না।

অনিমেষও রাতে খবরটা শুনেছিল, সে-ও অর্কের সঙ্গে যোগাযোগ করে, অর্কও

সব শুনে অবাক হয়। ওই রাতেই অর্ক শিখাও চলে আসে ভবেশবাবুর বাড়িতে। তখন রাত হয়ে গেছে।

ভবেশবাবু ওই রাতে একটা রিক্সাওয়ালাকে বলে-কয়ে রাজি করিয়ে হাতিবাগানের সেই ভাঙাবাড়িতে গিয়ে হাজির হন। ভবেশবাবু ওদের মেসে গিয়েও বিজিতের দেখা পাননি। মেসে তখনও সেদিনের খেলা আর সুজিতের অপহরণের কথাবার্তা হচ্ছে। হঠাৎ ভবেশবাবুকে আসতে দেখে ওরা তাকাল, ভবেশবাবুকে এর আগে কখনও দেখেনি, এবার ওরা জানতে পারে ভবেশবাবুর পরিচয়। ভবেশবাবুই বলেন।

—আমি বিজিতের বাবা, ওতো এখানে থাকে—ওকে একটু ডেকে দাও বাবা, খুব জরুরি দরকার আছে।

ওরা বিজিতের সঙ্গে খেলা দেখতে গেছে তারপর খেলা শেষ হতেই চলে আসে। বিজিত বোধহয় তাদের পরে ফিরেছে ভেবে বিজিতের খোঁজ করতে দোতলা থেকে মদন নেমে এসে ভবেশবাবুকে শুধোয়।

—বিজিত তো এখনও ফেরেনি। কি দরকার, বলুনতো।

ভবেশবাবু অসহায় কণ্ঠে বলেন,

—ওই যে ফুটবল প্লেয়ার সুজিত আমার ছোট ছেলে, বিজিতের ভাই. শুনলাম ওকে নাকি কারা ধরে নিয়ে গেছে। আমি বুড়ো মানুষ কি করবো ভেবে না পেয়ে বিজিতের খোঁজে এতটা পথ এসেছি এতরাতে। এবার মেসের অন্য হকাররাও অবাক হয়।

—বিজিতদার ছোট ভাই ওই সুজিত।

মদন দেখেছিল বিজিতকে ওই খবর শোনার পর ব্যস্ত হয়ে উঠতে। আর সেই মটর-বাইকওয়ালা তরুণকে নিয়েই ওই অপহরণকারীর গাড়ির পিছনে ছুটেছিল। এখন তার কারণটা পরিষ্কার হয় তার কাছে।

মদন বলে,

—বিজিত জানে খবরটা, ও তক্ষুনি-মটরবাইক নিয়ে সেই গাড়ির পিছনে ছুটেছিল। এখন তার কারণটাও পরিষ্কার হয়ে উঠেছে।

ভবেশবাবু বলেন,

—তুমি ওকে ওদের পিছনে যেতে দেখেছ বাবা?

—হ্যাঁ, আপনি বাড়ি যান।

কেষ্ট বলে,

—এত রাতে একা যাবেন না। চলুন আমি সাইকেল নিয়ে আপনার সাথে যাচ্ছি। বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসছি। ভাববেন না— বিজিত যখন ওদের পিছনে ধাওয়া করেছে একটা কিছু করেই তবে ফিরবে। সুজিতের কোনও ক্ষতিই হবে না।

—তাই যেন হয় বাবা। ভবেশবাবু বিড়বিড় করে রিক্সায় ওঠেন।

বাড়িতে এরমধ্যে অর্ক-শিখাও এসে গেছে। ভবেশবাবু—বাড়ি ফিরে তাদের দেখে একটু ভরসা পান। অর্ক বলে,

—পুলিশও খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গেছে, সুজিতের খবরও পেয়েছে তারা, বিজিতও সেখানে আছে।

ভবেশবাবু বলেন,

—জানতাম বিজিত ঠিক সংসারের বিপদে ঠিক সময়ে হাজির হবে। গাড়িটা আসতে ভবেশবাবু তাকালেন। নরেশবাবু সঙ্গে বিধ্বস্ত সুজিত-নিবেদিতা ঢুকল। সাবিত্রী হারানো সুজিতকে ফিরে পেয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

নরেশবাবু বলেন,

—ভবেশবাবু বিজিতই আজ সুজিতকে নিজের জীবন বিপন্ন করে ওই শয়তানের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। আর শয়তানগুলোকে হাতে-নাতে প্রমাণসহ পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে আরও বহু মানুষকে সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচিয়েছে।

সুজিত বলে,

—দাদা ওসময় গিয়ে না পৌছলে ওঁরা আমাকে শেষ করে দিত।

ভবেশবাবু বলেন,—বিজিত কোথায়? সে এলনা?

—দাদা হয়তো আমাকে ক্ষমা করতে পারেনি, কত করে বললাম সে এলনা, নিবেদিতা বলল।

—সে বড় জেদী বড় অভিমানী রে। সকলের জন্য সব দিতে পারে, সে কারো থেকে সাহায্যের এককণাও নেবেনা। বউমা সুজিত তোরা ঘরে যা।

ওকে ওর মতই থাকতে দে, দিনভোর যা ধকল গেছে এবার গিয়ে একটু বিশ্রাম নে। অনেক রাত হয়েছে।

ভবেশবাবুও এবার বিশ্রাম চান। বাড়িতে খুশি আবার ফিরে এসেছে। এ সময় ভবেশবাবুর বিজিতের কথা মনে পড়ে, তারজন্যই আজ এত খুশি তবু এ সংসারে তার কোন ঠাঁই নেই।

অনিমেষ খবরটা শুনে অর্কের কাছে গেছে। অনিমেষ অর্কদের নিয়ে ভবেশবাবুর বাড়িতে গেছে। সে-ও এরমধ্যে ফোনে দু'চার জায়গায় খোঁজ-খবর করেছে। অনিমেষ বলে।

—বিজিত তাহলে এলনা এখানে। তাকে আমার দরকার। কোথায় থাকে সে?

—আমি ঠিকানাটা দিচ্ছি, তবে সে এখানে আসবে কিনা জানিনা।

অনিমেষ বলে,

—আমায় ঠিকানাটা দেন। তাকে খুবই দরকার।

পরদিন সকালে সব কাগজে বেঙ্গল টিমের ব্যক্তিত্বের খবর ছাপিয়ে আর একটা খবরও প্রকাশিত হয় বড় বড় করে। কয়েকটা টি-ভি চ্যানেলে সেই গুদাম, অপহরণকারীদের ছবি—নানা তথ্য নিয়ে দারুণ একটা খবর করে সারা দেশে সাড়া ফেলেছে, তার সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে অতি সাধারণ এক শিক্ষিত হকারের জীবন

কাহিনি। সাংবাদিকের দল, ক্যামেরাম্যান এসে হাজির হয়েছে সকালে হাতিবাগানের এই ভাঙাবাড়ির সামনে। পাড়ার লোকও জানতো না যে সুজিতের দাদা এই ভাঙা বাড়িতে থাকে। আর হাতিবাগান বাজারের ফুটপাতে হকারি করে।

আর সেই বিজিত আজ সমাজ ও দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী সন্ত্রাসবাদীদের সব ষড়যন্ত্র অত্যাচার প্রতারণা ফাঁস করে দিয়েছে এইভাবে। সুজিতের মত একজন নামী প্লেয়ারকে সে নিজের জীবন বিপন্ন করে বাঁচিয়েছে। মদন বলে,

—বিজিত তোমার পিছনে এত ইতিহাস তাতো জানতাম না। তবে দেখে মনে হয়েছিল তুমি হেজিপেজি নও আর ইন্ডিয়ার এক নম্বর প্লেয়ারের ভাই হয়ে হকারি কর।

—আমার কি তাই বলে নিজের চেষ্টায় বাঁচার অধিকার নেই। আর তোদের জানিয়ে দিই যেখানে শিক্ষিত বেকারদের জন্য কেউ ভাবেনা সেই অমানুষদের রাজ্যে মাথা উঁচু করে হকারি করতে আমার বাধবে না।

মদন বলে,

—তা বলছি তোমার তো বাজারে দোকানঘর এ্যালট হয়ে গেছে। এবার দোকান কর।

বিজিত ওই সব সাংবাদিকদের ভিড় এড়িয়ে পথে বের হতে চায়। সে-ও ভেবেছে ব্যাঙ্কের টাকাটা পেলে দোকানঘর করবে। হঠাৎ বিদেশী বড় গাড়িখানা এসে থেমেছে ভাঙা বাড়ির সামনে। মদন বলে,

—আবার কে এলরে? বিজিতের জন্য দেখছি কাজ কারবার এবার লাটে উঠবে।

বিজিত বলে,

—তাই ভাবছি এই ঠিকানাও বোধহয় ছেড়ে যেতে হবেরে।

অনিমেষ নামছে, বেশকিছু দিন বিদেশে থাকার ফলে ওর চেহারাটা বিদেশীদের মতই ঝকঝকে হয়ে উঠেছে। বিজিত বলে,

—তুই, আমেরিকা থেকে কবে ফিরলি?

—কাল, আর ফিরে তো তোর নাটকই দেখছি। তোর বাড়ি থেকে ঠিকানা নিয়ে খুঁজে খুঁজে এখানে এসে তোর কাজকর্ম দেখে রীতিমত অবাক হয়েছি।

এরমধ্যে দু'চারজন কৌতুহলী জনতা ভিড় করে। বিজিত বলে,

—ভাঙা ঘরে তোকে কোথায় যে বসাই।

অনিমেষ বলে,

—বসার সময় আমার নেই। অনেক দরকারি আলোচনা আছে তোর সঙ্গে। তোর জন্যই সেই নিউর্য়ক থেকে আসতে হয়েছে আমাকে। গাড়িতে ওঠ বাড়ি গিয়ে কথা হবে।

—বাড়িতে যেতে হবে। বিজিত এবার ভাবনায় পড়ে।

অনিমেষ বলে,

—তোর বাড়িতে নয়, এসব কথা হবে আমার ওখানে। অনেক কাগজপত্রও দেখাতে

হবে তোকে। চল—

—আরে বেচা-কেনা তো করতে হবে। কাল বিকেল থেকে কেনাবেচা বন্ধ। আমি বরং ওবেলাতে যাবো।

বিজিতের কথায় অনিমেষ বলে,

—এও কেনা-বেচার কাজ, চল ওখানে গিয়েই সব শুনবি।

অনিমেষের ঘরে বিজিত এসেছে অনেকদিন পর। আজ এবাড়িতে বিজিতের কদরও বেড়ে যায়, নিবেদিতার মা কল্যাণীও নিজে আসে। বিজিত প্রণাম করে ওকে। কল্যাণী বলে,

—কাল, তোমার মেসোমশাই-এর মুখে শুনলাম বাবা—তুমি না গিয়ে পড়লে কি সর্বনাশ যে হতো।

নরেশবাবুও আজ বিজিতকে নতুন করে চিনেছেন। তিনিও বলেন,

—সেদিন তোমার উপর অবিচারই করেছিলাম, তোমাকে চিনতে পারেনি। তোমার ওই মাথা যেন উঁচু করেই চলতে পার বাবা। তোমার যোগ্যতার মূল্য যদি কোনদিন কেউ দেয়, আমি খুশি হবো।

চা খাবারও এসেছে। এবার অনিমেষ ওদের ইউরোপ, আমেরিকার মার্কেট সার্ভে রিপোর্ট, তাদের বিভিন্ন লিটারেচার, আমেরিকার চেম্বার কমার্সের কাগজপত্র বের করেছে বিজিতের সামনে। বিজিত সে সমস্ত দেখে অনিমেষকে বলে,

—এসব কি ব্যাপার রে। অনিমেষ স্বপ্ন দেখে সে বিদেশে এবার এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে। ওই বিজিতের মতো সৎ নিষ্ঠাবান আদর্শবাদী কর্মীকে সঙ্গে পেলে।

ওদেশে এখনও সৎ কাজের মানুষের মর্যাদা আছে। আমরা বিদেশী সভ্যতার মূল স্তরকে গ্রহণ না করে পশ্চিমী সভ্যতার বিকৃতটাকেই বড় করে দেখছি। তাই গড়ার চেয়ে ভাঙার কাজেই নিপুণ হয়ে উঠেছে। ওরা এখনও গড়ার কাজ করে চলেছে। তাই অনিমেষও সেখানে কিছু গড়ার স্বপ্ন দেখে বলে,

—আমি লন্ডন নিউইয়র্কে ব্যবসার জন্য দুটো অফিস করতে চাই। তুই নিউইয়র্কের অফিসে বসবি। ম্যানহাটানে অফিসও আমার হয়ে গেছে—ওখানেই তুই মার্কেটিং চিফ হয়ে থাকবি।

চমকে ওঠে বিজিত। দেশ ছেড়ে তাকে সুদূর আমেরিকার অচেনা শহরে গিয়ে বাণিজ্য করতে হবে। বিজিত বলে,

—সে তো বিরাট কাজরে। আমি পারবো?

—নিশ্চয়ই পারবি। আমি তোকে সব দেখিয়ে দেব। ওখানের লোকাল ম্যানেজার মিঃ কর্নফিল্ডও থাকবে, এই সমাজ তোর যোগ্য মূল্য স্বীকৃতি কিছুই দেয়নি। ওদেশে তুই মাথা উঁচু করে থাকবি। আজই পাশপোর্ট-এর ফর্ম জমা দে। আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। আমাদের ট্রাভেল এজেন্ট কদিনের মধ্যেই তোর ইনটারন্যাশনাল পাশপোর্ট, ইমিগ্রেশন সব করে দেবেন।

বিজিত আশা করেনি যে এমনি একটা সুযোগ আসবে তার সামনে। কখনো ভাবেনি

সেই সুদুর আমেরিকায় গিয়ে বাণিজ্য করতে পারবে, তবু বলে বিজিত,

—দেশ ছেড়ে চলে যাবো। বাবা-মায়ের মতামতও নিতে হবে, তাদের দেখবে কে?

—অনিমেষ বলে,

—ওদের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। এখন সুজিতও বদলে গেছে। তবু তুই কথা বলে নিস। তবে ফর্মগুলো তাড়াতাড়ি ফিলআপ করে দে, আর শোন পাসপোর্ট ফটোও লাগবে।

বিজিত এসেছে এই বাড়িতে। সুজিতও রয়েছে। বিজিত বাইরে থেকে কলিং বেল বাজাচ্ছে। এ বাড়িতে যেন তার প্রবেশের অধিকার নেই। সুজিত দেখে নেমে এসে বলে,

—বাইরে থেকে বেল বাজাচ্ছিস দাদা। আমার ভুলের কি ক্ষমা নেই রে। চল ভিতরে চল।

ভবেশবাবু সাবিত্রীও রয়েছে। বহুদিন পর বিজিত এসেছে এ বাড়িতে। এখানে আজ সে যেন বাইরের লোকই। নিবেদিতাও রয়েছে। বিজিত এর কথায় সুজিত বলে,

—তুই বিদেশে এই সুযোগে চলে যা, মা-বাবার জন্য ভাবিস না। আমি তো আছি।

সাবিত্রী বলে,

—তুই চলে যাবি বাবা?

ভবেশবাবুও বলেন,

—তাই ভালো, নিজেদের স্বার্থে ওকে আর অপমান বঞ্চনা সয়ে এখানে পড়ে থাকতে বলো না সাবিত্রী। ওকে যেতে দাও, বাবা বিজিত তুইও একদিন দূরে চলে যাবি বলিনি—যেতেই হবে রে।

বিজিতও যেন আজ এই ঘরের ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছে। ঘর থেকে বেরতেই, নিবেদিতাকে দেখে তাকাল। নিবেদিতা বলে,

—বাবা-মায়ের দায়িত্ব আমি নিলাম, তোমায় ভুল বুঝে শুধু অপমান আর বিপদের মধ্যেই ফেলেছি বারবার।

তুমি চলেই যাও—হয়তো আবার অনেক কিছু পেয়ে সেখানে নতুন করে বাঁচবে। যদি পারো আমাকে ক্ষমা করো।

কথাগুলো শেষ করার আগেই নিবেদিতার আবেগে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে।

কটাদিন নানা ব্যস্ততার মধ্যে কাটে বিজিতের। এতদিন পর বিজিত যেন একটা কিছু করার সুযোগ পেয়েছে। এরমধ্যে অনিমেষ-এর সঙ্গে রোজ কয়েক ঘণ্টা করে বসে। কারখানাতে গিয়ে নানা মালের খবরাখবরও নেয়। তার কাজ সম্পর্কে একটা সুষ্ঠু ধারণা গড়তে চায় সে।

অনিমেষদের বাইরে যাবার দিন এগিয়ে আসছে। বিজিতের পাসপোর্ট কাগজপত্রও তৈরি হয়ে গেছে। যাবার আগের দিন সুজিতই তাদের বাড়িতে একটা আনন্দ ভোজের আয়োজন করেছে। সাবিত্রী ভবেশবাবুও রয়েছেন। অনিমেষ এসেছে। অর্ক-শিখারাও এসেছে। ভবেশবাবু দেখছেন এক নতুন তরুণকে, বিজিত যেন রাতারাতি অন্য এক

ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষে পরিণত হয়েছে। পরনে দামী স্যুট। আজ জীবনের এত বঞ্চনার পর বিজয়ী হয়েছে সে। পরদিন রাত্রে এগারোটায় তাদের ফ্লাইট।

দমদম বিমান বন্দরে এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং প্লেনটা যাত্রা শুরু করবে নিউইয়র্কের পথে। মুম্বাই কুয়েত-লন্ডন হয়ে ওখান থেকে সোজা আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে পৌঁছবে নিউইয়র্কের জোসেফ কেনেডি এয়ারপোর্টে। দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে বিজিত। অর্ক-শিখা সুজিত নিবেদিতা ওদের সি-অফ করতে এসেছে। এসেছে হাতিবাগানের হকারদের কয়েকজন। মদন বলে,

—বিজিতদা তোমাকে দেখে আমরাও ভরসা পাই। এই ভেবে যে আমরাও মানুষ। এদেশে জন্মে ঠিক সুযোগ-সুবিধা পাইনি তাই পথে পথে ফেরি করছি। তার জন্য আমাদের মাথা নীচু করতে হয়নি। আমরাও যে মানুষ সেই কথাটাই তুমি আজ আমাদের শিখিয়েছ।

সিকিউরিটি চেক হয়ে গেছে। প্লেনে উঠেছে যাত্রীরা, বিশাল প্লেন। বিজিত অনিমেষ বসেছে পাশাপাশি। প্লেনটা তখন দৌড়নো শুরু করেছে। দুপাশে রানওয়েতে আলোর মালা, ওদিকে জানলা দিয়ে দেখা যায় টারমিনাল বিল্ডিং-এ আলো জ্বলছে।

তারপরই এক ঝটকায় বিশাল প্লেনটা মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠে গেল। নীচে দেখা যায় কলকাতার পথঘাট-বাড়িঘর। আরও উপরে উঠে গেল প্লেনটা।

ভবেশবাবু সাবিত্রী চেয়ে রয়েছেন আকাশের দিকে। ওরাও দেখতে পায় প্লেনের নীচের আলোটা তখনও নেভেনি। বিশাল প্লেনটা চলেছে দূর দেশ দেশান্তরের আকাশ সীমায় পাড়ি দিতে। চলে গেল বিজিত আজ দেশ ছেড়ে—তাদের ছেড়ে। ভবেশবাবুর মনে হয় এই সমাজ—এই দেশ তাদের কিছুই দেয়নি। সংসারে মানুষের কাছ থেকে শুধু সব কিছু নিয়েই নেয়। তাদের সর্বস্ব দিয়ে যেতে হয়। বিনিময়ে প্রত্যাশা করলে পেতে হয় শুধু দুঃখ আর আঘাত। বিজিতও আজ তাই পেয়েছে এতদিন এখানে।

আজ সে দূরের যাত্রী। নতুন জগতে সে সংগ্রাম করে নিজেকে বিজয়ী করবেই। তার আদর্শের মূল্য সে পাবেই। ভবেশবাবু বলেন—ঈশ্বর তোর মঙ্গল করুন বিজিত।

প্লেনটা দূর আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে। দেখা যায় যেন একটা উজ্জ্বল তারা দূরে সীমাহীন আকাশের অসীমে কোথায় হারিয়ে গেল।

ভবেশবাবু এত দুঃখ বেদনার মাঝে যেন তবু স্বান্ত্বনার আশ্বাস খুঁজে পান।